পবিত্র অসুখ

শ্রীসাধনা বিশ্বাস

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা (১১ই জুলাই, ১৯৫৪)

ছেপেছেন
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া,
৩।১ মোহন বাগান লেন,
কলিকাতা—৪

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী,
১৬।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

পবিত্র অসুখ

'কোথায় তুমি সুচেতন, আমাকে বাঁচাও!' এ কাহিনী বোঝবার জন্য মাত্র এই একটি পঙ্‌ক্তি পাঠককে বুঝতে হবে। অনুগ্রহ করে যদি কেউ ওই পঙ্‌ক্তিতে মন দেন, তাহলে তাঁকে আমরা প্রণাম জানাব এবং তাঁর পায়ের কাছে বসে এই গল্পটা বলে যাব।

উপন্যাসের নায়কের নাম সুবৃত্ত পাখিরা—এই নাম কাব্য নয়, পাঠক ভয় পাবেন না। পাখিরা হচ্ছে নামের পদবি। সুবৃত্ত আধুনিক নাম। হাল আমলে এই ধরনের অভিনব নাম আপনারা শুনে থাকবেন। সুচেতন চৌধুরী নায়ক নয়, সুবৃত্ত পাখিরাই নায়ক। শুনে কি মনে হচ্ছে, একদল পাখি এ কাহিনীর নায়ক? আমরা জানি, কথার এই সব হেঁয়ালি সব পাঠক পছন্দ করেন না। সুবৃত্ত পাখি নয়, গোল হয়ে একদল পাখি চোখের সামনে নাচানাচি করছে তা-ও নয়, সুবৃত্ত আসলে মানুষ এবং একদা কবি এবং সাংবাদিক। যদিও সে নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করে মাঝে মাঝে বলে, আমি এক পক্ষীবংশীয় মানুষ। এবং পক্ষীবংশীয় মেয়ে ছিলেন বনলতা সেন।

তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ফোরণের যুগে একটি অভিনব অথচ পুরনো তথ্য হল, বনলতাকে পক্ষীবংশীয় সেনী জাতিকা ধরা হচ্ছে। বল্লালী কৌলীন্য তার ছিল, কিন্তু দুটি চোখ পাখির মতো বলে তাকে পক্ষীবংশীয় ধরতে হবে। মানুষ এককালে পাখিই ছিল, এমনটি বিশ্বাস করলে গোল চুকে যায়। পাঠক যদি কাব্যের নায়িকা বনলত'র পাখিজন্ম স্বীকার না করেন, নাই করুন। কিন্তু সুবৃত্ত পাখিরা, পদবিসহ একটি নাম, এতে কাব্যটাব্য নেই, এটাই ঘটনা, মেনে নিন।

পাখিরা যদি নিজেকে পাখি ভেবে এবং বনলতাকে পক্ষীবংশীয় ভেবে আনন্দ পায়, সেই আনন্দ তাকে পেতে দিন। বাস্তবিকই সুবৃত্তের চোখ দুটি খুবই সুন্দর। ঘন কালো চোখের তারা এবং ঝকঝকে সাদা ডিম। এমনই আয়ত সেই ডিম যে মনে হয়, পাখিই, পাখিরই ডিম্ববৎ অক্ষি। এই চোখে দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়, পবিত্র হয়, পাপ থাকে না। ওর চোখ ওকে সত্যিই সুন্দর করেছে। চোখ ছাড়া ওর শরীরে যেন কিছুই নেই। ওর দেহের কাঠামো তেমন কিছু মজবুতই নয়। দেখেই মনে হবে, এই

মানুষের পক্ষে লড়ে টিকে থাকাই কঠিন।

পাঠককে বলি, সংসারে একটি বিশেষ ধরন বা টাইপের মানুষ জন্মায়, যাদের বলা হয় কবিতাপ্রবণ। মনোবিজ্ঞানী পাভলভের বিচারে আর্টিস্ট টাইপ। কবিতাপ্রবণ মানুষ কবিতাই যে লিখবে, তার কোনও মানে নেই, কবিতা না লিখেও তাদের মধ্যে খানিকটা কবিস্বভাব থেকে যায়। কারও কারও চোখে এই স্বভাব অদ্ভুত ঠেকে। যেমন ধরুন এমন মানুষ আপনি পাবেন, বেড়াতে বেরিয়ে কোনও অরণ্যে বা দ্বীপে পাখি দেখে যার পরের জন্মে পাখি হয়ে জন্ম নেবার সাধ হল এবং সে সেকথা উচ্চারণ করে বলেও ফেলল আপনার সামনে। আপনি বাস্তববুদ্ধির মানুষ, আপনি কেবল একটুখানি নিঃশব্দে হাসলেন অর্থাৎ হাসি দিয়ে বলতে চাইলেন, এ নির্ঘাৎ পাগল, মারাত্মক ভাবের ঘোরে পড়েছে। সেকথা হয়তো ঠিকই ভাবলেন, কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে ওই কবিতাপ্রবণ মানুষ সত্যি সত্যিই পাখি হয়ে জন্মাতে চাইছে। এটা কাব্যের ব্যাপার নয়, মনের ব্যাপার।

কবি জীবনানন্দের আকাঙক্ষা ছিল বাংলার পাখি হয়ে তিনি বাংলাদেশে জন্ম নেবেন। তাইই তো বনলতার চোখে পাখির নীড়ের মতো আশ্রয় খুঁজেছেন এবং আমরা গোড়াতেই বলে রাখছি, সুবৃত্ত পাখিরা এই জন্মেই যেন বা একটি বা অনেকগুলি পাখি, তার চোখে নারীর জন্য আশ্রয় আছে। ওর অত সুন্দর কালো ছায়াচ্ছন্ন চোখ আশ্রয় বইকি। মেয়ে জাতটাকেই তার ভারী পছন্দ। অদ্ভুতই তার ধ্যানধারণা, মেয়েরাই সম্পূর্ণ মানুষ, তারাই খাঁটি। তাদের হৃদয় মহৎ, তারা নরম এবং শক্তিশালী—মেয়েরাই মানুষকে চরিত্র শেখাতে পারে। একজন খারাপ মেয়েও সাধুর চেয়ে সুন্দর। আজও সুবৃত্ত বাসেট্রেনে মেয়েদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সে কবিতাপ্রবণ এবং কবিতা লিখতও। ইদানীং তার নামডাকও হয়েছিল। কবিতার বই আছে বাজারে, বিক্রি হয়। তবে ওর স্বভাবটা আরও সুন্দর, কবিতা লেখার সময় কবি ঠিক, অন্য সময় সে সাংবাদিক, তখন বা অধিকাংশ সময় সে কবিতার ব্যাপারটা মনে মনে উপভোগ করে, কথায় কাব্য না এসে, এসে পড়ে ধারালো যুক্তি এবং বাস্তব, হঠাৎ ক্বচিৎ কাব্যের ধর্ম কথার ভাঁজে বিদ্যুৎ টেনে দিয়ে মিলিয়ে যায়, যেন সেটা না এলেই ভাল ছিল। পাবলিকের বাগ্‌রীতি বা কথার ছাঁদ সুবৃত্তের বেশ পছন্দ। এমনকী ভালগার ডাইলেক্ট পেয়ে গেলে।

যাই হোক। কথাটা হচ্ছে, ইতর ভাষা তার পছন্দ হলেও, পাবলিকের সব ইতরামি সে সহনীয় মনে করে না। পাবলিকের যে-অংশটা উন্মত্ত জনতা, যাকে ইংরেজিতে 'মব' বলে, সেই তাদের ভয়ই করে সুবৃত্তের। এই এরাই একদিন তাকে ঘিরে ধরল। ঘিরে ধরল একটি সুন্দর পাখিকে।

এই ঘটনার পর সুবৃত্ত পাগল হয়ে গেছে। তার বেঁচে থাকার কথা নয়, গণপ্রহারে

মৃত্যুই দস্তুর, মানুষ বাঁচে না, কারণ যারা মারে তারা কাউকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মারে না। মরে গেছে ভেবেই সুবৃত্তকে ছেড়ে দিয়েছিল 'মব'। দুর্বল দেহের খাঁচার ভিতর কী করে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইল পাখির প্রাণ, পাখিরা হিসেব পায় না। সুবৃত্ত বেঁচে রইল, পাগল হয়ে বেঁচে রইল।

তাঁর সুন্দর দুটি মানবাশ্রয়ী চোখে আশ্চর্য বিহ্বলতা, দৃষ্টি দেখে বোঝা যায়, মনটা তার সংসারে নেই। কোথায় আছে কেউ জানে না। সবচেয়ে কঠিন হল, মানুষকে সে প্রায়শই চিনতে পারে না, নাম এবং মুখ ভুলে যায়। যদি কেউ বিষণ্ণ গলায় শুধায়, চিনতে পারো না?

সুবৃত্ত তর্জনী মাথায় ঠেকিয়ে অসহায় পাগলামির বিচিত্র ভঙ্গি করে বলে, মাথার দোষ।

অবশ্য মাঝে মাঝেই সুবৃত্তের মনে হয়, তার মাথাটা একটা আবেশিক অবস্থার মধে রয়েছে, তার এই অবস্থাকে 'অবসেশনাল নিউরোসিস' বলে। ডাক্তার বলেছেন, অনুভূতি সংবেদনের আধিক্য থেকে এই ধরনের 'নিউরোসিস' দেখা দেয়। এটা নিঃসন্দেহে শিল্পী মস্তিষ্কের ব্যাধি।

—তোমার মাথার মধ্য থেকে একটি বাক্য কিছুতেই নড়ছে না সুবৃত্ত।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কথাটা কী?

—'কোথায় তুমি সুচেতন, আমাকে বাঁচাও!'

—আর্তনাদের মতো শোনায়?

—বটেই তো। একটি অসহায় মেয়ে ককিয়ে উঠল।

—কখন? কোথায়? আলো ছিল?

—আলো ছিল না।

ঘটনাটির অনুপুঙ্খ বিবরণ কতবার দিয়েছে সুবৃত্ত। আর ভাল লাগে না। আজকাল নতুন মানুষ দেখলেই কেমন অনুৎসাহিত বোধ করে। ঘটনাটি দৃশ্যবৎ মনে করলেই তার 'আবেশ' বেড়ে যায়। সে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার কথা বলা কমে যায় আরও। মাথার মধ্যে ঘুমঘুম ক্লান্তি জড়ো হয়। খেতেও ইচ্ছে করে না। সমস্ত মানুষকে তেতো লাগে।

নতুন এই মানুষটাকে বাড়িতে উদিত হতে দেখেই সুবৃত্তর মনটা ভারী হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কোনও আত্মীয়ই হবে। আত্মীয়রা কেউ কেউ ত্যাঁদড় টাইপের বোকা একঘেঁয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যেমন, 'কেন আলো নিবে গেস্‌লো?'

যত বারই বলা হয়, সোনারপুর স্টেশনে গাড়ি ঢোকার আগে অথবা স্টেশন ছেড়ে কোনও গাড়ি শিয়ালদার দিকে আসার সময় স্টেশন ছাড়ার মিনিট-আধ-মিনিট

পরই লাইনের গা-লাগা কারশেডের কাছে ওভারহেড তারে বিদ্যুৎ থাকে না। ওই জায়গাটা 'নিউট্রাল জোন'—বিদ্যুৎহীন। কোনও গাড়ির বিশেষ বিশেষ কামরায় ইমারজেন্সি লাইট থাকে না বা কাজ করে না। তখন কামরা আকস্মিক অন্ধকারে ডুবে যায়। এবং তখন যদি গাড়ি সিগনাল না পায়, গোটা কামরা আঁধারে তলিয়ে পড়ে থাকে। এই নিউট্রাল জোন-এ অন্ধকার কামরার মধ্যে ছিনতাই এবং মেয়েদের শ্লীলতাহানি আকছার ঘটে। এই অভিজ্ঞতা বোকা আত্মীয়কে বোঝানো যায় না।

—নিউট্রাল জোন মানে?

—মানে জানি না। ওভারহেড তারে বিদ্যুৎ যোগাযোগ নেই, যেমন ধরুন নাড়ির একটা জায়গায় রক্তই নেই। বোঝা গেল?

—কতকটা বুঝলাম বইকি। কিন্তু এ রকম হবে কেন?

—হয়।

—আচ্ছা বেশ। ওই অন্ধকারেই তাহলে মেয়েটা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। কেউ বোধহয় বুকে হাত দিয়েছিল?

—অন্ধকারে আমি তো দেখিনি। আমার রিফ্লেক্স বলল, মেয়েটা বিপদে পড়েছে, তার আগে আরও ঘটনা আছে। পরে শোনাচ্ছি আপনাদের।

নতুন এই আত্মীয়টির সঙ্গে মা পরিচয় করাতে চাইবে। গা-পড়া আলাপ একফোঁটা ভাল লাগে না সুবৃত্তর। মায়ের আবার এ ব্যাপারে আদিখ্যেতা আছে, মায়ের আত্মীয়সুখ পছন্দ। সুবৃত্তর পাগলদশা হওয়ার পর আত্মীয়কুটুমের উপর মায়ের টান আরও বেড়েছে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে হাতের কাছে পেলে মা নিকট আত্মীয়ের অধিক কদর দিয়ে নিজেই একেবারে গলে যায়। ওই সব আত্মকুটুমরা এক একজন জাদুচিকিৎসকের মতো বড়িতে এসে ঢোকে, যেন তারাই সুবৃত্তকে ফুঁ দিয়ে সারিয়ে তুলবে।

এই লোকটি সৌম্য প্রকৃতির হলেও, 'লিজার ক্লাশের' ঠাওর হয়, কাজকাম বিশেষ নেই, লতাপাতায় সম্পর্ক হলেও এরা টুঁড়ে টুঁড়ে চলে আসে, অন্যের কিসে অপচয়, কিছুই বোঝে না, এলে নড়তে চায় না। কথা বলতে ভালবাসে এরা। মা আবার এদের কথায় সম্মোহিত হয়ে পড়ে। কথার তুকে পড়ে মা ইদানীং সুবৃত্তর জন্য হয়তো তাবিজ-কবজ-মাদুলির কথা ভাবছে। এ হলে সুবৃত্ত পালাবে। মায়ের বোঝা উচিত তার ছেলে একজন হাড়-নাস্তিক—কোনও পাখির মাতৃভাষাতেও সে ঈশ্বরকে ডাকে না।

মা মানুষটাকে চোখের ইশারায় দেখিয়ে বললেন, ইনি তোমার দুর্গাপুরের ছোটমামা, প্রণাম করবে না?

—তাই নাকি! ছোটমামা! দুর্গাপুরে থাকেন? ও, আচ্ছা! আপনি আমার প্রণাম

নেবেন ঠাকুর! বলে খানিকটা তফাতে সরে চলে যায় সুবৃত্ত। ছোটমামা মহিম গাঙ্গুলির বুকটা টনটন করে উঠল। চোখ ফেটে কান্নাও এল তাঁর।

—ফুলপিসিকে নিশ্চয়ই তোর মনে আছে? মায়ের এই প্রশ্ন শুনে পাখিরা ভাবে, জনৈক ফুলপিসির সঙ্গে দুর্গাপুরের হয়তো কোনও সম্বন্ধ ছিল।

সুবৃত্ত দড় গলায় বলল, কাউকে মনে রাখাটা আমার কাজ নয় মা!

—তাহলে মাকেও বুঝি ভুলে যাবি খোকা?

—যাবই তো! কবে যেন তোমার খুব তেড়ে জ্বর হল। তুমি কতবার ককিয়ে ককিয়ে কাছে ডাকলে। আমি কি গেছি একবারও? কী করেছি! তখন তিনদিন বাড়িতেই রইলাম না।

—যখন তখন 'হুট' করে কোথায় যে চলে যাও!

—গেলাম আর কোথায়! কুদ্দুসের বাসায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে রইলাম যাদবপুরে ; ও বাড়ি থেকে কোরবানির মাংস এনেছিল, বাসি, সরপড়া মাংস, ভারী সুঘ্রাণ—খেয়েছি। তোমার মতো কান্নাকাটি করা কোনও গেরস্ত মহিলার জ্বরটর আমার ভাল লাগে না, কী রকম সিরসির করে।

—সিরসির করে?

—হ্যাঁ। ওই তোমার জ্বরের গায়ে পাতালে তলানো কুয়োর জল ঝুঁকে দেখলে যে রকম হয়, মগজের ভিতরে খালি খালি লাগে, মাথায় ঘোর লেগে সাপ্টা খেয়ে জলে পড়ে যাব, অনন্ত কুয়োর তলায় চলে যাব মনে হয়—তখনই পায়ের তালুতে সিরসিরানি—এ তুমি বুঝবে না সাগরী।

—তুই আমাকে নাম ধরে ডাকছিস সুবৃত্ত?

—হ্যাঁ ডাকছি। কেন ডাকব না? তুমি তো আমার পুরোটা চেনা নও কখনও, ফলে তোমাকে সব সময় 'মা' বলা যায় না।

ছেলের মুখের এই রকম নিষ্ঠুর কথা কোনও মা কি সহ্য করতে পারেন? মা কেঁদে ফেলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বৃথাই আত্মসংবরণের চেষ্টা করেন।

মহিম গাঙ্গুলি বিমর্ষ রইলেন কিছুক্ষণ। খেতে বসে ভাল করে খেতে পারলেন না। সুবৃত্ত তাঁকে চিনতে পারছে না, মস্ত এই ধাক্কাটা হজম করতে পারছিলেন না তিনি। কেবলই ভাবছিলেন, সুবৃত্তকে দেখে পাগল তো মনে হয় না। সত্যিই কি ঘটেছিল?

—লোকেরা ওকে চোর ভেবে ঝাঁপাল, স্টেশন চাতালে মেরে ফেলে রেখেছিল? তোমরা খবর পেলে কখন?

—নীলরতনের সুবোধ ভট্টাচার্য ফোন করল, ও ওখানকার সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার। ইদানীং কার্ডিওলজি বিভাগে ওর কাজের জায়গা। চল্লিশ

বছর ধরে 'নহবত' নামে একটা লিটল ম্যাগাজিন চালিয়ে আসছে। সুবৃত্তকে ভাইয়ের মতো দেখে। ও না হলে জানতেই পারতাম না খোকা কোথায়।

—সুবোধ কী বলেছে?

—যাদবপুরের পুলিশ সন্ধ্যার মুখে খোকাকে নীলরতনে দিয়েছে, খোকার পকেট হাতড়ে কিছু পায়নি, নাম পর্যন্ত পায়নি।

—সুবোধ না হলে...

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, যাদবপুরের পুলিশ কেন?

—যাদবপুরের স্টেশন প্ল্যাটফর্মে খোকাকে মারল লোকেরা। খোকা ওখানেই নেমে গেছে।

—ওখানে কেন?

সাগরী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দাদাকে বললেন—দাঁড়াও, একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে। বলে উঠে গেলেন। গত দুই সন আগের একখানা ডায়েরি এনে মহিম গাঙ্গুলির হাতে দিয়ে বললেন, শেষ যেখানে খোকা লিখেছে, ভারী আশ্চর্য কথা! পাতা ওল্টাও দেখতে পাবে।

—বার করে দে।

সাগরী ডায়েরি খুলে দাদার চোখের সামনে ধরলেন। দাদা ডায়েরির পাতায় চোখ রেখেই বুঝতে পারলেন সুবৃত্তর ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল, তবে এদিক ওদিক উল্টেপাল্টে দেখে মনে হল, দিনলিপি নিয়মিত নয়, মাঝে মাঝে খাপছাড়াভাবে লিখে গেছে। এবং দু'বছর যাবৎ সে অসুস্থ।

সুবৃত্ত এই ঘটনার কথা লিখতে লিখতে আচমকা থেমে পড়েছে, তারপর সমস্ত পাতা সাদা, কোনও আঁচড় নেই।

'কোথায় তুমি সুচেতন, আমাকে বাঁচাও!' রেল কামরার এই নারী-আর্তনাদ আমাকে নষ্ট করে দিল। পরে জেনেছি, সুচেতন একটা আমোদগেড়ে এবং মেয়েটাও আমোদী। ডায়মণ্ডহারবারে হোটেল ভাড়ায় বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে স্ফুর্তি মেরে ফিরছিল, গলার চেন চোট হল রেলে এবং আমোদীর শ্লীলতাহানির চেষ্টাও হয়েছিল এলোমেলোভাবে প্যাসেজে ভিড়ের মধ্যে, কামরা অন্ধকার হলে ; তখনই চিৎকার উঠল, 'বাঁচাও', মনে হল বুঝিবা বুকের জামার উপর দিয়ে খুর চলে গিয়েছে। আলো এলে দেখি আমোদী দু'হাতে বুকে তুলে নিজেকে আগলাবার চেষ্টা করছে, চোখে জল। কিন্তু পরে জানলাম, চেনটা নকল। ওই চেনটা তা হলে কেন আমার হাতে এল, কেন আমি লড়তে গেলাম?

মামা যে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ সুবৃত্তর নিশ্চয় মনে নেই। ভাবলেন মহিম

গঙ্গোপাধ্যায়। মামাও তাঁর কোনও আত্মঘোষণায় যেতে চান না এই মুহূর্তে। তা ছাড়া এই বাড়িতে তাঁর নিজস্ব কিছু সংকোচ রয়েছে, সাগরীর বিবাহ তিনি সমর্থন করেননি। জাতধর্ম, বর্ণগোত্রের বিসম্বাদ ঠেলে সরিয়ে সাগরীর সংসারধর্ম উপভোগ করতে পারেননি। অথচ পাভলভপন্থী ডাক্তার হিসাবে এ কাজ তাঁর করা উচিত ছিল।

ডায়েরিটা পড়তে পড়তে অন্যমনস্কভাবে থেমে পড়েন মহিম। আঙুল দিয়ে পাতা ঠিক রেখে ডায়েরি বন্ধ করে বোনের মুখের দিকে কেমন কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। বোনটার জন্য বড্ড মায়া হয়। সাগরীর বর সুমন্ত পাখিরা, ডক্টর পাখিরা এনকেফেলাইটিসে বধ হল, কী দুর্ভাগ্য! সেই দুঃসংবাদ সাগরী দিলই না, কত দেরিতে (দু'বছর বাদে) হঠাৎ একদিন এস টি ডি করল। করে বলল, ডক্টর পাখিরা মারা গেছে ছোড়দা, কাউকে বলতে পারিনি। বলেই বা কী হত! তুমি পাবলে একদিন আসবে? আমার সুবৃত্ত পাগল হয়ে গেছে। বলেই রিসিভার নামিয়ে দিয়েছিল সাগরী।

কতক্ষণ ওই ফোন মাথায় ঢুকতেই চায়নি ডক্টর গাঙ্গুলির। পরে মনে হয়েছে, সাগরীই কি আর সুস্থ আছে!

—ওইভাবে আচমকা ফোনটা নামিয়ে দিলি সাগরী!

—কী করব? অনেক বিল উঠত যে দাদা! খোকা রিপোর্টারের চাকরিটাও রাখতে পারল না। কবিতা লিখে সামান্য কামাতে পারত, সেই লেখাও ছেড়ে দিল। ঠিক করে টিউশনটাও পাবে না। ডক্টর পাখিরা খুব তো রোজগেরে ছিল না ছোড়দা! ব্যাঙ্কে সামান্য যা রেখে গেছে, তারই সুদে খাচ্ছি। এই অবস্থায় এস টি ডি করতে গা কাটে। কিছু মনে করলে না তো! খোকার অবস্থা এত খারাপ না হলে তোমাকে ডাকতাম না।

এই সমস্ত কথা বোনের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল মহিম গাঙ্গুলির। কত অল্প সময়ে সাগরী কেমন ফুরিয়ে গেল যেন। এবং দেখা যাচ্ছে, সুবৃত্ত বাপের আকস্মিক মৃত্যুর আঘাত বুকে করে সেদিন 'খবর বা স্টোরি জোগাড় করতে বার হয়েছিল দক্ষিণের ওই রেলে। দুটি দুর্ঘটনাই মাত্র দু'বছরের মধ্যে ঘটে গেছে। ডায়েরির ভেতরের শেষ দিনলিপির তারিখটা আর একবার দেখে নিলেন ডক্টর গাঙ্গুলি।

বুকটায় কেমন চাপ ধরে আছে গাঙ্গুলির। একসঙ্গে নানা কথা জট পাকিয়ে তুলছে। অসহায় বোনটার অভিমান এত তীব্র যে তাকে অহংকারী দেখায়, কথা বলতে গিয়ে বাধে, ভুল বাক্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে, খুব সাবধানে না এগোলে কিছুই করা যাবে না। এদের, 'সাহায্য করছি' বলা যাবে না। প্রথমেই, 'আমার প্রণাম

নেবেন ঠাকুর' বলে সুবৃত্ত তাঁকে দূরে ঠেলে দিতে চেয়েছে।

সুবৃত্তর বাক্য বিশেষ জোরালো, শব্দ প্রয়োগে বিশেষ যত্নবান। এরা 'বর যায়, কনে যায়' জাতীয় বাক্য বলে না, লেখেও না। এদের 'বাকতন্ত্র' আলাদা। এদের বাগতান্ত্রিক স্নায়ুকেন্দ্র বিশেষ টাইপের হয়ে থাকে। এদের অসুখ বা সুখ বুঝতে হলে বাংলা ভাষা খানিকটা অন্তত জানা দরকার। আজকাল পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি, বাংলা ভাষাকে নুড়োকালির পর্যায়ে নামাতে পারলে বাঁচে, ভাঙা কুলোর মতো ব্যবহার করতে চায়। সবাই নয়, তবে অনেকেই। মহিমের ভয় করছে, সুবৃত্তর বাকতন্ত্রের উদ্দীপনা আদৌ কি তিনি বুঝবেন! আমোদগেড়ে এবং আমোদী শব্দ দুটির প্রয়োগ বস্তুত তিনি বুঝেছেন কি? 'ঠাকুর' শব্দটার ঘা লেগেছে কি তাঁর সঠিক মর্মে? সুবৃত্ত ব্যঙ্গনিপুণ, ঠাট্টায় ওস্তাদ, মিষ্টি চাকুর মতো চিরে দেয়।

ভাষা এবং সাহিত্য এবং শিল্পকলা মানুষের যে আন্তর্জগৎ গড়েছে তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং জটিল। কবি মনের সংবেদন-প্রকৃতি অন্য ধরনের, কোন অবস্থায় কিসে তার স্নায়ুকোষ উদ্দীপ্ত হবে, স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত এবং নিস্তেজিত হবে বলা কঠিন। কবিতাপ্রবণ মানুষের ক্রিয়াকলাপ স্বাভাবিকভাবেই সাধারণের চেয়ে আলাদা। আমোদীকে দেখে সুবৃত্তর কী মনে হয়েছিল? মেয়েটির নাম আমোদীই বা রাখল কেন সে? আমোদী মানে কি আদুরে? অগভীর? আমোদগেড়ে শব্দটা তো আরও খারাপ।

মহিম ডায়েরির আঙুল চিহ্নিত পাতা ফের চোখের সামনে খুলে ধরেন। সুবৃত্ত লিখেছে—ঘটনা চমৎকার। ভাবলে কুঁকড়ে যেতে হয়।

দু'টি ছোট বাক্য পড়েই মহিম চমকে উঠলেন। 'চমৎকার' শব্দটিও ঠাট্টা। মৃদু বেদনাজড়িত ব্যঙ্গ। বা তীব্র অথচ চাপা বেদনামাখা এবং বিদ্রূপপূর্ণ।

সুবৃত্ত লিখেছে, শুনলাম, আমোদী আর আমোদগেড়ের মধ্যে বাগদান হয়েছে, ওরা ডায়মণ্ড গিয়েছিল, বাগদান আগাম উসুল করতে। ফেরার পথে বিপত্তি। তখন কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছি, ঘটনাটা কী ফাঁপা! লিখতে কলম সরে না ; শুধু একটা সাধারণ বাক্য কবিতার মতো হয়ে উঠল যে! যখনই মনের মধ্যে বেজে ওঠে, 'কোথায় তুমি সুচেতন (আমোদগেড়ে),. আমাকে বাঁচাও!' তখনই নকল গহনা ঝকমকায়। সোনারপুরের কারশেডের কাছে 'নিউট্রাল জোন'-এ ওভারহেড তারে বিদ্যুৎ না থাকায় কামরা অন্ধকার হয়, ছিনতাই করে যে মগরাহাটের উটকপালী মগকন্যা, সে সরু চেনটা ভয়ে অন্ধকারে আমার হাতে গুঁজে দেয়—আমি ভাবি, সোনার শিকলি তা হলে উদ্ধার হল!

কিন্তু তারপর যা হয়েছে কিছুতেই লেখা যায় না।

এই অবধি এসে ডায়েরি থেমে পড়েছে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, যতটুকু লিখেছে

সুবৃত্ত, সেই কথাগুলোই বা চিকিৎসক কী ভাবে দেখবেন? এবং সুবৃত্তকে ওই ঘটনার বাকি এবং পূর্বাংশ সম্বন্ধে খোঁচাতে হবে কীভাবে? অথবা অন্য কোনও উপায় দেখতে হবে? কথাগুলি দ্রুত মুখস্থ করে ফেলেন মহিম গাঙ্গুলি। এবং নিজেকেই প্রশ্ন করেন, উপায় তা হলে কী?

মহিম গঙ্গোপাধ্যায় বোনের দিকে ডায়েরিখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা ভাল করে রেখে দাও।

সাগরী ডায়েরি হাতে নিয়ে সহসা অশ্রুপ্লাবিত হয়ে বলে ওঠেন, ডক্টর পাখিরা আমার জাত নষ্ট করেছিল দাদা। কিন্তু খুব গুণী সন্তান দিয়ে গেছে আমার কোলে, আমি তাকে রাখতে পারব তো! সুবোধ বলে, সুবৃত্ত আমাদের 'বিস্ময়'। ওর গানেরও গলা ছিল দাদা! আঁকতেও পারত। এত গুণ একসঙ্গে থাকে না, থাকতে নেই। ওর মাথার ভেতরটা খুব বুঝি নরম?

—আমার ধারণা, ওব ফাদার অবশেসন আছে। বাবার মৃত্যু ওকে আরও সংবেদনশীল, শুদ্ধ এবং কবিতাপ্রবণ করে তুলেছিল। মেয়েদের সম্বন্ধে অতিরিক্ত সংবেদন ওকে বিপদে ফেলে দিয়েছে। ওর সেনসরিনার্ভ কিংবা সেনসোরিয়াম খুব স্ট্রং। উন্নত ভাষা চর্চা করলে সেনসোরিয়াম বা মাথার অনুভূতিগ্রাহী অংশ শক্তিশালী হয়, সংজ্ঞাবহ নাড়ি বেগবান থাকে। তুই কি বুঝবি সাগরী?

সাগরী চোখে জল নিয়ে নেতিবাচক মাথা নাড়তে থাকেন এবং বলে ওঠেন, কী করে বুঝব ছোড়দা! খালি বুঝেছি, একটা মেয়ের নকল গলার চেন উদ্ধার করতে গিয়ে লোকের হাতে পড়ে খোকা পাগল হয়ে গেছে। শুধু ভাবি, মেয়েটা তখন কী করছিল? খোকা লোকের হাতে পড়ল কী করে? ওরা মারল কেন? পদ্য লেখা কি খারাপ? পদ্য লিখলে কি মানুষের এমনই হয়? কই, সবার তো হয় না!

—হবে কেন? সবাই তো সুবৃত্ত নয়। যাও, ডায়েরিটা রেখে সুবোধকে একটা ফোন করে, আসতে বলে দাও। সুবোধ কি আসে এখানে?

—মাঝে মাঝেই এসে পড়ে। ডাক্তারের সঙ্গে সব ব্যবস্থা ওইই করেছে। ওষুধও এনে দেয়। তুমি বলবার আগেই আমি ওকে টেলিফোন করে আসতে বলেছি। দুটো নাগাদ ওর ছুটি। তবে আগেই রওনা দেবে বলেছে। এবং বলেছে, সঙ্গে একজন মেয়ে প্রফেসর আসবে, মনের অসুখের কাউনসেলিং করে। বলে একদণ্ড চুপ করে রইলেন এবং তারপর চেয়ার ছেড়ে দাদার সামনে থেকে উঠে গেলেন সাগরী।

হঠাৎ এই সময় বেড়ালের পায়ের শব্দের মতো এ ঘরে ঢুকে আসে সুবৃত্ত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে মামাকে দেখতে থাকে। সেই দৃষ্টির তীব্রতা মামাকে কেমন বিচলিত করে তোলে।

—আমার ডায়েরিটা আপনার পড়া হল?

—একটা মাত্র পাতা পড়েছি।

—অনেকেই পড়েছে। বোঝেনি।

—না, আমিও বুঝিনি।

—কোন শব্দটা না-বোঝা, বলুন।

—মগকন্যা।

—এই দক্ষিণে মগরাহাট বলে একটা জায়গা আছে। ডায়মণ্ডহারবার লাইনে একটা স্টেশনের নামও মগরাহাট। কথাটা আসলে হচ্ছে মগের হাট। জলদস্যু মগ। মগের মুলুক, শোনেননি কথাটা? দক্ষিণের অনেক মানুষ জলদস্যুর বংশধর। খারাপ লাগলেও এটা ইতিহাস, কেমন! জলদস্যুতা না থাকলেও স্থলদস্যু আছে। মগকন্যা জানে না, মগের হাট কেমন ছিল! ছিল যে তাইই জানে না, কিন্তু পেশা বজায় রেখেছে। এরা এখন ট্রেনেবাসে ডাকাতি-ছিনতাই করে। এবার বলুন, আর কী বোঝেননি?

—কাউকে বিশ্বাস করে তোমাকে সব কথাই বলতে হবে সুবৃত্ত।

—কাকে?

—বন্ধুকে।

—কে বন্ধু? আপনি?

—ধরো, আমিই বন্ধু।

—আপনি তো ঠাকুর। আপনি আমার বাবাকে ঘৃণা করতেন। হঠাৎ এতদিন বাদে আপনার মধ্যে একটা ইনভেস্টিগেটরি রিফ্লেক্স, বাংলায় বললে, অনুসন্ধানমূলক পরাবর্ত তৈরি হয়েছে, তাই আপনি দেখতে এসেছেন, পক্ষীবংশীয় মানুষদের মনে এ যুগে কী ধরনের অসুখ জন্মে। তাই না?

—তুমি আমাকে আঘাত করলেও মুখ বুজে সহ্য করব সুবৃত্ত। কারণ, আমি তো অপরাধী।

—না, না। অপরাধ কিসের! আপনি তো ঠিকই করেছেন। যতদূর মনে পড়ে, আপনি মনের চিকিৎসা করতেন। এবং কড়া বামপন্থী ডাক্তার হিসাবে সত্তরের দশকে আপনার নাম ডেকেছিল। এই সব তথ্য বাবা আমাকে দিয়ে গেছেন। এখন আপনার অবকাশের জীবন। ধীরে ধীরে মনে পড়ল, আপনি কখনও আমার সঙ্গে কথা বলেননি। ছেলেবেলায় মামাবাড়ি গিয়ে মুখ শুকনো করে মায়ের হাত ধরে ফিরে আসতাম। আপনার সঙ্গে কখনও কথা হত না। বাবা বলে গেছেন, পাখির সঙ্গে মানুষের কখনও কথা হয় না।

—সুবৃত্ত!

—হ্যাঁ, ছোটমামা। আপনাকে বুঝতে হবে, উন্মত্ত জনতা আমাকে পাখির মতো

শিকার করতে চেয়েছিল। নিজেকে মানুষ মনে করার অধিকার বাবা আমাকে দিয়ে যেতে পারেননি দুর্গাপুরের মামা। কেবল একটি বাসনা বুকের মধ্যে রেখে দিয়ে বলে গেছেন, তুমি হবে সকালবেলার পাখি। গাইবে আঁকবে, লিখবে। তাই না? বাবা বুঝেছিলেন, পক্ষীবংশে জন্মে আমার খুব মানুষ হওয়ার ইচ্ছে। এই বাসনা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে মামাবাবু!

দেখা গেল, কথা বলতে বলতে সুবৃত্তর চোখে জল এসে পড়তে চাইছে। নিজেকে হঠাৎ সামলে নিয়ে মামার চোখের সামনের সোফায় বসে পড়ল সুবৃত্ত। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা বলুন তো, 'মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়', কথাটার মানে কী? আপনি দেখেছেন?

—কী?

—প্রকৃত সারস?

—হ্যাঁ।

—আমিও দেখেছি, কাছে গিয়ে দেখেছি, সত্যিই পাখিটা উড়ে গেল। তার আগে পর্যন্ত কাছে ঘেঁষতে দেয় এই পাখি। এটা স্বভাব। একবার কুদ্দুসদের গাঁয়ের বাড়ি গিয়ে মাঠের মধ্যে, বিলের ধারে, প্রকৃত সারস দেখেছিলাম। এই সব পাখিকে মানুষ শিকার করে। পবিত্র ধর্মের মতো সাদা পাখি বোঝে, মানুষ কখনও ভাল নয়। সে বিশ্বাসযোগ্য নয় ; সৎ ধর্মকে লোকেরা কখনও পাবে না। সৎ প্রকৃতিকে মানুষ কখনও ছুঁতে পারবে না। আচ্ছা, আপনি সাহিত্য পড়েন?

—অল্পবিস্তর।

--ওহ্, তার মানে বিস্তর নয়, অল্পই পড়েন। কথাটার প্যাঁচ দেখুন, অল্পবিস্তর মানে অল্পই, তা হলে বিস্তর লাগালেন কেন?

—মানে মোটামুটি পড়ি আর কি!

—একই তো কথা। অল্পের চেয়ে সামান্য বেশি, অর্থাৎ কমই পড়েন। তা হলে তো হবে না।

—কী হবে না?

—চিকিৎসা। দার্শনিক মনস্তত্ত্ব অথবা মনস্তাত্ত্বিক দর্শন মুখ্যত সাহিত্য-ভাষা নির্ভর। ভাল চিকিৎসক হতে গেলে খানিকটা সাহিত্য রচনার চেষ্টা থাকতে হবে এবং অনেকটা সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা। কেমন?

—আমিও তাইই মনে করি মণি।

—মণি? এটা তো আমার ডাকনাম, বাবা ডাকতেন। মা মাঝেমাঝে ডাকে। তা কথা হচ্ছে, আমাকে 'সু' বলেও ডাকা যায়। অবশ্য কেউ ওভাবে ডাকেনি।

—আমি ডাকব?

—নাহ্। ওটা কারও জন্য তোলা থাক। তা কথা হচ্ছে, আপনি সাহিত্য পড়েন না।

—পড়ি।

—সামান্যই পড়েছেন। এখন তা-ও পড়েন না। অথচ আপনাকে-আমাকে প্রথমেই মনের তিনটি স্তর বুঝতে হবে। সচেতন মন, অবচেতন মন এবং নির্জ্ঞান মন। নির্জ্ঞান শব্দটা কে বোঝে? মনের একেবারে গভীব রহস্যময় অস্ফুট তলদেশে কেই বা ঢুকতে চায়! সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে, নির্জ্ঞান শব্দটাকে দুর্বোধ্য ভেবে ফেলে দেওয়া, অর্থাৎ মনের একেবারে গভীরতম তলকে অস্বীকার করা।

—আমরা তো মনকে এইভাবে দেখি না সুবৃত্ত। আমরা মনটাকে মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রে খুঁজি। মনের অসুখকে বলি স্নায়ুরোগ। অবশ্য তোমাকে এ সব কথা বলতে সাহস হচ্ছে না। বুঝতেই পারছি, তুমি পড়াশুনা করেছ এ ব্যাপারে। একটু আগেই তুমি 'পরাবর্ত' শব্দটা ব্যবহার করেছ। তখনই বুঝেছি...

—হ্যাঁ করেছি, অল্পবিস্তর। এবং বুঝেছি লোকেরা আমাকে কেন মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তা কথা হচ্ছে, নির্জ্ঞান মন মুছে দিয়ে আপনি আনলেন ততোধিক শক্ত শব্দ, পরাবর্ত। পরাবর্তর বদলে 'রিফ্লেক্স' বললে বাঙালি বুঝবে, কারণ ক্রিকেটের দৌলতে সামান্য কেরানিও ওই শব্দটা জেনে গেছে। অবশ্য অনেকে ভাবতেই পারে, রিফ্লেক্স শব্দটা বোধহয় ক্রিকেটীয় পরিভাষা, মানে ক্রিকেটের ভাষা, সচিন-সৌরভ-আজাহারউদ্দিনের রিফ্লেক্স আছে, আর কারও নেই।

—হেঁ-হেঁ-হেঁ!

—আপনি হাসছেন? হাসির কথা নয়। অন্ধকার রেলকামরায় মগকন্যার পরাবর্ত হল, দ্রুত আমার হাতে নকল সোনার শিকলি, যা সে আলো নেবার ক'সেকেন্ড আগে আমোদীর গলা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছিল, লোকে ছিঁড়তে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল, সেই ভয়ে রিফ্লেক্স হল, বাঁচতে হলে চেনটাকে ফেলে না দিয়ে, খুব কাছে সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠা লোকটার, এই আমি, আমার হাতে গুঁজে দেওয়া। গুঁজে দিয়ে লোকটার মুখ মনে রাখা। এবং সঙ্গীদের অর্থাৎ অন্য মগদের জানিয়ে দেওয়া। তারা এবার আমাকে চোখে চোখে রাখল। পরে সব বুঝে নেবে।

—তারপর?

—মামা! আমি রিফ্লেক্স বা পরাবর্তক্রিয়া কবুল করি, কিন্তু নির্জ্ঞান মনটাকেও ফেলে দিতে চাই না। ওই নির্জ্ঞান মনই মগকন্যাকে চেনটা আমার হাতে গুঁজে দিতে বলেছিল, ওই মনটায় প্রবৃত্তির সহজ অধিকার, মনে করি, ওটা আছে।

সুবৃত্তর কথায় মুগ্ধতা প্রকাশ করে মামা বললেন, আচ্ছা বেশ, আছে। তবে নির্জ্ঞান মনটাও স্নায়ুতন্ত্রে সাড়া দেয়।·বলি কি...

—থাক। আপনি শেষ পর্যন্ত কী বলবেন জানি। তবে শুনে রাখুন, সবাই সাড়া দেয়, হত্যাদৃশ্যে ; চোখের সামনে মরতে দেখেও আমোদী কখনও সাড়া দেয় না। আমোদীর কখনও সৎ পরাবর্ত নেই মামা। আমোদী নিকটে এলে প্রকৃত পাখিরা উড়ে যায়।

—সুবৃত্ত!

—হ্যাঁ মামা! কে? কারা এল?

—কেউ না। কেউ আসেনি সুবৃত্ত। বল।

—বলব না। আমি দেখাব। এই দেখুন, আমি এঁকেছি। এটাই কমবেশি আমোদীব মুখ। বলে সুবৃত্ত পাঞ্জাবির পকেট থেকে কাগজের একটা টুকরো বাব কবল।

মামা একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ছবিটার দিকে। একটা মুখ ঝাপসা হয়ে ভেসে উঠেছে। ঝাপসা ঠিকই, তবে বোঝা যায়।

মামা হঠাৎ বলে উঠলেন—মনে হচ্ছে সত্যিই কেউ এল। দেখ তো উঠে গিয়ে।

কথা শেষ হওয়ার আগেই ওরা তিনজন এই ঘরের ভিতরে ঢুকে চলে আসে। সুবোধ, স্বাগতাপর্ণা এবং মা। মামার হাতে তখনও ছবিটা ফুটে আছে। স্বাগতার চোখ সেদিকে মুহূর্তে চলে গেছে। মামা একবার অপার বিস্ময়ে ছবির দিকে এবং একবার অধ্যাপিকার মুখের দিকে চাইলেন। মনে মনে বিড়বিড় করে বললেন, মনে হচ্ছে, সেইই এসেছে। কিন্তু ভুলও তো হতে পারে!

মামা বিস্ময়কে বাঁধলেন চাপা সতর্কতায়, চাইলেন ভাগ্নের মুখের দিকে। লক্ষ করলেন বিমূঢ় এবং অসহিষ্ণু সুবৃত্ত অধ্যাপিকাকে দেখেই সোফা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে এবং ছোঁ মেরে মামার হাত থেকে অঙ্কিত মুখ কাগজের টুকরো ছিনিয়ে নিয়েছে। এবং ফের বসে পড়েছে। অতঃপর কড়া গলায় বলে উঠল—মামা! আমার রিফ্লেক্স বলছে, আপনার সমস্ত সাজানো। এই এরা এখানে অভিনয় করতে এসেছে, আপনারই নির্দেশে। একে জোর করে আনতে গেলে কেন সুবোধদা!

সুবোধ ভট্টাচার্য ভ্যাবাচ্যাক্য খেয়েও সামলে নিয়ে বলে, আমি কাকে জোর করে আনতে গেলাম! ঠিক বুঝলাম না তো! স্বাগতা তোমার পাঠক, ও নিজেই এসেছে। আমি কাউকে ডাকিটাকিনি। এই যে স্বাগতা, ইনি হচ্ছেন সুবৃত্তর মামা, ডক্টর গাঙ্গুলি। বুঝতেই পারছ, উনি সুবৃত্তর মা। দাঁড়িয়ে না থেকে আমরা বরং বসে পড়ি। তুমি কি সুবৃত্ত ভুল করছ না? ভাল করে চেয়ে দেখো, স্বাগতাকে আগে কখনও দেখেছ কি? শুধুমুদু রেগে যাচ্ছ। বলতে বলতে খাটের প্রান্তে বসে পড়ে স্বাগতাকে চোখের ইশারায় কাছে ডেকে নেয় সুবোধ। নমস্কার জানাতে জানাতে এগিয়ে গিয়ে স্বাগতা খাটে সুবোধের পাশে বসে পড়ে।

সুবৃত্ত চোখ বিস্ফারিত করে স্বাগতাপর্ণাকে দেখে এবং অঙ্কিত ছবির সঙ্গে

মিলিয়ে নিতে নিতে শান্ত গলায় দৃষ্টি মোলায়েম করে নিয়ে বলে, আমি নামের সঙ্গে মুখ মনে রাখতে না পারলেও, আমোদীর মুখ চিনব না এ হতে পারে না।

স্বাগতা নরম করে বলল, আমার নাম আমোদী নয় সুবৃত্ত।

—আমোদী কারও নামই নয়, কিন্তু তোমাকে ওই নামটাই দিচ্ছি। তুমি ভাল করে জানো চেনটা সোনার ছিল না। কত দাম ছিল?

—আমি ইমিটেশন পরি না সুবৃত্ত। আমি আমোদী নই।

—তুমি যাদবপুরে পড়তে না?

—না।

—এই ছবির মুখটা কার?

—কার জানি না। তবে আমার নয়। আশ্চর্য হচ্ছি, অনেকটা আমারই মতো।

—তোমরা চার বন্ধু ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিলে? কখনও?

—না।

—সুচেতন তোমার বন্ধু নয়?

—না।

—'না' বলতেই শেখানো হয়েছে তোমায়।

—আশ্চর্য! আমি যা নই, আমি তা হব কী করে? শোনো সুবৃত্ত, আমি দর্শন এবং মনস্তত্ত্বের অধ্যাপিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি তোমার কবিতার ভক্ত। আমোদী বলে কাউকে চিনি না।

'কাউকে চিনি না' বলে গা নাড়িয়ে সামান্য মোচড় দিয়ে তীব্র অস্বীকার ফুটিয়ে তোলে স্বাগতা।

—চেনো না?

—না।

এবার সুবৃত্ত চোখ নামিয়ে কেমন হতাশায় ভেঙে পড়ে। তার এই নিঃশব্দ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে থাকে প্রত্যেকে। স্বাগতা সবার চেয়ে গভীর মনোযোগে সুবৃত্তর হতাশা অনুভব করছিল। সুবোধের কাছে বেশ কিছু তথ্য আগেই জেনে এসেছে সে। কিন্তু এ কথা ঠিক, স্বাগতা সুবৃত্তর কবিতার সত্যিই পাঠক। এবং বিশেষ অনুরাগিণী, সেই অনুরাগে উগ্র আন্তরিকতা রয়েছে। তার এই অনুরাগের প্রমাণও হাতের মুঠোয় রেখেছে পর্ণা।

পর্ণা তার চামড়ার ব্যাগের ভিতর থেকে সদ্য প্রকাশিত একটি আবৃত্তির ক্যাসেট বার করল।

—আসলে আমি এই ক্যাসেটটা তোমাকে দেব বলে এসেছি। নতুনই বেরিয়েছে। অন্য কবিদের সঙ্গে তোমারও একটি কবিতা আমি নিয়েছি। এই কবিতার ব্যাপারে

তোমাকে একটি চিঠিও লিখেছিলাম, তুমি উত্তরই দাওনি। অগত্যা সুবোধদাকে বলে কাজটা করেছি। সুবোধদাই বললে, ও তুমি করে দাও, আমি সুবৃত্তর কাছে অনুমতি চেয়ে রাখব। নাও। এতে আমার পরিচিতিও দেওয়া আছে। বলে ক্যাসেটটা এগিয়ে ধরে স্বাগতা।

মুহূর্তে মুখের রং বদলে যায় সুবৃত্তর। ক্যাসেটটা হাতে নিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। সত্যিই তো, এ তবে আমোদীই নয়। অথচ অসম্ভব মিল।

—এখানে দেখছি, দর্শন এবং মনস্তত্ত্বের এম. এ লিখেছ, সরি, লিখেছেন। আপনি যে অধ্যাপিকা, সে কথা লেখেননি কেন?

—চাকরিটা সদ্য-সদ্য হয়েছে। তাছাড়া অধ্যাপিকা ঠিক নয়, আমি যাদবপুরে পার্ট-টাইম করি। একটুখানি মফঃস্বলের দিকে একটা কলেজে শিক্ষকতা করি, ওটাই আপাতত পার্মানেণ্ট জব। পরে হয়তো কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসব।

—ও, আচ্ছা! এটা আপনি রেখে দিন, আমার লাগবে না। বলে ক্যাসেটটা এগিয়ে দেয় সুবৃত্ত।

খানিকটা আহত গলায় স্বাগতা বলে ওঠে, ভেবেছিলাম আপনি শুনবেন।

—ধন্যবাদ, আপনি এখন আর আমাকে 'তুমি' করে বলছেন না। নিন, রেখে দিন।

সুবোধ বলল, ঠিক আছে, রেখেই দাও স্বাগতা। সুবৃত্তর 'মুড' নেই। পরে দিও।

—ভেবেছিলাম...বলে ঈষৎ বিমর্ষভাবে স্বাগতা ক্যাসেটটা নেয়।

সুবৃত্ত বলে ওঠে, আপনি কতকগুলো ভুল ভাবনা ভেবে এসেছেন। ভাবতে ভাবতে এসেছেন। আমি কবি নই, কবিতা লিখি না। শুনিও না।

—লিখতেন।

—আপনার ক্যাসেটটা দেখে সেই রকমই মনে হল। আচ্ছা তা হলে বলুন, আমার শেষ পঙ্‌ক্তিটা কী, যার পর আমি আর লিখিনি? সম্পূর্ণ করিনি একটি ছবি। জানেন?

—না ঠিক...

—জানেন না। লাইনটা হচ্ছে, 'আকাশে বাদশা চাঁদ তারার হারেম খোলে...'

—এটা তো...

—আমার নয়?

—মানে...

—কার তা হলে? দেখুন, ওটা আমারই অসমাপ্ত এবং কবিজীবনের সমাপ্তির কবিতা। ওই লাইনেই সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা বেশ। মামা তুমি এসো তো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। বলে সোফা ছেড়ে ঘরের বাইরে চলে যায় সুবৃত্ত।

মামাও দ্রুত বারান্দায় ছুটে এসে উদ্বেগ এবং স্নেহ মিশ্রিত স্বরে বলেন, হ্যাঁ মণি।

বলো কী বলতে চাও। মনে হচ্ছে...

—চুপ ছোটমামা। এখানে নয়? পাশের ঘরে চলো। বলে মামার হাত আঁকড়ে ধরল সুবৃত্ত। মহিম গঙ্গোপাধ্যায় অভিভূত মহৎ আশ্বাসে মনে মনে পূর্ণ হয়ে উঠলেন। ওঁর মনে হল, স্বাগতা আসাতে মণির প্রতিক্রিয়া তাঁর দিকে মণিকে ঠেলছে, মণি এখন তাঁকেই বিশ্বাস করতে চাইছে।

পাশের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সুবৃত্ত। চাপা গলায় মামাকে বলল, এ নির্ঘাৎ আমোদী ছোটমামা। তুমি কী বলো?

—আমারও তাইই মনে হচ্ছে।

—সুবোধদা কিছুই জানে না। না জেনে মুখ আঁটা কলসটা নন্দন চত্বর থেকে সংস্কৃতিক জালে খেপ ফেলে তুলে এনেছে। কলসির মধ্যে ধোঁয়া পাকানো দৈত্য বাস করছে। দেখতে সুন্দরী, কণ্ঠস্বর সুস্বাদু এবং ভরাট, বিশেষ মাদকতাময়, থুতনিতে মারাত্মক অবৈধ তিল, ঠোঁট দু'টি কোমল এবং কবিতার শিশিরে প্রস্ফুটিত, মরালীর মতো গ্রীবা, চোখের পাতায় ঘন মেঘ।

—আশ্চর্য?

—কী আশ্চর্য মামা?

—তুমি এইভাবে কথা বলতে পার?

—কেন কী হয়েছে! খারাপ তো বলছি না। বাংলা উপন্যাসে এই বর্ণনাই তো দস্তুর। এটাই এখনকার স্ট্যান্ডার্ড ভাষা। কিন্তু শোনো, আমি অসুস্থ বোধ করছি। ওকে চলে যেতে বলবে! তার আগে জেনে নিও, চেনটা কোথায়? ও কি দেখেছে, আমি মরে পড়ে রইলাম, চেনটা তখনও আমার হাতের মুঠোয় অথচ ওরা চলে গেল কেন? নকল সোনার চেনের সত্যিই কত দাম? আমি চেনটা হাতে করে ওকে দেখিয়ে ডেকে উঠলাম, তখন প্ল্যাটফর্মে ওরাও নেমে পড়েছে, কারা চেঁচিয়ে উঠল, চোর, চোর! আমি মার খেতে খেতেও ডেকেছি, 'শুনুন!' ওরা চারজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখেও এগিয়ে এল না। কেন? কেন এল না? চেনটার দাম নেই, কিন্তু আমার জীবনের তো দাম ছিল মামা!

—মণি!

—ঠাকুর! তোমার কাছে বাংলার একটা পাখি আশ্রয় চাইছে! ওইই কেঁদে উঠেছিল, 'কোথায় তুমি সুচেতন, আমাকে বাঁচাও!' কার সুচেতনার কাছে এই প্রার্থনা মামাবাবু!

—সুবৃত্ত! মণি!

—আলোটা জ্বেলে দাও মামা! সমস্ত অন্ধকার হয়ে আসছে। বলেই খাটে কাত হয়ে পড়ে গেল সুবৃত্ত পাখিরা। সে তার আশ্চর্য আচ্ছন্নতার ভিতর তলিয়ে যেতে

লাগল। তার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে একটি লোকাল ট্রেন ধাবিত হতে থাকল। সারা মুখে ঘাম জমে উঠেছে। সারা দেহে আঘাতের আক্ষেপ জেগে উঠছে। মৃদু গোঁঙানি ফুটে উঠছে মুখে। কাত থেকে চিত হল সুবৃত্তর দেহ। মামা তাকে ধরে রয়েছেন। ঘন শ্বাসে স্ফীত হচ্ছে নাকের পাটা, দু'চোখে বিস্ফারিত বিভীষিকা।

—তোমার এই চেনটার কত দাম পইড়েছে দিদি! আচ্ছন্নতার ভিতর মগকন্যার কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সুবৃত্ত। দৃশ্যটা ভেসেও ওঠে চোখের সামনে। এবং সে মনে করবার চেষ্টা করে আমোদীর থুতনিতে কোনও তিল ছিল কি না। একবার মনে হয় ছিল। একবার মনে হয় ছিল না। মুখটাকে সে কি ভুলে যেতে চেয়েছিল কিংবা মনে রাখতে চেয়েছিল? কেন এমন হবে, তিলটা স্পষ্টত মনে রইল না! এবং মনে হচ্ছে তিলটা ছিল বইকি! ফলে এখন তিলসহ মুখটা ভেসে উঠছে, মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, অতএব তিল ছিল। অর্থাৎ আমোদীর তিল ছিল না। যা ছিল না, তাকেও কি স্মৃতিধার্য চিহ্ন হিসেবে মুখের উপর বসিয়ে নিচ্ছে পাগল মস্তিষ্ক? সভ্য মানুষের স্নায়ুকোষ এভাবে কষ্ট দেবে কেন মানুষকে!

—মামা!

—হ্যাঁ, মণি!

—মগরার মেয়েটা দাম জানতে চাইছে! আমোদী একটুখানি মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, তোমায় বলব কেন? দাম কেন বলল না! দাম বললে, আমি ওটা হাতে নিতাম না ঠাকুর!

—হ্যাঁ সুবৃত্ত। নিশ্চয় তুমি নিতে না। তোমার এই সেক্রেড ডিজিজটা তা হলে হত না খোকা!

—কেন বলল না দাম!

—দাম এত কম এবং গুমোর ছিল তো!

—আহ্, খুব কষ্ট মামা! আলোটা জ্বেলে দাও!

বিভীষিকা চোখের সামনে, অন্ধকার ক্রমশ বিস্ফারিত হচ্ছে। তলিয়ে যাচ্ছে সুবৃত্ত। ধীরে ধীরে তার গলার স্বর বসে যাচ্ছে।

—দাম কত পইড়েছ দিদি!

—তোমার তাকে কি! তোমাকে বলব কেন! হাত সরাও। মগরার মেয়ের হাতটা সরল না মা। সরু হাতে লোম ছিল, রগের উপর সেই লোম গজিয়েছে, মরচে রঙের সালোয়ার, কচি কলাপাতা রঙের কামিজ, ফ্যাকাশে নীল রঙের উড়নি। পায়ে হলুদ ফিতের হাওয়াই চপ্পল। আঙুলে শাঁখা আর তামার তারের আংটি। ঠোঁট একটু অস্বাভাবিক ছুঁচলো, উটের মতো কপাল, পিঠ খাদালো করে বুক চেতানো, ছোট বুক। গায়ে মরিচের সঙ্গে আঁশটে গন্ধ। অথচ নরুনের মতো চোখে সুর্মা ঢালা। মগের

মেয়ে হাত সরাল না। আমোদীও দাম বলল না। কষ্ট হচ্ছে মা গো!

বলতে বলতে চক্ষু বিস্ফারিত সুবৃত্ত জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। তার গলা শুকিয়ে এসেছে। গলা নেমে যাচ্ছে। মুখে ঘামের ফোঁটা আরও বেড়েছে। মামা ফ্যানের পয়েণ্ট আরও বাড়িয়ে দিলেন। তবু আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে গেল সুবৃত্ত। গলার স্বর খাদে নামতে নামতে বুজে গেল। একই সঙ্গে মগকন্যা এবং আমোদীর গলা সংলাপে বাঁধছিল সুবৃত্ত এবং এক সময় ফ্যাসফ্যাসে হয়ে সমস্ত স্বর বুজে গেলে ভাষাহীন পাখির মতো হয়ে উঠল ঠোঁট, যেন মুখটা তৃষ্ণার জল চাইছে। শরীরের আক্ষেপ পর্যন্ত থেমে পড়েছে।

মহিম গঙ্গোপাধ্যায় দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় চলে এসে একখানা আধভেজা তোয়ালে টেনে নিলেন। তাঁকে দেখে বাকি সবাই দ্রুত ছুটে চলে আসে। গাঙ্গুলি কাউকে কিছু বলেন না। তোয়ালে দিয়ে ভাগ্নের ঘাম মোছাতে থাকেন ঘরের মধ্যে এসে। অন্যরা ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছে।

সুবৃত্তর গায়ের পাঞ্জাবি খুলে ভিতরের স্যান্ডোগেঞ্জিটাও একবার খুলবার চেষ্টা করে কী মনে করে থেমে গিয়ে মামা বললেন, স্বাগতার সঙ্গে আমি একান্তে গুটি কতক কথা বলতে চাইছিলাম। পরে সুবোধের সঙ্গেও বলব। সাগরী, তুই সুবোধকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যা। না, তোরা বরং এখানে মণিকে পাহারা দে। আমরা ঘরেও যাচ্ছি। খোকা যদি জেগে উঠে আমাকে খোঁজে, খুব স্বাভাবিক গলায় বলবি, আমি রয়েছি। মণির সামনে কখনও কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করবে না। মুখ কালো করে থাকবে না কেউ। সব সময় স্বাভাবিক আচরণ করবে। সুবৃত্ত সুস্থ, এ কথা ভেবে কথা বলবে। ঠিক আছে? এসো স্বাগতা।

পাশের ঘরে এসে স্বাগতাকে সোফায় বসতে নির্দেশ করলেন মহিম এবং নিজে চেয়ার টেনে নিয়ে সম্মুখে ঝুঁকে পড়ে গাঢ় গলায় বললেন, আচ্ছা, সুবোধের সঙ্গে তোমার কী কথা হয়েছে স্বাগতা? আমাকে ঠিক করে বলো তো। তুমি আগে কখনও সুবৃত্তকে দেখেছ? তুমি ওর কবিতার ভক্ত হলে কী করে? সুবৃত্ত তোমাকে বিশ্বাস করেনি। তোমাকে দেখেই ওর উত্তেজনা বেড়ে গেল। এই অবস্থায় কী করা উচিত বলে মনে করো?

স্বাগতাপর্ণা মহিমের কথাগুলো ঈষৎ আহত ভঙ্গিতে মন দিয়ে শুনল। একটু আরক্ত হল মুখমণ্ডল। সেই রংটাও মুহূর্তে মুখ থেকে সরিয়ে ফেলে পর্ণা শান্ত গলায় বলল—অবিশ্বাস করাটাই তো ওর অসুখ মামাবাবু! ও ওর রোগটাকে মনের মধ্যে খুঁজছে। ওকে বোঝাতে হবে রোগটা মনে বাসা বাঁধলেও বাইরের আঘাত এসে পড়েছে বলেই কষ্ট পাচ্ছে। ওর মনে ভয় এসে জড়ো হয়েছে, ও মানুষ সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এই অবস্থায় সুবোধদা মনে করে, আমিই ওর উপযুক্ত চিকিৎসক।

কিন্তু আমি তো আর সত্যিই ডাক্তার নই। সুবোধদাকে বলেছি, আমার দ্বারা এক রত্তি কাজও যদি হয়, তা হলে নিশ্চয় আমি যাব। এখন এসে পড়ে বুঝতে পারছি, ভক্তের দেওয়া সামান্য সম্মানও ও নিতে চায় না। দুর্ভাগ্যজনক, আমার মুখের আদলটা সুবৃত্ত আগে থেকেই এঁকে রেখেছে।

—দুর্ভাগ্য বলছ কেন?

—তা নয়! আমি তো আর সত্যিই আমোদী নই।

—বেশ তো, তা যখন নও, তা হলে প্রমাণ করো, তুমি আসলে যা, তুমি তাইই।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—কী ভাবে এগোবে?

—আমি ওর সমস্ত কবিতা পড়ে এসেছি। তাতে করে সহজেই বুঝতে পারছি, 'আকাশে বাদশা চাঁদ তারার হারেম খোলে'—এটা ওর লাইন নয়। শুনলে আশ্চর্য হবেন, এই শেষ কবিতা পঙ্‌ক্তি সমর সেনের রচনা। এরপর ওই মার্ক্সবাদী কবি আর কোনও কবিতা লেখেননি। কবিতার জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। এভাবে থেমে পড়াটাও অদ্ভুত। তবু ওকে কবিতার পথ ধরেই...এবং আমি...এগোব নিশ্চয়।

—সুবৃত্তর থেমে পড়াটাও অদ্ভুত নিশ্চয়?

—আরও অদ্ভুত। তার অকাট্য ধারণা হয়েছে, কবিতা দিয়ে কিছু হওয়ার নয়।

—অথচ কাব্যই ওর সর্বনাশ করেছে স্বাগতাপর্ণা। 'কোথায় তুমি সুচেতন, আমাকে বাঁচাও!' আমোদীর এই বলে ভয়ার্ত চিৎকার ওর মধ্যে কাব্যের বাচিক উদ্দীপনা ঘটিয়েছিল, মুখের কথাটাকে সে কাব্য ভেবে ভুল করেছিল। এ কথা সে ওর ডায়েরিতে লিখে রেখেছে।

—সুবোধদা বলেছে সে কথা।

—আর কী বলেছে সুবোধ? সুবোধ কি জানত, তুমি আমোদীর মতো দেখতে?

—না, তা জানবে কী করে? আচ্ছা মামাবাবু, আপনিও কি আমাকে...

—না না। তুমি আবার আমাকে ভুল বুঝছ কেন? আমোদীর মতো মেয়ে কি আর এখানে আসবে?

—আসতে পারে, কিন্তু আমি সে নই। আমি একজন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ।

—আমোদী আসবে কেন? তুমি বলছ, আসতেও পারে। কেন? শোনো, তোমার ওই তিলটাকে সুবৃত্ত অবৈধ মনে করে।

—ও আচ্ছা, তাই নাকি! বলে একটু থেমে পর্ণা বলল—ধরে নিচ্ছি, আমোদী আসতেও পারে। আমি তাকে খুঁজে বার করব। এখানে টেনে এনে দেখাব, আমি আর সে এক নই, দু'জন একই চেহারার হলেও কত পৃথক। এবং কতখানি অমিল

সত্ত্বেও দু'জনই এই কলকাতায় অবিকল রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। এই তিলটা, আচ্ছা ঠিক আছে।

—দু'জন কখনও হুবহু এক হয় না পর্ণা। ওই তিল দেখে...

—সেই কথাই তো বলছি মামা!

—আচ্ছা বেশ। কিন্তু তুমি আমোদীকে পাবে কোথায়?

—সুবোধদা বলেছে, সুচেতন চৌধুরী নামে একজনের সঙ্গে যাদবপুরের ইউনিভার্সিটি হস্টেলে দেখা হয়েছিল। সুবোধদাই দেখা করে। এই লোকটা আমোদীর সঙ্গে সুবোধদা অথবা সুবৃত্তর দেখা যাতে না হয় সেই চেষ্টা করে। আমোদীকে লুকিয়ে ফেলে লোকটা।

—কেন? তা কেন করবে? আচ্ছা, সুবোধকেই তা হলে এবারে ডেকে সব কথা শুনতে হচ্ছে—কী বলো? আচ্ছা, সাগরী কি এই সব কথা জানে?

—সাগরী কে?

—সুবৃত্তর মা।

—সুবোধদাকেই ডাকুন। বলি কি, সুবৃত্তর জানা দরকার, আমোদীর সঙ্গে সুবোধদারও দেখা হয়নি। হতে পারে মেয়েটা ততটা নিষ্ঠুর ছিল না। আমি আমোদীর মতো দেখতে, অতএব বলতে পারি, সুবৃত্তর সঙ্গে দেখা না করাটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। অর্থাৎ এই ধরনের একটা অভিনয় আমাকে করতে হতে পাবে। আপনি কী বলেন?

—এ কথা সুবৃত্ত আগেই টের পেয়েছে স্বাগতা। তুমি আমার ভাগ্নে মণির সঙ্গে কখনও অভিনয় করতে এসো না। প্লিজ! তুমি চলে যাও। এখানে তোমার কোনও জায়গা নেই। তুমি একই রকমভাবে পাঁচজন কবির ভক্ত। তুমি প্রত্যেক কবিকে ক্যাসেট উপহার দিয়ে বেড়াচ্ছ।

—কী বলছেন আপনি মামাবাবু!

—হ্যাঁ ঠিকই বলছি। সুচেতনের নেশা তোমার কেটে গেছে। তোমার অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বাগতাপর্ণা। তুমি প্রকৃত কবির মন কখনও বুঝবে না। একজন কবিকে শেষ করে দিয়ে তাকে ক্যাসেট প্রেজেন্ট করে সান্ত্বনা দিতে এসেছ?

মহিম গাঙ্গুলির উত্তেজনা দেখে আশ্চর্য বিহ্বলতায় চুপ করে যায় স্বাগতা।

—আচ্ছা স্বাগতা, তুমি কতজন মানুষকে পাগল করতে পারো? মহিমের এই কথায় নাড়া খেয়ে কেঁপে উঠল পর্ণা। চোখ মেলে দেখল দরজার কাছে ওরা তিনজন এসে দাঁড়িয়েছে। বিধ্বস্ত সুবৃত্তকে গায়ের সঙ্গে পাশ থেকে জাপ্টে রয়েছে সুবোধ।

ওদের দেখে গলা আরও উচ্চে তুলে মহিম বললেন, তুমি কেন সুচেতনকে বিয়ে করলে না? বাগদান করেছিলে তুমি। করনি?

স্বাগতা সুবৃত্তকে শান্ত দৃষ্টিতে দেখল কয়েক নিমেষ। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমি সুচেতনকে বিয়ে করেছিলাম। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

—ওহ্, তা-ও হয়েছে! বাকি কী রেখেছ তা হলে?

—আপনি চিকিৎসক। এই সব ঘটনাকে ঘৃণা করছেন কেন? সুচেতন একটি ভুল নাম। তার সঙ্গে বনল না বলে বিচ্ছেদ হয়েছে। যদি বলি, সুবৃত্তই শেষ পর্যন্ত এই বিচ্ছেদের জন্য দায়ী।

—কী বলতে চাইছ তুমি, খোলসা করে বলো তো।

—সে সব অনেক কথা মামাবাবু! কিন্তু বিশ্বাস কেউ করবে না। একজন এমন কেউ নেই, যাকে আসল ঘটনা বলে মনটা হালকা করব। তবে দর্শন আর মনস্তত্ত্ব আমার বিষয়, আমি সহজে পাগল হই না। সুচেতন একটা গালভরা নাম। কবি জীবনানন্দের পর এই ধরনের নাম রাখা চালু হয়েছে। ব্যাস!

—ওকে তা হলে বিয়ে করলে কেন?

—সুবৃত্ত বোঝেনি। আমিও বুঝিনি মামাবাবু! বলে মুখ নিচু করল পর্ণা। হঠাৎ তারপর মুখ তুলে বলল, সুবৃত্ত একবার ক্ষণিকেব ভুল কবেছে। আমি গোটা জীবনটাকেই ভুল দিয়ে সাজিয়েছি। সুচেতন কাউকে বাঁচায় না মামা! আমি শেষে ওর পায়ে পড়ে বলেছিলাম, মাত্র একটিবার আমার প্রিয় কবির কাছে যেতে দাও সু!

—সু! বলে অবাক হল সুবৃত্ত এবং সুবোধের কাঁধে মাথা রেখে বলল, আপনি কিন্তু বানিয়ে বলছেন সমস্ত। আপনি সুচেতনকে চেনেন না। কখনও সম্পর্ক ছিল না। দেখলে চিনতে পারবেন? বলুন, তা হলে লোকটা কোথায়? আচ্ছা, মগরার উটকপালী, রগওঠা লোমঅলা, বংচটা সালোয়ার কামিজ, হলদে হাওয়াই চপ্পল পরা, ছোটবুক, মরচে রঙা এবং তামাটে ঘাম মেয়েটাকে মনে পড়ে?

—আমি খবর রাখি না সুবৃত্ত।

—আপনি আমোদী সেজেছেন কেন?

এবার চমকে উঠে সোফা ছেড়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল স্বাগতা। এবং দৃঢ়স্বরে বলল, মনে করে দেখুন সুবৃত্ত, এই তিলটা আমোদীর থুতনিতে ছিলই না। তাই না? আমি তোমার সত্যিই ভক্ত মণি! এই দেখো, তিলটা মুছে দিচ্ছি, মানাবে বলে এখানে পরেছিলাম। এই নাও, চেয়ে দেখো, আমি আমোদী নই। বিশ্বাস করো, আমি খারাপ নই। আমি তোমাকে ভালবেসেই এখানে এসেছি। বলে সুবৃত্তর পায়ের কাছে বসে পড়ল পর্ণা। ওর থুতনির তিল ধেবড়ে গেছে।

রাস্তায় নেমেও বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুবোধ। স্বাগতাপর্ণাও কথা বলছিল না। ওরা চুপচাপ একটি সাইকেল রিকশায় উঠে বসল পাশাপাশি। সুবোধ খালি রিকশাওলাকে স্টেশন যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে ফের আগের মতো চুপ করে গেল। বোধহয় সে মনে মনে অনেক কিছু চিন্তা করছিল।

স্বাগতা একবার ঘাড় বাঁকিয়ে সুবোধের মুখ নিরীক্ষণ করল। তারপর বলল, খুব ভাবনায় পড়ে গেলে তো সুবোধদা!

—হ্যাঁ স্বাগতা, তোমাকে আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি কে, সত্যিই বলো তো!

—আবার কে! আমিই আমোদী।

—তা-ও তো মনে হয় না।

—আচ্ছা বেশ। তা হলে ধরো, আমি স্বাগতাপর্ণা। হা হা হা! সুচেতন তোমাকে কী বলেছিল?

—তুমি নেই। তুমি চলে গেছ।

—কোথায়?

—মুর্শিদাবাদ। বাড়ি চলে গেছে ইত্যাদি বলেছিল সুচেতন।

—আমার নাম বলেনি তোমাকে?

—হ্যাঁ। বলেছিল খুকু এখানে থাকে না।

—তারপর?

—খুকুই বলেছিল। তুমি খুকু?

—না। আমার ডাকনাম নূপুর। যাক গে। খুকুও বলতে পারে কেউ। মা আমাকে খুকু বলে ডাকে বইকি। অতএব দেখা যাচ্ছে, তুমি সুচেতনের কাছে কিছুই জানতে পারনি। শোনো সুবোধদা, আমি সুবৃত্তর চোখ দু'টো একদম ভুলতে পারছি না।

—তোমাকে সঙ্গে এনেছিলাম স্বাগতা। ভেবেছিলাম সুবৃত্তর ভাল হবে।

—সেই পথেই তো এগোচ্ছি সুবোধদা।

—কী করে?

—ওর সঙ্গে আমার একটা র‍্যাপোর্ট তৈরি হবে। প্রেম ; প্রেম গড়ে উঠবে। আমি ধীরে ধীরে ওকে পাগলের মতো ভালবেসে ফেলব। এটাই চিকিৎসার উপায়।

সুবোধ আবার কিছুক্ষণ চুপ করে গেল। হঠাৎ তারপর প্রশ্ন করল, তুমি থুতনিতে তিল এঁকেছিলে কেন?

—ওটা তো মাঝে মাঝে দিই। এমনি শখ। কিছুই না। আচ্ছা ধরো, ওটা আমার নার্সিসিজম। কেন কি, সত্যিই তো আমি আমোদী হতে চাই না। কেন হব? আমি কি আর সত্যিই তেমন যে, আমার কারণে একজন চোখের সামনে মরে যাবে, আমি চুপ করে থাকব! তাই ভেবেছিলাম, থুতনিতে তিলটা বসালে আমাকে একেবারে অন্যরকম দেখাবে।

—তুমি নকল তিল আঁকো, নকল গহনা পরো খুকু!

—সুবোধদা! আমি তিলটা মুছে ফেলে বলেছি, আমিই আমোদী, মুখটা যাতে সুবৃত্তর স্পষ্ট মনে পড়ে। ও ঠিকই বুঝেছে, আমি আমোদী নই, অন্য কেউ। অথচ কাজটা হচ্ছে...

—কী?

—আমোদী সেজে তোমার ভাইটিকে সারিয়ে তোলা। নকল গয়না গলায় পরা।

—হায় ভগবান! মানুষ কী দুর্বোধ্য। শোনো স্বাগতা, আমি একটু অন্যদিকে যাব। এই পাড়ায় আমার একটু কাজ আছে, আমি নেমে যাচ্ছি। দাঁড়াও তো ভাই একটুখানি। ওহে রিকশা, শোনো। একে স্টেশনে পৌঁছে দিও। কত ভাড়া? চার টাকা। এই নাও। আচ্ছা স্বাগতা, পরে দেখা হবে। বলে ভাড়া মিটিয়ে সুবোধ ঘাড় গুঁজে একটি গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল, যেন সে পালিয়ে চলে গেল। স্বাগতা স্তম্ভিত, বোকা, ব্যথিত ; অপমানে মুখ কালো হয়ে গেছে সে একা আকাশে চোখ তুলে নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল। রিকশা চলতে শুরু করল।

এবং ট্রেনে করে উলো দিকে চলে গেল স্বাগতা। মগরাহাট স্টেশনে নেমে একলা ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটা অত্যন্ত নোংরা হোটেলে ভাত খেয়ে বমি করে ফেলল। হোটেলঅলা অপরাধে মুখ কাচুমাচু করে বারবার শুধাতে থাকল—কী হয়েছে দিদি, শরীর খারাপ? ভাতে কিছু ছিল?

—হ্যাঁ ছিল।

—কী ছিল দিদি?

—হিংসা। বিদ্বেষ। ঘৃণা। আমাকে দেখেই মনে করেছ, একে বিষ দিলেও খাবে।

—ছিঃ। ছিঃ। আমরাও মানুষ দিদি। অমন কথা বলবেন না।

অত্যন্ত অসুস্থবোধ করছিল স্বাগতা। বাড়ি থেকে অল্প টিফিন করে বেরিয়ে এসেছিল এবং সুবৃত্তদের ওখানে চা-বিস্কুট ছাড়া কিছুই খায়নি, ফলত স্বাগতার পেট

খিদেয় চোঁ চোঁ করছিল। স্টেশনে পৌঁছে কী যে খেয়াল হল, এদিকে চলে এল। 'এদিকে দক্ষিণ' নামে পরেশ মণ্ডলের একটি পুরনো কাব্যগ্রন্থের নাম মনে পড়ল স্বাগতাপর্ণার। 'এদিকে দক্ষিণ' মানে তো এদিকে অন্য একটি কবিতার বই 'বাবা দক্ষিণ রায়ের ঘুলঘুলি চোখ'—অর্থাৎ বাঘে মানুষে টানাটানি। এই এদিকের মানুষরা নিশ্চয় সেই কবিতার লক্ষ্য, যাতে লেখা হয়েছে, বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি'—এই লাইনটা ঘুলঘুলি চোখে বাঘ দেখে, এদেরই একটা অংশ দস্যু। এরা যখন দল বেঁধে মানুষ মারে, নিরপরাধ যুবক হত্যা করে, তখন মনে হয়, এদিকে নরক। এদিকেই মগের মুলুক, সমস্ত ট্রেন ভর্তি লুম্পেন চলেছে কিন্তু সুবৃত্তর বোঝা উচিত, মানুষ মাত্রই দস্যু নয়।

—না খুকু, আমি সে কথা বলিনি। আমোদী দক্ষিণের মেয়ে নয়। কাম-পরিতৃপ্ত হোটেল ফেরতা প্রেমিকা আমোদীকে কখনও দেখেছ? সে মৌরি অথবা পানপরাগ খাচ্ছিল, পাশে তার পুরুষ, একটি লীলায়িত হাত নিজেরই কোলে হিরের আলো ঠিকরে তুলছিল। গলায় চিকন চেন ঝিকিয়ে উঠছিল। কত দাম?

—মাত্র চার টাকা। ডায়মণ্ডহারবারে পথের পাশের ঝুপড়ি দোকানে কেনা।

—মগকন্যাকে তুমি সেটা, 'নাও' বলে তাচ্ছিল্য করে দিয়ে দিতে পারতে।

—পারিনি সুবৃত্ত।

—তুমি ভেবেছিলে, সুচেতনের সঙ্গে ওই ইমিটেশন স্মৃতি হয়ে থাকবে!

—না, তা-ও ভাবিনি।

—তা হলে কী ভেবেছিলে?

—মগের মেয়েকে আমি যেন চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। ঘৃণায়।

—এবং বোঝাতে চেয়েছিলে, এত মরালী গ্রীবায়, এত উদ্ভাসিত অভিজাত কণ্ঠে নকল কিছু থাকে না।

—না সুবৃত্ত, আমি তেমন মেয়ে নই।

—তুমি তা হলে কী? হোটেলঅলা তোমার ভাতে বিষ দিয়েছে ভেবে খেতে পারলে না। বমি করে ফেললে! ওরা অপরিচ্ছন্ন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নয়।

উপরের সংলাপগুলো চলন্ত ট্রেনে জানলার পাশে বসে মনে মনে আউড়াতে আউড়াতে স্বাগতা অস্ফুট গলায় কেঁদে ফেলে নিজে হাতে নিজেরই মুখ চেপে ধরল। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নামছিল দিগন্তে।

ট্রেনে ঠাসাঠাসি ভিড়। মামার কাছে সমস্ত শুনেছে স্বাগতা। সে কেবল একটু মিলিয়ে নিতে চাইছে। কেন যেন পাগলের মতো উঠে দাঁড়াল পর্ণা। একটা আশ্চর্য ধাক্কায় প্যাসেজে চলে এল। নিউট্রাল জোন-এ সোনারপুর কারশেডের কাছে ঘোর সন্ধ্যার পরবর্তী আঁধারে তার বুকে হাত পড়ল বিকৃত মানুষের, অবাক হল স্বাগতা।

—হাত সরান।

—চোপ।

—লাগছে ছোটলোক।

লোকটা জিভ দিয়ে বোঁটকা বাঘের মতো স্বাগতার গাল চেটে দিল। কোথাও আলো নেই তা নয়, দূরে ওদিকে মিটমিটে আলো। লোকটার চোখ হলুদ সরষের মতো জ্বলছে, বাহুমূলে পার্ক সার্কাসের মরা চামড়ার গন্ধ আর রসুন, ছোট কাপড়ের ব্যাগে টিফিনের কৌটো ঠনঠন করছে, লোকটা পর্ণাকে চাটছে. মুখ চেটে দিল। ব্লাউজের তলায় ঢুকতে চাইছে। মোটা আঙুলে হিংস্র কাম দক্ষিণে সাপের মতো কিলবিল করছে।

স্বাগতা চেঁচাল—'কোথায় তুমি সুচেতন, আমাকে বাঁচাও!'

সঙ্গে সঙ্গে কারা 'হেই' করে সাড়া দিল, গোলমাল শুরু হল, কারা মজা করে হাসতে লাগল। আলো এলে সবাই চুপ। অদ্ভুত, 'সুচেতন' নামটাই বুঝিয়ে দিয়েছে, কাজের মেয়ের বুকে হাত পড়েনি। ভদ্রঘরের মেয়েকে এই সব করলে অনেকের মুখ খুশিতে চকচক করে। সবাই পর্ণাকে দেখছে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল স্বাগতা।

যাদবপুরে এসে ঝাঁপ দিয়ে ট্রেন থামার আগেই স্বাগতা প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেল। তার গা গুলোচ্ছে। মাথাটা পাগল পাগল লাগছে। তার মনে হল, পর্ণা মেয়েটা একটা আমোদী।

একটা দোকানে চার টাকার চেন কিনল স্বাগতাপর্ণা। বাড়ি ফিরে তীব্র আলোয় আয়নায় দেখল তার জামার বুকের তলাটা ব্লেডে কাটা, তখন সে গলায় চেন চড়িয়ে হা হা করে হাসতে লাগল, কেমন খ্যাপাটে গলায় নিজের বিম্বকে বলল, কী রে আমোদী! কোথায় তোর সুচেতন। এ তুই কী করলি রে!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যেন ঠিক আমোদীই আমোদীকে দেখছিল। তার গায়ের ব্লাউজ ব্লেড দিয়ে চিরে দিয়েছে অন্ধকার ট্রেনের কামরা। ব্লাউজটা খুলে ফেলল পর্ণা। ব্রা পর্যন্ত পেঁচানো, স্তনের ভারে ছিঁড়ে পড়বে মনে হচ্ছে। এখানে দক্ষিণের মেটে সাপের আঙুল ঘুলে গেছে। পার্ক সার্কাসের মরা ছেঁচা চামড়ার গন্ধ বাতাসে লাট খেয়ে বারবার এসে পড়ছে ঘরে। ঘেমো বাহুমূলের রসুন পচা ঘাম এবং ধানী লঙ্কার ঝাঁঝ সারা দেহে নরকের ক্ষুধার্ত প্রেম নিবেদন করছে। মুখে পচা ইঁদুরের গন্ধ, দাঁত না মেজেই কারখানা বা অফিসে যায়। এরাই সুবৃত্তকে দল বেঁধে মেরেছে। ভদ্রবেশী দু'চারটে শয়তানও নিশ্চয় ছিল।

গায়ের কাপড় সম্পূর্ণ ফেলে দিল স্বাগতা। ধীরে ধীরে নিম্নাঙ্গেও কিছু রাখল না। তারপর বাথরুমে ঢুকে পড়ল। অনেকক্ষণ চান করেও দুর্গন্ধ যাচ্ছিল না।

বাথরুমের আয়নায় হঠাৎ সুবৃত্তর সুন্দর দু'টি ছায়াঘন চোখ ভেসে উঠল। কী অসম্ভব মায়া ওই চোখে!

—তুমি কি কিছু বলবে সুবৃত্ত?

—হ্যাঁ।

—বলই না, কী বলবে!

—গলার চেনে জল ঠেকাবে না। রং পুড়ে কালো হয়ে যাবে। না না, পুড়ে বলছি কেন। জলের কষ লেগে মরচের মতো পচে যাবে।

—চেনটা খুলে রেখেছি। কাল যখন যাব, পরে যাব।

—আর কী পরবে?

—কী পরব বল তো!

—শাড়ি নিশ্চয় নয়।

—সালোয়ার-কামিজ না প্যাণ্ট-শার্ট?

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রাতের পোশাক পরে নেয় পর্ণা। অখিলের মাকে ডেকে তুলে খাবার বাড়তে বলবে কি না ভেবে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায় স্বাগতাপর্ণা। রাত দশটা বেজে গেছে।

—হ্যালো সুবোধদা, তোমাকে একটু জ্বালাতন করছি। কখন ফিরলে? বলছিলাম, আমোদী ট্রেনে সেদিন কী পোশাক পরেছিল?

জবাব এল অদ্ভুত ; সুবোধ বলল, আর কেন আমোদী! তুমিই জানো, তুমি কী পরে ফুর্তি সেরে ফিরছিলে! ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, তোমাকে একদম চেনা যায় না।

আঘাতটা দ্রুতই সামলে নিয়ে স্বাগতা শুকনো হাসি দিয়ে বলল, আশ্চর্য আমিও কম হইনি সুবোধদা! ভেবেই পচ্ছি না, আমি কী করে আমোদী হয়ে গেলাম!

—তুমি নিশ্চয় জানো, নীল জিনসের প্যাণ্ট আর সাদা শার্ট পরেছিলে তুমি। ফুল হাত হাওয়াই শার্ট। বেশ বড় বড় বোতাম ছিল তাতে। গলার চেনটা দুলুনি খেয়ে জামার বাইরে বেরিয়ে ঝুলে পড়েছিল। তোমার বাঁ হাতের অনামিকায় হিরের আংটিটা তখনও ছিল।

—না অনামিকায় নয়, ডান হাতের তর্জনীতে ওটা আছে সুবোধদা। তা হলে তুমি ধরেই নিচ্ছ, আমোদী ছাড়া আমি অন্য কেউ নই?

—না নও। তাই আমার ভাবনা হচ্ছে, তুমি শেষে না সুবৃত্তকে চিরকালের মতো নষ্ট করে ফেলো। কাল তুমি ওখানে যাবে না। কবে যাবে, তোমাকে আমি জানিয়ে দেব। আমিই তোমাকে ফোন করতাম, তার আগেই তুমি করলে। শোনো, মামা একটি দিন ভেবে দেখতে চাইছেন।

—ও আচ্ছা!

—তা হলে ওই কথাই রইল। শুভরাত্রি।

—হ্যালো সুবোধদা, হ্যালো: নাহ্, কেটে দিয়েছে।

রিসিভার অগত্যা রেখে দেয় স্বাগতা। তার চোখে সূক্ষ্ম জলের রেখা জেগে ওঠে। অখিলের মা ভাত বাড়তে শুরু করে খাবার টেবিলে। স্বাগতা ভাত দেখেই কেমন ভয় পায়। গা গুলিয়ে ওঠে।

দ্রুত স্বাগতা বলে ওঠে, তুমি একা খেযে নাও অখিলের মা। আমাকে একটু ঠাণ্ডা জলের লেবু শরবত করে দাও।

—কেন, শরীর খারাপ?

—বড্ড খারাপ মিনতি। আমি ঘরে গেলাম। ফোন এলে ব'লো আমি বাইরে। আর শোনো, সওয়া দশটা বাজে, পাউরুটি এনে রেখো সকালের জন্যে।

—আচ্ছা।

ঘরে এসে মৃদু নীল আলোর মধ্যে জানলার কাছে দাঁড়ায় স্বাগতা। এবং পাশের মুসলিম বাড়িটার ড্রইংরুমে চেয়ে থাকতে থাকতে বিশাল আবেগে চমকে ওঠে। ওটা কে? কী অদ্ভুত! একটি কিশোরীকে মাথা নেড়ে নেড়ে ক্রমাগত বুঝিযে চলেছে পাঠ্য বিষয়, খাতায় কী যেন খসখস করে লিখে খাতাটাকে টেবিলেঘেঁষটে ঠেলে দিচ্ছে ছাত্রীর সমুখে—এদিকে অনেকটা কাত হল সুবৃত্ত। তারপর চোখ তুলে এদিকেই চাইল। কিন্তু চাইলে কী হবে, ক্ষীণ নীল আলোয় স্বাগতাকে ছায়ার মতো দেখলেও তো চিনবে না।

দ্রুতই ডাইনিংযে চলে এল পর্ণা। মিনতি খেতে বসার জোগাড় করেছে, এমন সময় স্বাগতা বলল, শোনো অখিলের মা। খেতে বসার আগে এক মিনিটের একটা কাজ করে এসো। পাশের বাড়ির নীচের তলায় যে মুসলমান পরিবারটা থাকে, ওই বাড়িতে যে টিউটর এসেছে, তাকে একবার ডেকে আনতে হবে। বলবে, কলেজের দিদিমণি ডাকছেন। পারবে না?

মিনতি উৎসাহের সঙ্গে বলল, কেন পারব না! ওটা তো কুদ্দুসদের বাড়ি। ওরা তোমাকে খুব জানে ছোটমা। এক্ষুনি টেনে আনছি দেখো। বলে মিনতি বেরিয়ে গেল। 'ছোটমা' একটি মিঠে ডাক মাত্র, ওটা মিনতিরই মনের প্রক্ষোভ, তার কোনও এক ছোটমা নাকি স্বাগতার মতো ছিল। হায় আমোদী! তোমাকেও মানুষ 'মা' ডাকে!

সত্যিই চলে এল সুবৃত্ত এবং স্বাগতাকে দেখে থ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে ডাইনিং কাম ড্রইং-এর সোফায় বসতে উদ্যোগ নিযে বলল, আপনি এখানে থাকেন বুঝি!

—আপনি ওখানে বসবেন না সুবৃত্ত। ভেতরে আসুন। বলে ঘরের মধ্যে স্বাগতা চলে যায়। সুবৃত্ত ঢুকে এসে শুধায়, কোথায় বসব?

—যেখানে খুশি। সোফায়, চেয়ারে। খাটে। খাটে বসতে পারেন। এটা আমার একার ঘর।

—কিন্তু সুচেতন? না, সুচেতন কেউ নয়, আমি অযথা আপনাকে বিরক্ত করেছি। আচ্ছা, এখানে লোডশেডিং কেমন হয়?

—কমই হয়। কেন?

—লোডশেডিং হলে আলোর ব্যবস্থা রেখেছেন·

—হ্যাঁ।

—কুদ্দুস আমার জন্যে মাথার কাছে আলো রাখে, অন্ধকার হলেই জ্বেলে দেয়। রাত্রে ও কিন্তু ঘুমায় না। দেখি, আলো গেল, ও জেগে উঠল। এই আর কী! শুনুন!

—বলুন।

—ওই বাড়িটা আমার গোপন জায়গা। মাথা বিগড়োলে চলে এসে থেকে যাই। আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি কাউকে বলবেন না। এই আশ্রয়টুকু হারালে আমার আর কিছুই থাকবে না। একবার আমি ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা ভেবেছিলাম।

—কেন?

—ভেবেছিলাম, তা হলে আমার রোগ সেরে যাবে, আমি সুস্থ হয়ে কবিতা লিখতে পারব। কুদ্দুস তখন হেসে ফেলে মর্মঘাতী কথাটা বললে, নাস্তিকের কোনও ধর্মান্তর হয় না পাগল। আচ্ছা, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

—লোডশেডিং হলে আপনার ভয় করে? প্রশ্ন করে খাটের অন্য প্রান্তে বসে পড়ে স্বাগতা।

—ভয় মানে কী? মাথার মধ্যে ট্রেন আমাকে পিষে দেয় স্বাগতা। আচ্ছা, আপনি কী যেন সৌরভ মেখেছেন!

—না, চান করেছি। সাবানের গন্ধ।

—ও আচ্ছা। চুল না শুকলে ঘুমোবেন না। মাথায় জল বসবে। কিন্তু সৌরভটা অলৌকিক। এই সুঘ্রাণের সঙ্গে নিশ্চয় আপনাকে একা থাকতে হয়? গন্ধটা একা থাকলে মোড়কের মধ্যে বা শিশিতে, এমন কিছুই নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে থাকলে এটা একটা সুন্দর হাহাকার। ঠিক বলেছি?

—আমি কী করে বুঝব?

—এই গন্ধটাই তো আমোদীর গা থেকে পেয়েছিলাম, যখন ট্রেনের মধ্যে জানলায় পাক খেয়ে উল্টো দিক থেকে বাতাস বয়ে আসছিল। এই গন্ধটাকে পাহারা দিয়ে আগলে বসেছিল সুচেতন। আমি তখন ঈর্ষাবোধ করি। পরে মনে হয়েছিল, বিশেষ দামি এই সুঘ্রাণের পৃথিবীতে আমি কোথাও নেই। রাত কত হল স্বাগতাপর্ণা? পাখি কি আর ঘরে ফিরতে পারবে? সব পাখি ঘরে ফেরে? ফেরে

না।

সুবৃত্তর কথা শুনতে শুনতে পর্ণার চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠল। তা দেখে মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়ে সুবৃত্ত। মাথা নিচু করে থেমে পড়ে। এই মনোভাবটি পর্ণা ধরতে না পেরে তার সুস্মিত মুখটা গম্ভীর করে তোলে এবং মনে মনে অজানা শঙ্কা অনুভব করে।

—আপনি থামলেন কেন? আপনি ঘরে ফিরতে চান না? আপনি নিজেকে পাখি মনে করেন?

—যারা কবিতা লেখে তারা নিজেদের প্রতীক, রূপক, উপমা ছাড়া প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু আমার নাম সুবৃত্ত পাখিরা। আমি অগুনতি পাখির সমষ্টি। মনে কী হয় জানেন, ডারউইন যে দ্বীপে পাখিদের পর্যবেক্ষণ করতেন, এখন যার নাম ডারউইন দ্বীপ, যে দ্বীপ যোগ্যতমের জয় ঘোষণা করেছিল বা যে দ্বীপ মানুষের টিকে থাকার জন্য বাছাই তত্ত্বের উদগাতা, সেই দ্বীপে, মনে করি, এখনও বাতাসে ডারউইনের বসবার চেয়ারটা দুলিয়ে চলেছে, বিজ্ঞানী উঠে চলে গেছেন, কিন্তু কেদারার আন্দোলন থামেনি।

—তো?

—আমি সেই সব পাখি, যারা ডারউইনের চোখের সামনে উড়ছিল। সমুদ্র আছড়ে পড়ছে দ্বীপের কিনারে, বাতাসের শরীরে সমুদ্রের গান এবং ডানার ঝাপট, এই সব পাখির কোনও ঘর নেই। বলতে কি মুখ্যত এই পাখিরা প্রতীক নয়, রূপক বা উপমা নয়। এরা সত্য, এদের গলার স্বর, ডানার ঝাপটা শোনা যায় স্বাগতা। ধন্যবাদ, আপনি আমার কথাগুলি শুনছেন। চেষ্টা করলে দ্বীপের ওই দোল খাওয়া চেয়ারটা কল্পনা করতে পারবেন।

—পারি বইকি!

—কথা হচ্ছে, অদ্ভুত সবুজ রঙের একটা পাখি ওই চেয়ারে এসে বসে দুলতে লাগল। এই পাখিটিই সুবৃত্ত। এই পাখিটা আসলে সামুদ্রিক বিশেষ একটা মাছরাঙা—একটু আগে মাছ খেয়েছে অর্থাৎ কুদ্দুসদের বাড়ি মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছে। টিকে থাকার জন্য। কিন্তু চেয়ারটায় তার বসা চাই। আমি এভাবে স্ব-অভিভাবন বা সেল্‌ফ-হিপনোসিস বা আত্মসম্মোহন ঘটাই। আপনি জানেন, ডাক্তারি মতেও এটা সম্ভব। এখন আমার একটু একটু ঘুম পাচ্ছে।

—ঘুমোবেন? বালিশ দেব? শুয়ে পড়ুন তা হলে। বলে মেঝেয় নেমে সুবৃত্তর পিঠ ঘেঁষে খাটের বালিশের দিকে হাত বাড়ায় স্বাগতাপর্ণা।

—না আমোদী, কবিতার এ কোনও বিলাস নয়। এই কল্পনা আমার স্নায়ু ভাল রাখে। বাবা বলেছিলেন, মানুষের বিশুদ্ধ কল্পনাশক্তি এক ধরনের বর্ম। এই কল্পনার

মধ্যে মুক্তির আনন্দ আছে। আচ্ছা, আপনি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে নিজের জন্য ঘুম আকর্ষণ করতে পারেন? নাকি মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করে চরম আমোদ পান এবং সেই উত্তেজনা আপনাকে রাত্রে ঘুমাতে দেয় না? তা যদি হয়, তা হলে জানবেন, উন্নত কল্পনা আপনাকে বাঁচায় না, আপনাকে বাড় খাইয়ে দেয় আপনার যশের আকাঙ্ক্ষা। আপনার নামডাক হয়েছে?

—না।

—টাকা দিয়ে ক্যাসেট করিয়েছেন?

—না।

—পাঁচজন কবিই আপনার বন্ধু? মানে কবিতার পঞ্চপাণ্ডব আপনার মুখে খ্যাতির আলো ফেলেছে?

—জানি না। কিন্তু আপনি কি নিষ্ঠুর সুবৃত্ত! বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল স্বাগতাপর্ণা।

এতক্ষণে হকচকিয়ে গেল সুবৃত্ত পাখিরা। গলা খাদে নামিয়ে বলল, সরি! আমি আঘাত দিলাম। আমি যাচ্ছি! বলে খাট ছেড়ে মেঝেয় দাঁড়িয়ে ওঠে সুবৃত্ত।

—না, যাবেন না! বলে মুখ থেকে হাত নামিয়ে ফেলে স্বাগতাপর্ণা। কিন্তু সুবৃত্ত ঘর ছেড়ে ডাইনিং-এ চলে আসে, অখিলের মা ভাত খাচ্ছে। সেদিকে একবার দেখে দরজার দিকে এগোয় ঘরে না ফেরা পাখিরা।

পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছে স্বাগতা। পিছন থেকে বলে ওঠে– আমি নিজেকে সম্মোহিত করার জন্য তোমাকেই খুঁজেছি সুবৃত্ত। তোমার প্রত্যেকটা শব্দে আমি...বিশ্বাস করবে না হয়তো—তবু বলছি, তোমাকে পড়তে পড়তে কতদিন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। অনেক আগে তুষার রায়কে ভাল লাগত, সে বাঁচল না। তারপর তোমাকে কিছুতেই ছাড়তে পারি না। ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে কত রাতে তোমাকেই পড়েছি। বিশ্বাস করো মণি, আমি তোমার জন্য কী করেছি, কেউ জানে না। কেউ ঠিক বুঝতে চায়নি। সুবৃত্ত! মণি! যেও না!

সুবৃত্ত পিছনে কী মনে করে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তখনই অকস্মাৎ 'পাওয়ার' চলে গিয়ে সারা বাড়ি এবং সমস্ত পাড়া অন্ধকারে তলিয়ে গেল। একটা লোকাল ট্রেন ঢুকে গেল সুবৃত্তর মাথার ভিতর। মগকন্যা ভাসতে লাগল পাখিরার মগজে। তাকে চোখে চোখে রাখল ওরা। আদিম কঠিন হিংসা ওদের চোখে ঝলসাতে থাকল। কারখানার চাকরটা মালিকের লাথি খেয়েছে, আফিসের বস অন্য একজনকে রোজই নোংরা ভাষায় হেনস্থা করে, অন্য একজনের চাকরি যায় যায় করছে। একজনের বউ অন্যের সঙ্গে শুয়ে বেড়াচ্ছে। একজনের ছেলে বদ নেশা করে পরীক্ষায় হেটা করেছে। একজনের জমি দখল করেছে পাড়ার ক্লাব। একজনের

মেয়ে বেপথু হয়ে শোনা যায় নিষিদ্ধ পাড়ায় চলে গেছে। ভোটের সময় একজন চপার খেয়ে বেঁচে গেছে। একজনের লিঙ্গ ছোট হয়ে গেছে ডাক্তার লোধের চিকিৎসায় সামান্য বড় হলেও সে মেয়েমানুষ এখনও ভোগ করতে পারে না। একজন তো রোজই কারখানায় গিয়ে ফিরে আসছে, কারখানা খুলছে না। এরা ডারউইনের পাখিদের পেলে শিকার করে ফেলে।

সুবৃত্ত অন্ধকারে চেঁচিয়ে উঠল—মা, আলোটা জ্বেলে দাও মা! আমার ভয় করছে। ওরা অমন করে তাকাচ্ছে কেন? এটা এমন করে হাতে দিলে কেন মেয়েটা? সোনার শিকলি, কী করব এখন? আমাকে মারবে নাকি ওরা? কে আছো? আমাকে বাঁচাও সুচেতন! কোথায় তুমি সুচেতন, আমাকে বাঁচাও।

বিভীষিকার আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সুবৃত্ত। তারপর অজ্ঞান হয়ে স্বাগতার বুকে অন্ধকারে ঢলে পড়ল। তার সারা গায়ে আক্ষেপ জেগে উঠল। মৃগী রোগীর মতো দশা হল পাখিরার।

স্বাগতা কাতর গলায় বলে উঠল, তাড়াতাড়ি আলোর ব্যবস্থা করো অখিলের মা। এঁটো হাতেই ছুটে যাও। দেরি কোরো না।

মিনতি ছুটে গিয়ে আলো আনবার আগেই 'পাওয়ার' চলে আসে। তখন স্বাগতা একাই সুবৃত্তকে বুকে করে টানতে টানতে ঘরের ঘাটে এনে ফেলে। এবং মিনতিও হাত লাগিয়ে সুবৃত্তকে খাটে তুলে দেয়। তখনও আক্ষেপ চলেছে। গলায় সুবৃত্তর চিৎকার বন্ধ হয়নি, তবে ধীরে ধীরে গলা বুজে আসবে বোঝা যায়।

কুদ্দুস পাশের বাড়ি থেকে মিনতির ডাকে ছুটে এসেছিল। রং শ্যামলা হলেও দোহারা গড়নের কুদ্দুসের শরীরে'সুইট ফ্যাট' হয়েছে, তাকে কখনও থলথলে দেখায় না। চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ বিশেষ স্পষ্ট, উচ্চতায় মাঝারির চেয়ে বেশি। মুখমণ্ডল গোলাকাব হলেও থুতনিতে ঈষৎ লম্বাটে ঝোঁক তার বুদ্ধির দৃঢ়তা প্রকাশ করে, ভুরু ঘন, চোখ স্বচ্ছ এবং কিছুটা উদাস ধরনের। দেখেই যাকে ভদ্র এবং সৎ বলে মনে হয়। পাজামা-পাঞ্জাবি এবং পায়ে হাওয়াই চপ্পল। পাঞ্জাবি কিছুটা এলোমেলোভাবে গুটানো, দু'হাত হালকা রোমশ, বুকের লোম চোখে পড়ে। বাঁ কবজিতে সোনালি ঘড়ি বাঁধা, তাতে সাড়ে দশটা বেজেছে।

—কী করব বলুন তো! আপনি কী করেন এই অবস্থায়?

—ভেজা গামছা দিয়ে হালকা ম্যাসাজ দিন। চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে শান্ত করুন। বুকে হাত বোলাতে পারবেন? ওকে নাম ধরে চাপা গলায় ডাকুন, বলুন আমরা সোনপুরের মেলায় মেয়ে কিনতে যাব, জিলানি কাকা সঙ্গে যাবে। আর বলুন...আচ্ছা, আমাকে দিন। একটু সরে বসুন, আমি দেখছি। বলে ভীষণ বিস্মিত ব্যথায় খানিক বিভ্রান্ত স্বাগতার চোখে দৃষ্টিক্ষেপ করে কুদ্দুস। পর্ণা সুবৃত্তর মাথাটাকে

কোল থেকে নামিয়ে দেয় খাটে এবং বালিশ গোঁজার চেষ্টা করে। এবং কী মনে করে আবার কোলে তুলে নিয়ে সুবৃত্তর জামার ভিতর হাত ঢুকিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলে, সুবৃত্ত! শোনো, সোনপুরের মেলায় আমরা মেয়ে কিনতে যাব, জিলানি কাকা সঙ্গে যাবে। মিনতি, তোয়ালে দাও, ভিজিয়ে নিংড়ে এনো। সুবৃত্ত...

বেশ ক'বার পর্ণা মন্ত্রের মতো বলে গেল কূদ্দুসের বলা কথাগুলো। এবং বারংবার সুবৃত্তর নাম ধরে ডাকতে থাকল।

সুবৃত্ত হঠাৎ মৃদু আক্ষেপের মধ্যে জানতে চাইল—জিলানির কাঁটা কোথায় থামল সাগরী?

—মাকে মনে পড়ছে।

—হ্যাঁ।

—কী বলব?

—বলুন লাইফবয়, চিরুনি, আলতা, সিঁদুরকৌটো, আয়না পেরিয়ে মিনুর মুখে দাঁড়ানো। মিনুর দাম কত হবে পরান জিলানি? আট আনি? না, পাঁচ সিকা? বলুন, বলুন কথাগুলো।

কথাগুলো শুনতে শুনতে ঘাবড়ে যায় স্বাগতা। এ মনের কোথায় সুলুক, কোথায় সন্ধি, কোথায় হদিস, কোথায় পাকদণ্ডী, কোথায় একক নির্জ্ঞান কেউ তো জানে না, এর ধূসর স্নায়ু বল্কলে কী সংবেদন জড়ানো, অধঃমস্তিষ্কে কিসের প্রক্ষোভ, উচ্চমস্তিষ্কে কিসের বিচার, এর স্নায়ু সাংকেতিকতার নিস্তেজনা বা উত্তেজনা কীভাবে ঘটে কে বলবে।

সুবৃত্ত থেমে পড়েছে কুদ্দুসের গলা শুনে। আক্ষেপ কমেছে, মাঝে মাঝে চমকাচ্ছে দেহ।

—জিলানি কে?

—একজন অদ্ভুত মানুষ। হাটে-মফস্বলে, শহর-উপকণ্ঠে একখানা চরকি-কম্পাস কাঁধে করে ঘুরে বেড়ায়। আসলে এক ধরনের জুয়াই বলতে পারেন। চরকির চারপাশে মাল সাজিয়ে রাখে, সাবান, আলতা, সিঁদুর, আয়না, গজফিতা, মাথার কাঁটা, জুতোর কালি, কলম, টুথপেস্ট, ব্রাশ, চামচ, পায়ের তোড়া, কপালের টিপপাতা, পুঁতির মালা, আংটি, বোতাম, নেলপালিশ এই সব কত কি! টিকিট আট আনা। কেটে কাঁটা ঘুরিয়ে দিতে হয়। কাঁটা ঘুরে এসে ফাঁকে পড়লে ফক্কা, মালে পড়লে দান। আসলে চরকির তলে জিলানির পায়ের কাছে ছোট্ট প্যাডেল আছে, চেপে কাঁটাকে থামিয়ে দেওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, কখনও ঘূর্ণির রেশে ঘুরে কাঁটা মালের উপর পড়ে। দান ওঠে কারও কারও। তাইতেই ভিড় লেগে পড়ে।

—আমি এক দান খেলেছি ছোটমা। বলে ওঠে মিনতি। এবং বলে, তিনখানা ন্যাপথলিনের প্যাকেট, ছোট আয়না আর এক শিশি ছুঁচ পেয়েছিলাম। আর এক দান চালিয়ে আট আনা গচ্চা দিয়ে ক্ষান্তি দিলাম। বুঝলাম, ঠকে মরব, লোকটা লোভে টেনে জিনিসের দাম উসুল করে নেবে।

—চরকির কাঁটাটা সুবৃত্তর দানে জিলানির ছেঁড়া ফ্রক পরা করুণ মুখ মেয়ের মুখে এসে থামল। জিলানি বলল, নিয়ে যাও, আমি আর টানতি পারছি না। না লাও, আসছে সন, সোনপুরের মেলায় বেচি দিই আসব। মানুষ কি বেচে না মানুষ? অ্যাই ছুঁড়ি, মুখ টেনি ওদিকি সরে যা, কপালে তোর নিলেম আছে বলে দিচ্ছি। লিবেন নাকি বাবু, আমার মেইটাকে, সত্যিই আমি বেচি দিব বাবা! ব্যাস, সেই থেকে সুবৃত্ত আমায় মাঝে মাঝেই বলে, যাবি নাকি কুদ্দুস, সোনপুরের মেলায়? মগের মেয়েটাকে ওখান থেকে কিনে আনি চ।

কুদ্দুস কথা শেষ করে পর্ণার দিক থেকে চোখ টেনে তার দৃষ্টি বন্ধুর বোজা চোখের উপর ন্যস্ত করল। তারপর থমথমে হয়ে গেল তার মুখ। পর্ণাও লক্ষ করছিল সুবৃত্ত সমস্ত কথা শুনছে। এবং অদ্ভুতভাবে বোজা পাতা ভাসিয়ে অশ্রু নেমে আসছে গলা পর্যন্ত। মুখে ফুটে উঠছে ছদ্ম প্রসন্নতার সঙ্গে খোঁচানো ব্যথা।

—আলো এসেছে সুবৃত্ত, চেয়ে দেখো। বলে উঠল স্বাগতা।

কুদ্দুস বলল, কাঁটাটা আর কখনও হতভাগ্য মিনুর মুখের উপর এসে থামেনি। সুবৃত্ত অনেক চেষ্টা করেছে। মল্লিকপুরে চরকি-জুয়ায় অনেক পয়সা ঢেলেছে। আমিও সঙ্গে গেছি। জিলানি বলেছে, সোনপুরে যাও, এখানে আর হবে না। সুবৃত্ত একদিন দেখল, মেয়েটা আর সঙ্গে নেই। মিনু কোথায় কাকা? পরান বললে, বিহার মুলুকে বিয়ে দিলাম, তারপর শুনলাম, মেয়ে বম্বে চালান হয়েছে, আরব পর্যন্ত যাবে। তুমি নিলে না পাখিরা। তোমার ডানায় রাখলে মেয়ে আমার পরী হত! আমি কবুল করি, মনিষ্যি মনিষ্যিরে বেচি দেয় বাবা! সেই টাকায় জুয়া নাগিয়েচি বাবু! জিলানির কথার ধাক্কাটা এখনও যেন সুবৃত্তর শরীরে এসে লাগল। সুবৃত্ত কেঁপে উঠল। কুদ্দুস চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ কুদ্দুস বলল, আর নয়। ওকে এবার আমি নিয়ে যাব। ওঠো মণি, আমার সঙ্গে চল। আচ্ছা, আপনি একটু এদিকে শুনবেন। বলে ঘর ছেড়ে ডাইনিং-এ এল কুদ্দুস।

পর্ণা তাকে পাশের ঘরে ডাকল। নিজের পরিচয় পুরোপুরি উল্লেখ করে বলল, আপনার সঙ্গে আমার সরাসরি কখনও কথা হয়নি। মিনতি নিশ্চয় বলেছে, আমি কলেজে পড়াই। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন, সুবৃত্ত আমার চিকিৎসাধীন। দরকার মনে করলে আপনি ওর বাড়িতে...

—না না। আমি ওর বাড়িতে ফোনটোন করব না। কেন কি, সুবৃত্ত সেটা চায়

না। আচ্ছা বেশ, তাহলে রাতটা মণি এখানেই থাক। আমিও জেগে থাকব, দরকার হলেই ডাকবেন। তবু একটা কথা স্পষ্ট বলে যাই, মিনুর করুণ মুখ পাখিরা ভুলতে পারে না। পরান জিলানি কী জাত জানি না, মুসলিম না হতেও পারে। আমি লোকটাকে সন্দেহ করি। তবে হ্যাঁ, মিনু ওর মেয়েই ছিল। নারী পাচার চক্রে যুক্ত লোকটা, নিজের মেয়েকেও বেচে দিয়েছে। খুব সম্ভব এই অনুমানে ভুল নেই। মণিকে আমি ডুকরে কাঁদতে দেখেছি একা একা। আচ্ছা আসি।

কুদ্দুস চলে গেলে নিজেরই আচরণে অবাক হল স্বাগতাপর্ণা। খানিক আগেই সুবোধদা তাকে কী বলেছে মনে পড়ল। তাকে ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না। আবার একেবারে ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভাবছে না। নিজের এই রহস্যময় অগতির কথা ভেবে পর্ণার হাসি পাচ্ছিল।

সুবৃত্ত এখনও চোখ মেলেনি। তার আক্ষেপ মাঝে মাঝে হচ্ছে এবং অত্যন্ত মৃদু। স্বাগতা মিনতিকে বলল, তুমি খেয়ে নাও অখিলের মা। কোণের ঘরটায় থেকো, এক ডাকে সাড়া দিও।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ খাটের উপর উঠে বসল সুবৃত্ত। সোফায় বসে বই পড়তে থাকা পর্ণার মুখের দিকে এক খেপ দেখে নিয়ে বলল, আপনি আমাকে একটা ট্রাঙ্কুইলাইজার দেবেন। ঘুম যদি চলে আসে, আপনার জেগে থাকার দরকার নেই।

—কুদ্দুস জেগে থাকে কেন?

—লোডশেডিং হলে কী হবে, এইই তার ভয়। কোনও মানে হয়! আমি তো আলোয় ঘুমোই। ফলে ওর ঘুম হয় না। আমি এখানে থাকা মানে, কুদ্দুসের ঘুমের দফারফা। মানুষ পাগলকে এভাবে সহ্য করে দেখে ভাবি, আমি কত বড় অত্যাচারী। আপনাকে বলি, এত আলো খরচ করারও দরকার নেই। নীল আলোটা বারোটা নাগাদ বেশ জোরদার হবে, ভোল্টেজ বেড়ে যাবে, তখনই ঘুমের বড়ি খেয়ে ডারউইন দ্বীপে চলে যাব।

—যা বলবেন, তাইই করব।

—এই রাতটা কুদ্দুস ঘুমিয়ে নেবে, কাল রাতে জাগবে। ওর অন্ধকার লাগে। আপনি কী করেন?

—থাক না আমার কথা। আমি সব পারি। কাল আপনি বাড়ি যাবেন না?

—ভাবছি দু'টো দিন থাকি এখানে। আচ্ছা, আমার কাছে মানুষ এখনও প্রত্যাশা করে কেন? ভাবে, একদিন সুস্থ হয়ে কবিতা লিখব। অথচ কাউকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। কবিতার দরকার নেই। আমার কবিতা কোনও মহানিধি নয়। ভাবে, আমি গাইব। তারও কোনও মানে হয় না। সংসারে কত গায়ক-গায়িকা, কত কবি। সংসার মেতে রয়েছে স্বাগতাপর্ণা। আমি একবার এক পরিচিত মহিলা কবিকে

কথাটা বলাতে, সে বললে, আপনিও মেতে উঠুন, খারাপ কী, অন্যের রঙে বা সবার রঙে রং মেলানো তো কাজ সুবৃত্ত। আপনার এই বিশিষ্ট হওয়ার রোখটা ছাড়তে হবে। এটাই আপনার অসুখ। কেউ আমরা বিশিষ্ট নই, মনে রাখবেন। কেউ আমরা জীবনানন্দ নই, আপনার খানিকটা নাম হয়েছে তো কী! অমন কতই হয়, তার জন্য গুমোর করে মরতে হবে। ভেরি ব্যাড, এই জন্যই আপনি সুস্থ হচ্ছেন না। বাংলা অ্যাকাডেমিতে এসেছেন, আলোচকরা কতবার আপনার নামে তারিফ করেন, তাই শুনতে! কবিতা লেখেন না, কিন্তু নিজের নামটা জাগর আছে দেখতে চান। মাফ করবেন, আপনাকে আমার ভাল লাগছে না। আমরাও কিন্তু কম দিন লিখছি না পাখিরা, নামধামও হয়েছে, তা বলে নিজেকে বিশিষ্ট ভেবে শুকিয়ে মরছি না। আপনার অসুখটা কী বলুন তো খোলসা করে। ট্রেনে কী হয়েছিল?

—আপনি দয়া করে আর বলবেন না সুবৃত্ত! বলতে গিয়ে পর্ণা বুঝল তার গলা ভারী হয়ে উঠেছে। চোখে জল এসে পড়েছে।

সুবৃত্ত এক মুহূর্ত অবাক হয়ে পর্ণাকে দেখল। তারপর ম্লান করে হেসে বলল, আপনার চোখের জল আমাকে মোহগ্রস্ত করবে আমোদী, আপনার সুঘ্রাণ আমাকে মাতিযে তুলবে। আমি জীব হিসেবে আত্মনির্ভর নই, অন্যের কাঁধে মাথা রেখে চলি। নিজের অন্ধকার দূর করবার জন্য অন্যের আলো খরচ করি। এ ভাল নয়। আপনার কাছে গোপনে কবুল করছি, কিছুকাল আগে, একজন অতি তরুণ কবির প্রেমিকাকে আমার দাপের জোরে ছিনিয়ে নিয়ে খেলা করেছিলাম। মেয়েটির নাম ছিল, মেধা, সেও কবিতা লিখত, ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিতেই একেবারে চন্দনের বনে অন্যের হাত ছেড়ে দিয়ে এসে পড়ল মেধাবী নীলিমা। তারপর একদিন এক অনুষ্ঠানে আবছা আলোয় দাঁড়ানো সেই সুন্দর অতি তরুণকে কাঁদতে দেখলাম। মেধাকে বললাম, তুমি আর আমার কাছে এসো না।

—মেধা এসেছিল?

—হ্যাঁ। পাগল হওযার পর ছেড়ে চলে গেছে। শুনেছি, সেই অতি তরুণের সঙ্গে সে এখন থাকে। আমি সেদিন অ্যাকাডেমিতে ওই দু'জনকে একসঙ্গে দেখতে পাব বলে গিয়েছিলাম। মেধার প্রেমিক অনিন্দ্য আমাকে দেখে এগিয়ে এল এবং মেধাকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসে বলল, ভাল আছ পাখিরা, বলি কি, এখনই অন্ধ বন্ধ ক'রো না পাখা। লোকে বলছে, তুমি নাকি ফিনিশড্। আমি বললাম, তোমার শাপ লেগেছে অনিন্দ্য, আমি আর ভাল হব না। অনিন্দ্য বলল, এটাও আপনার অহংকার দাদা। আচ্ছা চলি! বলে সুন্দর ছেলেটা চলে গিয়ে মেধার হাত ধরল।

—মেধা এখনও আপনাকে হয়তো ভালবাসে।

—সেটা আরও খারাপ স্বাগতাপর্ণা। আমি আপনাকে বলছি, সুচেতনকে ঈর্ষা

করেই আমি আমোদীর দোসর হতে চেয়েছিলাম। আপনার মতো একটা মুখকে মনে রেখেছি, কারণ আপনার চিৎকার কবিতা হয়ে উঠেছিল। এবং দেখেছিলাম, প্ল্যাটফর্মে আপনার দু'টি ডানা যুবক দু'জন ধরে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রহারে প্রহারে মরে যেতে দেখছে। একজনের মাথায় ক্রিকেট টুপি ছিল। এইই সুচেতন। তো আমোদী কিছুই করল না, আমার তখনও হাতে ধরা চেনটা, মুখ থুবড়ে পড়ে মুখ ঘষড়াতে ঘষড়াতে আপনাকেই খুঁজছিলাম, স্টেশন চাতালে পড়ে অজ্ঞান হতে হতেও লক্ষ করলাম, আমোদী ছটফট করে ওঠে কিনা, না করল না, ওরা চলে গেল, মানুষের পায়ের ফাঁক দিয়ে লক্ষ করলাম। যুবক দু'জন, আমোদীর বন্ধু, তাকে আগলে নিয়ে চলে গেল।

—তারপর?

—সুচেতন বলেছিল। খামোখা মবের সঙ্গে জড়াতে যাব কেন, ওটা তো ইমিটেশন ছিল।

—আপনি তখন কী বললেন?

—কিছুই বলিনি। আমোদীর সঙ্গে মাত্র এক মিনিট দেখা করতে চেয়েছিলাম। তো, সুচেতন বলল, খুকু নেই, বাড়ি চলে গেছে। ওর সঙ্গে কী কথা বলতে চান আপনি? খুকু কথা বলবে না। যা বলবার, আমিই তো বলছি আপনাকে। বলছি, ওটা নকল জিনিস, দাম কত? সামান্য, খুব কম। খুবই কম। তাহলে আমরা জড়াতে যাব কেন?...ও আচ্ছা! বলে বাড়ি এলাম পর্ণা।

—তারপর?

—বাড়ি এসে রাত্রে ডায়েরি লিখতে লিখতে হঠাৎ এক সময় বুঝতে পারলাম, আমি পাগল হয়ে গেছি। লেখা ছেড়ে নিজেকে শুনিয়ে বললাম, পাগল হয়ে গেছি। আর লিখলাম না, ছেড়ে দিলাম। কেবল মেধার মুখটা মনে পড়ে মিলিয়ে গেল। আমি পাগল না হলে, অনিন্দ্য হত। ছেলেটা ভাল লেখে, মনে হচ্ছে, আপনার ক্যাসেটে ওরও একটা কবিতা আছে।

—হ্যাঁ। সবচেয়ে তরুণ বলে ওকেই বেছেছি।

—এই যে ক্যাসেটটা নিলাম না, তার কারণ অনিন্দ্যর কবিতা। ওই যে ঈর্ষা, এটাই অসুখ স্বাগতাপর্ণা। এত ক্ষুদ্র মন কবিতা লিখবে কেন? কবিতা এক ধরনের লালসা আমোদী। এতে মন রেখো না। আমাকে ঘুমের বড়ি দাও। রাত হচ্ছে।

সোফা ছেড়ে উঠে কিছুক্ষণ দেরি করে স্বাগতা তালুতে ঘুমের বড়ি আর জলের গেলাস নিয়ে এল।

সুবৃত্ত নিজেই মুখ হাঁ করে বড়িটা গলায় ফেলল, তারপর জলে চুমুক দিয়ে সব জলটাই খেয়ে ফেলল। নীল আলোয় বালিশে মাথা রেখে বলল, অনিন্দ্যর 'মেঘ

নিশীথের কোকিল' কবিতাটা আবৃত্তি করুন স্বাগতাপর্ণা। মনে হচ্ছে আকাশে চৈত্রের মেঘ, বাতাস ভারী এবং রহস্যময় গাছপালা, কোকিলটা ডেকে উঠল। ঘুমের জন্য পুরনো গানের কলি বেশ উপাদেয়। তাছাড়া কয়লা চালিত ট্রেনের পুরনো সিটির সঙ্গে গান হলে একটা মন কেমনিয়া ব্যাপার ঘটে। 'পাকিজা' ফিল্মে ওই রকম একটা আশ্চর্য সিটি শুনেছিলাম। আচ্ছা বেশ, অনিন্দ্যর কবিতাটাই হোক।

স্বাগতা আবৃত্তি করতে করতে শেষের দিকে লক্ষ করল, সুবৃত্ত ঘুমের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আবৃত্তি শেষ হলে পর্ণা ঘুমন্ত সুবৃত্তর পরিশুদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

অর্ধস্ফুট গলায় স্বাগতা বলল, তুমি অনিন্দ্যর জন্যও কষ্ট পাও! কেমন মানুষ তুমি সুবৃত্ত পাখিরা! বলে সুবৃত্তর পায়ে আলতো করে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল স্বাগতাপর্ণা। তার কিছুতেই ঘুম আসতে চাইছিল না।

পাশের ঘর থেকে আরামকেদারাখানা টেনে আনে স্বাগতাপর্ণা। ঘরের নীল মৃদু আলো আরও খানিক উজ্জ্বল হয়েছে। চেয়ারে আধশোয়া হয়ে পর্ণা সুবৃত্তর মুখের দিকে চেয়ে রইল। চেয়ে থাকতে থাকতে দৃষ্টি এক সময় ক্লান্ত হয়ে মুখে এল। পাতলা ঘুমের কুয়াশা মগজে ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর এক সময় অভাবিত ঘটনা তাকে আক্রমণ করল। কখন ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল সুবৃত্ত। এবং খাট ছেড়ে নেমে ইজিচেয়ারে ঘুমন্ত পর্ণার কাছে এসে দু'হাতে গলা টিপে ধরল, পর্ণা শ্বাসকষ্টে চোখ মেলে আর্তনাদ করবার এবং নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে ছটফটিয়ে উঠল। দু'হাত দিয়ে সুবৃত্তকে ঠেলে প্রতিহত করার আপ্রাণ প্রয়াস এবং চিৎকারের প্রচেষ্টা অখিলের মাকে ছুটিয়ে আনল এ ঘরে। পর্ণার দু'টি চোখ ঠেলে আসছে বাইরে।

—ছাড়ুন সুবৃত্ত, আমি আমোদী নই। গোঙানির মধ্যে এ কথা ফোটাতে চাইল স্বাগতাপর্ণা। অখিলের মা ঝাঁপিয়ে পড়ে সুবৃত্তকে নিরস্ত করতে না পেরে সুবৃত্তর গালে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিল। সেই আঘাতে কাজ হল, সুবৃত্ত পর্ণাকে ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে উঠল, আমি পাগল হয়ে গেছি খুকু।

গলায় হাত বুলাতে বুলাতে মিনতিকে নরম করেই পর্ণা বলল, তুমি ওকে মারতে গেলে কেন মিনতি! ও কি আর বোঝে, ও কী করছে!

—সব বোঝে! এ লোকটা ভারী সেয়ানা ছোটমা। তোমাকে খুন করে ফেলত। কেন ওকে ঘরে এনে তুললে? কী কাজে লাগবে এই মানুষ! আমি ও বাড়ির মুসলমানটাকে ডেকে আনছি।

—ছিঃ! অখিলের মা! তুমি আর কথা ব'লো না। শোনো, তুমি আলোটা জ্বেলে দাও। আমার ঘরে জাতধর্ম নেই। মুসলমান-হিন্দু, এভাবে কখনও বলবে না। তুমি

শুনে রাখো, সুবৃত্ত অসুস্থ। ওর অসুখের জন্য আমাকেই সে দায়ী করছে। আমিই হয়তো দোষী। আমি আমোদী। বেশ তো, আমিই আমোদী সুবোধদা! বলে পর্ণা এবার বেশ শব্দ করেই কেঁদে উঠল।

—তুমি আবার কাঁদতে বসলে কেন ছোটমা! এই লোকটার জন্যে! লোকটা তো হাঁ করা, মানুষ চিনতে পারো না। তুমি আমোদী কিসের! আমোদী কে? একটা লোক যদি আমোদী আমোদী করে মরে, তুমি কী করতে পারো? তোমার কাজ নেই! যন্ত্রণা তোমার নেই? একজন তো টেলিফোনে রোজ দু'বেলা ককিয়ে মরছে, তার ব্যবস্থা আগে করো। ঘটকবাবু, আবার ফোন করেছিল দুপুরে। বলেছি, ছোটমা ঘরে নেই। আপনারা দু'বন্ধুতে মিলে এভাবে জ্বালাচ্ছেন কেন? যে সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে...

—অখিলের মা! তুমি এবার চুপ করো তো! যাও। জল আনো, তেষ্টা পেয়েছে।

কান্না থেমে পড়েছিল পর্ণার। মিনতির কথা তাকে বিচলিত করে তুলেছে। সে হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। অখিলের মাকে জল আনতে বলে সে প্রসঙ্গ বদলাতে চাইল।

মুখের উপর থেকে হাত নামিয়ে সুবৃত্ত এবার সোফার উপর শিথিল দেহে পড়ে গেল। সে চরম বিস্ময়ে ঠোঁট হাঁ করে রয়েছে পাখির মতো। এ তাহলে আমোদী নয়। ঘটকবাবুরা দুই বন্ধু খালি তাকে জ্বালাতন করছে অতীত সম্পর্কের সূত্র ধরে। কেন? কী চাইছে তারা? অতীতের সম্পর্কই বা কেমন ছিল? চুকেবুকেই বা গেল কেন?

এক গেলাস ঠাণ্ডা জল পর্ণার হাত দিয়ে অখিলের মা বলল, ঘটক লোকটা ভাল নয় ছোটমা! এ তোমার ভাল করবে না। তুমি যে মানুষের মন নিয়ে এত কারবার করছ, তুমি কি সত্যিই সব মনের কথা বুঝতে পারো? কে কী বোঝে?

—না, অখিলের মা। বলে গেলাসটা হাতে নিয়ে পর্ণা সুবৃত্তর সামনে ঝুঁকে পড়ল। তারপর বলল, খেয়ে নিন।

—আপনি কী করে বুঝলেন আমার তেষ্টা পেয়েছে! বলে বেশ লজ্জিত হয়ে পড়ে সুবৃত্ত।

—আহা, ন্যাকা! বলে মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে অখিলের মা। তারপর বলে, এটাই তোমার মরণ ছোটমা। মানুষকে বড় বেশি আস্কারা দাও। একটু আগে, এই লোকটা তোমাকে মেরেছে, তাকে তুমি এইভাবে জল দিচ্ছ। এভাবে চললে তুমি বিপদে পড়বে।

—তা হলে থাক স্বাগতা! জল আমি খাব না। আমাকে ক্ষমা করুন। মিনতিকে বাইরের গেটটা খুলে দিতে বলুন, আমি চলে যাই। কেন কি, আমার মাথাটা গোলমাল করছে। আমি আপনাকে খুন করতে চাইলাম! কেন শুনবেন? শোনো মিনতি, তোমাকেও বলি। না, থাক। আমাকে যেতে দিন।

—ঠিক আছে। মিনতি খুলে দেবে। জল খেয়ে নিয়ে চলে যাবেন। নিন। বলে পর্ণা জলের গেলাস সুবৃত্তর ঠোঁটের কাছে এগিয়ে ধরে।

—ওকে জল দিও না ছোটমা! দিলে পর, ঘটকদের মতো এই বান্দাও তোমাকে ছাড়বে না। এরা সব সমান। ওর চোখের চাউনি ভাল না। একে ছেড়ে দাও। এর চিকিৎসা দরকার নেই।

—কী বলছ তুমি মিনতি!

—ঠিকই বলছি। এ লোকটা কীসেব ভাল! তোমাকে মেরে ফেলত ছোটমা! এসো তো তুমি। চলো, বেরিয়ে যাবে। রাস্তায় কল আছে, জল খাবে।

—অখিলের মা!

—হ্যাঁ ছোটমা! আমার মানুষ চিনতে দেরি হয় না। আমি রতন চৌধুরীকে প্রথম দেখেই চিনেছিলাম। বলেছিলাম, দেহের খিদে। চোখের মধ্যে জিব লকলক করছে, দিষ্টি আঠাআঠা। স্বার্থপর। বলিনি? এই দেখো, গা কুঁকড়ে এখন ভনিতে করছে, এ বোধহয় দুধের খোকা? অ্যাই, অত কিসের ঢঙ! নাও, ওঠো! জল দিও না বলছি। জল দিও না। একটা খুনী। ধ্যাৎ, বাজে লোক। এসো হে, কথার সাগর, মিষ্টি বিষ, রাস্তায় নেমে নিজেকে ছোবলাও। যাও, চলে যাও।

—এ তুমি ভুল করলে মিনতি! পর্ণা একথা বলতে না বলতেই সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে সুবৃত্ত। চোখমুখ চোরের মতো দেখাচ্ছে। ভেজা পাখির মতো বিমর্ষ, চোখে ভয়। সুবৃত্ত দু'টো হাত ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে জড়ো করে চলে আসে ডাইনিং হয়ে দরজার দিকে। দরজা খুলে দেয় মিনতি। বাইরের গেট খুলে দেয় চাবি দিয়ে। বলে, পারলে সব মানুষই খুন করে কুদ্দুসের দোস্ত। তোমার জিলানি আমার চেনা। মেয়ে না বেচলে ওর ব্যবসা উঠে যেত। তুমি ছোটমাকে কিনতে এসেছিলে? দাম জানো?

—চারটাকা অখিলের মা। কিন্তু আমার পকেটে চারটাকাও নেই। আমি মিথ্যা বলি না দিদি! আমি কখনও কাউকে খুন করিনি। আমাকে ওরা মেরেছিল।

—কারা?

—ঘটকরা।

—পাগল। যা, চলে যা! বলে সুবৃত্তর মুখের উপর গ্রিলের দোব টেনে দেয় মিনতি। সুবৃত্ত চমকে ওঠে। তারপর লাফ দিয়ে পড়ে রাস্তার উপর। এবং পালাতে শুরু করে। কুদ্দুসের বাড়ি না গিযে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। পর্ণা ভয়ানক ক্ষতির আশঙ্কায় আর্তস্বরে কেঁদে ওঠে—মস্ত ভুল হয়ে গেল মিনতি! এ তুমি কী করলে!

আকাশে মেঘ আরও ঘন হয়েছে। বাতাস আরও ভারী। একটা কোকিল তখনও ডাকছে। নাইটিপরা পর্ণা পাগলের মতো গেট খুলে রাস্তায় নেমে আসে। তারপর

গলা তুলে মিনতিকে বলে, কুদ্দুসকে ডেকে দাও মিনতি। বলো, সুবৃত্ত চলে যাচ্ছে। আমি ছুটে গেলাম, অখিলের মা! বলে দৌড়তে শুরু করে স্বাগতাপর্ণা। কিন্তু কিছু দূর ধেয়ে এসে নানা দিকে বহতা পথের কোনদিকে যাবে স্থির করতে পারে না। কত পথ। কত গলি। সুবৃত্ত কি পাখির মতোই উড়ে গেল!

রাত চারটে বেজে গেছে বোধহয়। সমস্ত পথ নির্জন। দু'একটি কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্টেশনেই যেতে পারে সুবৃত্ত। রাস্তায় ট্রেন ধরবার জন্য যাত্রীরা কেউ কেউ রিকশা ধরেছে। কাছে একটি পয়সাও নেই। একটা ফাঁকা রিকশা চলে গেল দেখেও ডাকতে পারল না। পরে মনে হল, কেন ডাকল না। পয়সা পরে দেওয়া যেত। ছুটছিল পর্ণা।

আশ্চর্য নিঃশব্দে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ার পর মেঘ ডাকল, বিদ্যুৎ চমকাল। পর্ণা ভিজে যেতে লাগল। রাস্তা আরও নির্জন হয়ে যেতে লাগল। রিকশাও আর দেখা গেল না। বাতাস উঠল আচমকা।

এমন সময় দৈবাৎ একটি রিকশা এসে বেল বাজিয়ে বলল, উঠে পড়েন, ভিজে গেলেন যে!

—হ্যাঁ ভাই। আমাকে একটু স্টেশনে পৌঁছে দাও!

—আসেন, আসেন।

রাস্তার আলো নিবে গেল। বাতাস পাগলের মতো উল্টোপাল্টা বইছে। মেঘ গর্জে মরছে। বিদ্যুৎ চিরে দিচ্ছে আক্রোশমত্ত নগরীর বৃষ্টি জড়ানো অন্ধকারকে। রিকশা থেমে গেল। রিকশাঅলা ছাউনির ভিতরে ঢুকে পর্ণাকে আক্রমণ কবল। নাইটির ফিতে একটানে খসিয়ে অন্তর্বাসহীন স্বাগতাকে দু'হাতের থাবায় পিষতে লাগল। পর্ণা বৃষ্টির উন্মাদ শব্দের মধ্যে চিৎকার করল, কোথায় তুমি সুচেতন, আমাকে বাঁচাও।

—কেউ বাঁচাবে না পুঁটি! চোপ। কেউ শুনবে না। বলে দু'হাতে করে তুলে এনে একটি দোকানের ফালি বারান্দায়, যা দোর বন্ধ করেও খালি পড়ে আছে, সেখানে ফেলল।

সহসা বিদ্যুৎ চমকে চোখে পড়ল, রিকশাটা চলে যাচ্ছে। কাতর আহত গলায় পর্ণা বলে উঠল—রিকশাটা চলে যাচ্ছে। লোক নেই, অথচ চলে যাচ্ছে। কে নিয়ে যাচ্ছে? কে?

আশ্চর্য ভয়ে চমকে উঠল রিকশাঅলা। তথাকথিত পুঁটিকে ছেড়ে রিকশার দিকে দৌড়ে যায় সে। রিকশাটাকে মূল্যবান প্রাণের মতো করে চেপে ধরে। বুঝতে পারে বাতাসে ঠেলছিল। রিকশাকে দোকানটার দিকে টেনে এনে পুঁটিকে পায় না লোকটা।

হঠাৎ কে একজন তার পিঠের দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘাড়ে। কান কামড়ে ধরেছে প্রাণপণে। কিছুতেই ছাড়ছে না।

—আমি পাগল! আমি মরে গেলেও ছাড়ব না। বলে রিকশাঅলার গোপন প্রত্যঙ্গ আক্রমণ করল সুবৃত্ত। লোকটা মেঘের গর্জনে চেঁচিয়ে উঠল। এক সময় লোকটা বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় পড়ে গেল। দম বন্ধ হয়ে এসেছে বোধহয়। পাগলটা রিকশায় চড়ে চালানোর চেষ্টা করে বলল, আমি মিষ্টি বিষ অখিলের মা!

বাতাস আশ্চর্য মত্ত। বিদ্যুৎ শাশ্বত চাঞ্চল্যে হিংস্র, বাজ ডাকছে দানবের বর্শার মতো—সুবৃত্তর মুখে মানুষের মাংসের কাঁচা গন্ধ। সে নারী-আর্তনাদ শুনেছে, 'কোথায় তুমি সুচেতন, আমাকে বাঁচাও।' যেন এটি আঁধির অন্দরে ঢুকে পড়া আদি অথচ সাম্প্রতিক কবিতা। আলুলায়িত হয়ে পাকিয়ে ওঠা হাওয়া-বিদ্যুৎ-বাজের ধোঁয়ায় একটি আতঙ্কগ্রস্ত ট্রেন মগজ চিরে ঢুকে যাচ্ছে।

সুবৃত্তর চোখ বিদ্যুৎ-ঝলসানো মাংসের মতো পুড়ে গেল। গলে গেল দৃষ্টি। সে রিকশাটাকে কিসের ভিতর দিয়ে টানছে জানে না। সজোরে ধাক্কা দিল কিসের সঙ্গে, তাও জানে না। ছিটকে পড়ল একটি শক্ত কিসে। যেন সমস্ত পাভলভপন্থী স্নায়ু ফেটে বেরিয়ে গেল। ওই স্নায়ুতে প্রজাতি-সংরক্ষণ পরাবর্ত ছিল, কিন্তু ব্যক্তি পরাবর্তও কি ছিল না! আমি কি তাহলে বাঁচব না খুকু।

সুবৃত্ত আর্তনাদ করে মহাকাশকে বলল, আমি সোনপুরের মেলায় তোমাকে কিনেছি স্বাগতাপর্ণা। তারপর এই আঁধির মধ্যে হারিয়ে ফেললাম। মামা বলেছে, আমাব অসুখ পবিত্র। কিন্তু মিনতি আমাকে তাড়িয়ে দিলে খুকু! আমি লোকটাকে খুন করে ফেললাম! দেখো, আমিও পারি। পক্ষীবংশে জন্মেও এমন চমৎকার রাতে আমি পারি সাগরী। বলতে বলতে পথের উপর ঢলে পড়ল সুবৃত্ত।

এমন সময় আবার নারীকণ্ঠ চিৎকার করল, মণি! আমাকে বাঁচাও! সুপ্ত চেতনায় ঘা পড়ল সুবৃত্তর। রিকশাটাকে হাতড়ে হাতড়ে বিদ্যুতের আলোয় পেয়ে যায় সে। সেটাকে এবার উল্টো দিকে টেনে আনে এবং এখন বুঝতে পারে, একটা লোহার গেটে সে আছড়ে পড়েছিল। রিকশার ঘণ্টি বাজাতে থাকে পাগলের মতো।

লোকটা সেই ঘণ্টি শুনে পর্ণাকে আবার ছেড়ে দেয়। পর্ণা বলে, ওভাবে বাজছে কেন?

লোকটা ছুটে এলে পাগল সুবৃত্ত রিকশার সমস্ত বাতাস ছেড়ে দেয়। এবং বলে, নে। আর যাবে না। আমি চললাম। বলে চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আসুরিক বলে লোকটার গায়ে লাথি মেরে বুঝতে পারে, লোকটা হাউমাউ করে কাঁদছে। যেন লোকটাই বাতাসশূন্য হয়ে ভেজা বস্তার মতো পড়ে গেল। তারপর বাতাস পাওয়া টায়ারের মতো ফুলে নেচে উঠে হিংস্র মগের মতো তেড়ে এল সুবৃত্তর দিকে এবং

শক্ত কী একটা মাথায় বসিয়ে দিল। তারপর বোবার মতো দুর্বোধ্য হাহাকার গলায় ছড়িয়ে উদ্ভ্রান্ত বাতাসে পালাতে থাকল।

আশ্চর্য একটা কড়া চেতনার মধ্যে আটকে বেঁচে রইল বাদল রাত্রির বিদ্যুৎ-বাজে-তমসায়-ঝরায় সুবৃত্ত। বাতাসের ফোঁপানির মতো কাছে এল পর্ণা। অপরিসীম স্নেহে রক্তজলে ভেজা সুবৃত্তর মাথাটাকে কোলে তুলে নিয়ে ডুকরে উঠল—এ তুমি কী করলে মিনতি! মণি! কথা বলো! দেখো, আমার কিছু হয়নি। শোনো, জেগে ওঠো। বলে বুকের সঙ্গে সুবৃত্তকে চেপে ধরল স্বাগতা। এবং দিশেহারার মতো ফোঁপাতে থাকল চাপা অপরাধে।

হঠাৎ একটি তীব্র আলোর ঝলক গায়ে এসে লাগল দূর থেকে। তখনই কুদ্দুসের জোরালো চিৎকার ভেসে এল—মণি, কোথায় তুমি! মণি! তখন বাতাস এবং বিদ্যুৎ কমে আসতে লাগল।

কুদ্দুস ছুটে এসেছে। জোরালো আলোটা কাছে এসে পৌঁছালো—এটি ছিল ট্যাক্সির হেডলাইট। কুদ্দুস হাত তুলে ট্যাক্সিটাকে থামাল। বৃষ্টি আরও কমে গেছে। রাস্তায় দু'একটি রিকশা নেমে পড়েছে।

কুদ্দুস বলল, আমারই ভুল স্বাগতা। মণিকে আপনার হাতে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। কাজের মেয়েরা সাধারণত ভাল মানুষ চিনতে পারে না। ওরা দেখেছি, জটিল আর স্বার্থপর লোকের সঙ্গে সদ্ভাব করে। ওরা নিম্নরুচির মানুষের গুণমুগ্ধ হয়। যাই হোক। আপনি আমার বন্ধুকে দিয়ে দিন। আচ্ছা, আপনি তো ডিভোর্সি, তাই না? লক্ষ করেছি, রতন চৌধুরী নামে একটা লোক মাঝে মাঝে আপনার বাড়ি এসে মিনতির সঙ্গে কথা বলে যায়, আপনি তখন থাকেন না। এই রতন, আমার খানিকটা চেনা হয়ে গেছে। রাইটার্সে চাকরি করে। দিন, আমিই মণিকে নিচ্ছি।

—আমি ধরব না?

—না।

—আমি সঙ্গে যাব না?

—না।

—আমাকে একলা ফেলে চলে যাবেন!

—বেশ, আপনি সামনে গিয়ে উঠুন। অনুগ্রহ করে কান্নাকাটি করবেন না। এবং বলে রাখি, মণি সুস্থ না হলে ওকে আমি ছেড়ে দেব না। আপনি কাউকে বলবেন না, সুবৃত্ত কোথায় আছে। এটা অনুরোধ। বলে মণিকে গাড়িতে একাই তুলে ফেলল কুদ্দুস।

সকাল বেলায় খবরের কাগজে চোখ বুলাতে বুলাতে স্বাগতার মনটা একটি সংবাদে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে গেল। ইটভাটায় তিনটি নিঃসহায় নারীকে দুর্বৃত্তরা

গণধর্ষণ করেছে। মেয়েগুলো ইটভাটার শ্রমিক, মাটি বইত। ওই মেয়েগুলোকে রক্ষা করার মতো কোনও কেউই ছিল না। কেউই থাকে না কখনও।

স্বাগতা ভাবছিল, তাকেই বা ওই পাগল ছাড়া কে রক্ষা করত! একবার এই মুহূর্তে সুবৃত্তকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কুদ্দুস কিছুতেই বন্ধুকে স্পর্শ করতে দেবে না। কুদ্দুস একবার ভেবে দেখতে পারত, তার বন্ধুকে খুঁজতে বার হয়ে ওই ভয়াবহ বৃষ্টিবাদলায় পর্ণা নিজেকে কতটা বিপন্ন করে তুলেছিল। কুদ্দুস জানেও না, রিকশাঅলা স্বাগতাকে কী করেছে! সে ডিভোর্সি, এটাও কি খুব বড় অপরাধ! রতন চৌধুরী গোপনে এসে মিনতির সঙ্গে কথা বলে যায়, সেই ঘটনাও কি পর্ণাকেই দায়ী করে?

খবরের কাগজখানা এলোমেলোভাবে সোফায় ফেলে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে যেন বা নির্লজ্জের মতোই তৃষ্ণার্ত চোখে পাশের বাড়ির জানলার লাগোয়া খাটের বিছানায় চেয়ে রইল স্বাগতাপর্ণা। হঠাৎ একটি উটকপালী নতুন কাজের মেয়েকে চোখে পড়ল। পর্ণার বুকের ভেতরটা চলকে উঠল। চোখ চকচক করে উঠল।

পিছন থেকে এসে ঘাড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে অখিলের মা বলল, আর কেন দেখছ ছোটমা! যেচে কেউ আপদ ঘাড়ে নেয়! ওই লোকটা নয়, একটা দমকা হওয়া তোমাকে রক্ষে করেছে! এবং সে কথা কেউ জানতেও চাইল না। তুমি কুদ্দুসকে কি বলেছ, রিকশাটা ওই রকম করে গড়াতে গড়াতে গেল কেন? তুমি তখন বললে...

—থাক মিনতি. তুমি আর কথা বলো না। রতন চৌধুরী তোমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে! কই বলনি তো?

—এ কথা কে বলল তোমাকে? নিয়মিত কীসের! দু'এক দিন এসেছে, এলে কী করব? তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ ছোটমা! শেষ পর্যন্ত তোমার এই বুদ্ধি হল!

—আহ্, এইভাবে কেঁদো না মিনতি। আমার ভাল লাগছে না। ঘটকরা তোমাকে ধরে পড়েছে কেন? কেন আসে? তোমাকেই ফোন করে। কেন করে?

—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে ছোটমা!

—তুমি সুবৃত্তকে মারলে কেন মিনতি!

—না মারলে পাখিরা ছাড়ত তোমাকে! আমার চোখের সামনে তুমি মারা পড়তে মা! এভাবে আমাকে দুষছ কেন? কে আছে তোমার, আমি ছাড়া? কেউ আছে? ওই পাগলটাকে তোমার ভয় করে না?

—না।

—ওরই হাতে তুমি মরতে চাও?

—চাই অখিলের মা! আমি ওকে ছাড়া বাঁচব না। এখন আমার অস্পষ্টভাবে মনে হচ্ছে, বাতাস নয়, রিকশার তলায় খ্যাপার মতো বসে, ওই সুন্দর পাগলটা

রিকশাটাকে ঠেলছিল। ঠিক তা-ই। একজন স্নায়ুর রোগী পাগলামির মধ্যেও প্রাণের বাজি ধরে আমোদীকে রক্ষা করে কেন?

—আমোদী! আবার আমোদী!

—আমার একটা নতুন নাম হয়েছে মিনতি! তখন শুনলে তো!

—ওই পাগলটা দিয়েছে? তাহলে আর সর্বনাশের বাকি রইল কী? তুমি মরো, আমি ঘটকবাবুদের বলছি, ওরা এসে তোমাকে উদ্ধার করুক।

—মিনতি!

—হ্যাঁ ছোটমা। তোমার ভালমন্দ আমিই দেখে আসছি, সেই কবে থেকে। আমার সন্দ নাই, রতনবাবু তোমাকে ভালই বাসে। ফিরে পাবে বলে হামলে বেড়াচ্ছে। ধরবার কাউরে না পেয়ে আমাকেই পরশু পাঁচশো টাকা ঘুস দিয়ে গেছে। দাঁড়াও, টাকাটা তোমাকেই দিয়ে দিচ্ছি। শোনো মা, আমি নেমকহারাম নই।

—তোমাকে টাকা দিয়েছে! তুমি নিতে পারলে হাত করে?

—নিলাম বইকি। কেন কী, আমি চাইছি—

—কী চাইছ তুমি?

—রতন চৌধুরী...

—নাহ্ অখিলের মা। এ করলে, আমি তো বাঁচব না। তুমি আমারই শত্রুতা করছ! এইভাবে?

—রতনকেই আবার বিয়ে করো তুমি। তুমি এখনও তাকেই ভালবাস, বাস না?

—না। শোনো অখিলের মা। তুমি মস্ত ভুল বুঝেছ আমাকে। আমি কবিতা-পাগল মানুষ। রতন আমাকে আবৃত্তি শিখিয়েছিল। কিন্তু কখনও সে বুঝতে পারেনি, আমি প্রিয় কবিতার মতোই একজন প্রিয় কবিকে প্রাণভবে ভালবাসতে পারি। না, রতন কেন বুঝেও বুঝল না! আসলে, আমার কোনও পছন্দের কবিব সঙ্গে আমাকে দেখা কবতে দিত না, পাছে আমি কবিকেই ভালবেসে ফেলি। সে গার্ড দিত। কখনও একলা ছাড়ত না। মঞ্চে আবৃত্তি করে নেমে এলে সঙ্গে সঙ্গে আগলে নিয়ে সভা ছেড়ে বেরিযে আসত। বলত, কবিরা চরিত্রহীন হয়। কেন বলত?

—মুখ্যু হলেও তোমার কষ্ট বুঝতাম ছোটমা।

—রতন বলত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সব কবিই অথবা শিল্পীই ভয়ংকর শোষক, তারা নারীকে শুষে শেষ করে দেয়। বোদলেয়ার বীভৎস কামুক, রিলকে মেয়েমানুষকে জ্বালিয়ে আত্মার শীত দূর করত, মেয়ে হল জ্বালানি। পাঁক ছাড়া কবি-শিল্পী আরাম বোধ করে না। ভাস্কর রঁদা প্রেমিক ক্যামি ক্লদেলকে খালি শুষেছে, বিনিময়ে কিছুই দেয়নি। কবি-শিল্পীর চেয়ে স্বার্থপর জীব সংসারে নেই। চিলির রাষ্ট্রনায়ক কবি পাবলো নেরুদা পর্যন্ত নারীভোগে কোনও রুচির সীমা রাখত

না—চাকরানি, শস্তা মেয়ে, বাদ রাখেনি। রতন বলত, কবিরা মেয়েমানুষের ভোগের বেলায় কোনও নীতি মানে না। বিশ্বযুদ্ধের পর কবিদের দ্বারা সবচেয়ে আক্রান্ত হয়েছে নারীর শরীর। এরা সাত সন্তানের মায়ের সঙ্গেও সহবাসে আনন্দ পায় এবং প্রেম অনুভব করে। এইসব বলত এবং আমাকে আগলে রেখে দিত। আমি বলতাম, প্রতিভাবান মানুষ কখনও এত খারাপ হতে পারে না। রতন বলত, প্রতিভা একটা শক্তি, সেটা লম্পটেরও থাকতে পারে। আজকালকার কবিরা কামুক না হয়ে যায় না। তুমি ওই কবির সঙ্গে কথা বলবে না।

—এইসব নিয়ে তোমাদেব বেধে যেত, আমি দেখেছি। মুখ্যু, তাহলেও ঠাউরেছি।

—রতন একদিন রেগে গিয়ে বলল, পল গঁগার, অত বড় পেইন্টার, সিফিলিস হয়েছিল কেন? বাংলায় এক কবির যৌনব্যাধিতে ভুগে মাথাব কোষ শুকিয়ে গেল কেন? মহামতি টলস্টয়ের উনিশটা উপপত্নী ছিল, এই লেখককে মানুষ প্রফেট বলবে কেন? এরাই মানুষকে 'মরাল' সেন্স দেবে? কেন আমি মানব? শুনে আমি বললাম, একজন রত্নাকরই তো শেষ পর্যন্ত বাল্মীকি হয়! কেউ তো ডাকাতের লেখা বলে রামায়ণকে অশ্রদ্ধা করে না। ডাকাত নয়, ঋষিই কবিতা লেখে। ব্যাস! শুনে রতন প্রচণ্ড ফুঁসে উঠে আমার গলাটা টিপে ধরল সুবৃত্তর মতো। মিনতি, তুমি আমার কষ্ট বুঝবে না, এই সব শক্ত কথা তোমার বোঝার নয়। মানুষের জীবন একটা নয়, অনেকগুলো জীবনের সমষ্টি, এই একটা জীবনকে সুবৃত্ত বলেছে, জীবনপুঞ্জ। একটা জীবন ডাকাতি কবে, আর একটা জীবন কৌঞ্চ-এর মৃত্যু এবং কৌঞ্চীর শোকেব তাড়স দেখে শ্লোক উচ্চাবণ করে। মরা থেকে রাম, ক্লেদ থেকে কুসুম। একজন লম্পট সারাজীবন লম্পট। একজন প্রকৃত কবি সর্বক্ষণ সেক্সম্যানিযাক হয় না, তার বুকে প্রেমও থাকে, সে মনে করে তার পাপেব ভাগ স্ত্রীপুত্রকন্যা, আত্মবন্ধু কেউ না কেউ নিশ্চয় নেবে। বলতে বলতে হাঁপিয়ে ওঠে পর্ণা। এবং তার দু'চোখ সহসা ছলছল করে ওঠে। সেই চোখ সে পাশের বাড়ির খাট থেকে সরিয়ে লুকোবার চেষ্টা করে। তারপর অখিলের মায়ের চোখে চোখ রেখে অপলক চেয়ে থাকে।

—তুমি রতনবাবুব অবাধ্য ছিলে ছোটমা। তোমার খুব জিদ। ওই যে কী বলে, ওই তোমার কবিতা, ওইটে পেলে হ্যাংলার মতো করো। স্বামীর সামনে অন্য পুরুষের অত গুণ গাইতে নেই। অন্য পুরুষটাকে দ্যাখইনি, এদিকে পড়তে পড়তে মত্ত হয়ে গলে যাচ্ছ, যেন ভালবাসায় সব সঁপে দিতে পারো, এটি সংসারের রীতি নয় গো।

—রতন আমাকে মারত! অথচ তখনও কোনও কবির সঙ্গে আমি একান্তে মিশিনি। মনের রোগে সে একটা কাল্পনিক মানুষকে খাড়া করে তুলল। কখনও ক্বচিৎ

কোথাও একা কোনও ᳵ ᳵঠানে গেলে টেনশনে পড়ে যেতাম। বাড়ি ফিরলে রাতে বিছানায় অসভ্যভাবে শোধ নিত চৌধুরী। তোমাকেও বলতে পারিনি মিনতি। ও আমার বুকে একরাতে সুবৃত্তর গায়ের গন্ধ পর্যন্ত পেয়েছে, কেন কি সুবৃত্ত আমার প্রিয় কবি। জানি সে আমাকে দুর্লভ ভাবত এবং মনে করত, আমি তার আগলদারিতে কষ্ট পেয়ে পেয়ে পালাবার পথ খুঁজছি। আমি থাকব না।

—ওই পাখিরাই তোমাদের সম্পর্ক নষ্ট করেছে।

—ওকে আমি চিনতাম না মিনতি।

—খুব চিনতে।

এবারে আচমকা রেগে গিয়ে পর্ণা বলে উঠল—তাই নাকি! শোনো তাহলে, তুমি ওই পাঁচশো টাকা নিয়ে চৌধুরীর কাছেই চলে যাও অখিলের মা। আমি তোমাকে আর রাখছি না।

মিনতি কপালে চোখ তুলে বলল, কী বলছ? তোমার পাপের ভাগ কাউকে না পেয়ে আমাকেই নিতে বলছ মা! তোমার ভাল হবে না। তোমার রোখ খারাপ। যাকে নিয়ে পড়, তাকে আর ছাড়তে চাও না। চৌধুরীর বেলায়ও তাই করেছিলে। তারপর নেশা ছুটে গেল। ওই পাখিও উড়ে যাবে ; তখন বলবে...না থাক। তোমাকে এক ঘণ্টা টাইম দিলাম। ভেবেচিন্তে বলো, আমি যাব না থাকব। মাথার তোমার ঠিক নেই মনে হচ্ছে। বলে ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল মিনতি।

পর্ণা জানলা ছেড়ে চলে এসে আবার জানলার কাছে গেল। মনে মনে বলল, ঘটকরা মিনতিকে ঘুঁটি করে দান জিতবে ভাবছে। আমি তোমার উপর নির্ভর করি অখিলের মা, তাই বলে আমি অসহায় নই। তুমি রতনেরই লোক।

অখিলের মাকে কি আমি বন্ধু মনে করি! কাজের মেয়ে ভাবি না? জানালায় দাঁড়িয়ে ভাববার চেষ্টা করে স্বাগতাপর্ণা। সত্যি বলতে, এই ঘরে আজ মিনতি ছাড়া কেউ কি তার রয়েছে? ক'খানা বাছাই কবিতার বই, নির্বাচিত কিছু গান, ক'খানা উপন্যাস, গল্পগুচ্ছ, আরও কিছু দেশি বিদেশি সাহিত্য এবং দর্শনের বই তার সঙ্গী। মাঝে মাঝে ভাল থিয়েটার দেখে। সিনেমাও বেছে দেখতে হয়। টিভি দেখেই না, সংবাদ শোনে।

রতনের সঙ্গে মিউচুয়াল বিচ্ছেদের পর অল্প কিছুদিন স্বাগতাপর্ণা একটি আধা-বিজ্ঞানী গোছের ছেলের সঙ্গে ভাব করেছিল। এই বাসায় ডেকেও এনেছে। শরীরের সম্বন্ধও করেছিল। সবই জানে মিনতি। বিজ্ঞানী ছেলেটা বয়সে স্বাগতার চেয়ে ছোটই ছিল। নাম রহিত, সে এখন স্টেট্‌সে চলে গেছে, ও আর ফিরবে না। চিঠি লেখে। জবাবও লেখে পর্ণা। এই সব কারণেও মিনতি হয়তো, সুবৃত্তর উপর পর্ণার এই রকম টান সহ্য করতে পারছে না। অবশ্য পর্ণা রহিতকে বিয়ে করতেই

চেয়েছিল, কিন্তু দেশ ছাড়তে চায়নি। ক্ষুধা ও যৌনতার অবদমিত দরিদ্র দেশে তার কাজ আছে। এখানে সে মনস্তাত্ত্বিক দর্শনকে স্নায়ুরোগের নিরাময়ে ব্যবহার করে আত্মপ্রতিষ্ঠা চায় এবং বাংলা কাব্যে আবৃত্তির বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে একটি সমাদৃত আসন চায়। চায়, কারণ এই দুটি ক্ষেত্রেই তার যোগ্যতার অভাব নেই। রহিতের সঙ্গে সুবৃত্তর স্বভাবে কোথাও খানিকটা মিল আছে। আবার বাগতান্ত্রিক পরাবর্তে সুবৃত্ত আরও বোধিসত্ত্ব। অথচ একে কেন যে ভাল করে খোঁজেনি স্বাগতাপর্ণা। রহিত কেন এসে পড়ল, তাকে এড়িয়ে কেন সে সুবৃত্তর কাছেই পৌঁছতে পারল না? মনের এই গতি, কেন যে এই রকম? সুবোধদা রহিতের ব্যাপারটা জানে, তবে মূল পর্যন্ত না জানতেও পারে। হতে পারে, পর্ণাকে সুবোধ ভট্টাচার্য পছন্দ করে না, সুবৃত্তর মঙ্গলের জন্য পছন্দ করেছে, এই মাত্র।

উচ্চশিক্ষিতা স্বাধীনবৃত্তির একটা মেয়ের এ যুগে বেশ ক'টি পুরুষের সঙ্গে মাখামাখি হওয়াটা অনিবার্য হতে পারে, অসহায়রূপেও হতে পারে এবং এমনকী স্বাভাবিকও হতে পাবে। সুবৃত্ত কি বুঝবে না? কী মনে করে মণি, নারীর এই দশাগুলি? মণি কি নারীর প্রাচীন সতীত্বে আগ্রহী? সে কি রতনের মতোই গোঁড়া এবং সংকীর্ণ? সে যে মেধাকে দাপটে টেনেও ফিরিয়ে দিল, অন্যকে কাঁদাতে চায় না বলে—এই মানুষ কি পর্ণাকে অনুভব করবে না? সে একটি কবিতায লিখেছিল, 'শত পুরুষে লেহন করেছে গাভীর মতো তোকে, গাভী তুমি নারী করুণাকাব্য, সৎশুচি সংশ্লোকে!' এবং একটি গদ্যে লিখেছিল, একটি পতিতাকেও কবিতা দিয়ে মন্ত্রপূত করা যায়। পতিতার পায়ে মাথা রাখলে সেরে যাবে আমার অসুখ।

একখানা পাঁচশো টাকার সবুজ নোট হাতে করে কোণের ঘর থেকে মিনতি পর্ণার শোবার ঘরে এল। নোটটা স্বাগতার চোখের সামনে মেলে ধরে বলল, এই দেখো, ভারী লোভ দেখিয়েছে আমাকে। বলেছে, একদিন নূপুরের সঙ্গে কথা বলাব ব্যবস্থা করে দাও অখিলের মা। আমি তোমাকে আরও দেব। আমি নিলাম কেন? না, তোমাকে দেখাব বলে। বলি কি, অন্যের চিকিৎসা বাদ রেখে, নিজেকেই আগে সারিয়ে তোলো ছোটমা। টাকাটা ফেরত দিয়ে, যা বলবার নিজেই বলে দিও। একদিন আসতে দাও, আমাকে বেহদ্দ জ্বালাচ্ছে গো! নাও, রাখো।

—আমার চিকিৎসা আমিই বুঝি মিনতি। না হলে, এই লাইনে থাকতাম না। যাও, ঘরের কাজ করো, টাকাটা রেখে দাও। আর শোনো, তুমিই বলেছ, সমস্ত চুকেবুকে গেছে। এই কথাটাই আমি বহাল রাখলাম। কেমন? হ্যাঁ, তুমি বলেও দিও, ওর সঙ্গে আমার কোনও কথা নেই। দেখাও হবে না। আবার বলছি, টাকাটা হাতে নিয়ে তুমি ভাল করনি।

—চৌধুরী বলছিল, নূপুর তোমাকে কোথা থেকে পেল অখিলের মা।

বারাসতের মাসি আমার জন্যই তোমাকে জোগাড় করে দিয়েছিল। আমাদের ডাইভোর্স হয়ে গেল, তুই খুকুর সঙ্গে রয়ে গেলি। আমি না হলে, নূপুর তোকে পুষত কেমন করে বল। ভাবিনি, তুই ওর কাছে এতটা পোষ মেনে যাবি।

—তো?

—আর কী বলব তোমাকে?

—ও, আচ্ছা! তুমি রান্না চাপাও অখিলের মা। আমি আসছি। বলে বাড়ির বাইরে বার হয়ে এল দ্রুত। কুদ্দুসদের বাসার গেটে এসে কলিং বেল বাজিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কুদ্দুসই বেরিয়ে এল গেটের কাছে। পর্ণাকে দেখে অবাক হল এবং বলে উঠল—আপনি! আপনাকে তো বলেছি...

পর্ণা বলল, শুনুন। আমি নূতন প্যান্টশার্ট কিনে আনছি। এই দেখুন, একটা নকল সোনার শস্তা চেন কিনেছি। আমার মনে হচ্ছে, সুবৃত্ত ভাল হয়ে উঠবে। আমি না আসা পর্যন্ত ওকে জাগাবেন না। ঘর অন্ধকার করে রাখুন। আমি হঠাৎ দেখলাম, আপনাদের কাজের নতুন মেয়েটা দখ্‌নে, মগ বলে মনে হল। আগে তো দেখিনি।

—শুকুর মামা, ভোরবেলা দিয়ে গেল। রাত্রের ঝড়বাদলায় ওদের ঘর উড়ে গেছে। এসে তক ভয়ে কাঁদছে।

—কুদ্দুস, আমাকে দয়া করুন। আমি আসছি। বলে স্বাগতা একটি জামাকাপড়ের দোকানে ছুটে গেল। প্যান্টশার্ট কিনল। বাসায় এসে একটি ক্যাসেট খুঁজে হাতড়ে বার করল। পুরনো ক্যাসেট। কানন দেবীর গাওয়া 'তুফান মেল' নামে একটি সিনেমার গান রয়েছে তাতে। রেলগাড়ির চলার শব্দে গায়িকা গেয়েছেন, 'এ দুনিয়া তুফান মেল'। গায়িকা গেয়ে ওঠার আগেই রেলগাড়ি 'পুরনো' সিটি দিয়ে চলতে শুরু করে এবং শেষে গাড়ি ফোঁস ফোঁস করে থেমে পড়ে। গানের কথাগুলোও এক্ষেত্রে উদ্দীপক মনে হল তার। সে একটি ক্যামেরাও সঙ্গে নিল, ক্যামেরার আলোর ঝলকানি বিদ্যুৎ চমকের কাজ করবে। আরও একটি ক্যাসেট, যাতে মেঘ ডাকার শব্দ। সম্ভবত গুলজাবের বৃষ্টি বিষয়ক গানের সংকলন। সেটিও সঙ্গে নিল। আরও নিল একটি।

সমস্ত সঙ্গে নিয়ে কুদ্দুসের বাড়ি ঢুকে পড়ল স্বাগতাপর্ণা। তাকে দেখে আশ্চর্য হল কুদ্দুস।

পর্ণা বলল, আমোদী এই পোশাকই পরেছিল, এই চেন, এই জিনসের প্যান্ট এবং সাদা জামা। এইসব ছিল। কাজের মেয়ে আমার এই চেনটা হাতে করে নেড়েচেড়ে শুধোবে, দাম কত পইড়েছে দিদি। তারপর ছিঁড়ে নেবে এবং অন্ধকার হবে। তখন চেনটা সুবৃত্তর হাতে গুঁজে দেওয়া হবে। আমি চেঁচাব, 'কোথায় তুমি

সুচেতন, আমাকে বাঁচাও!' এই ক্যাসেটে গণপ্রহারের হইচই আছে। এটা চলবে আলো এলে...আমাকে আপনি ডানা ধরে টেনে রাখবেন ওখানে। আমি হাত ছাড়িয়ে ছুটে যাব মণির কাছে। দু'টো ক্যাসেট প্লেয়ার প্রস্তুত রাখুন।

ঠিক তেমনই ঘটল অতঃপর। প্রথমে ঝড়ের শব্দ, ঘর অন্ধকার। ক্যামেরা অন্ধকারে মেঘের গর্জনে বিদ্যুৎ ঢেলে দিল। ক্যাসেট এবং ক্যামেরা নিপুণ সহযোগে অর্ধঘুমন্ত, আধোজাগা, ঘুমের ওষুধে আচ্ছন্ন সুবৃত্তর মধ্যে ভয়ার্ত উদ্দীপনা জাগায়। সে এখনও যেন ঝড়ের মধ্যে, বৃষ্টিতে উড়ে যাচ্ছে। তার মাথায় আঘাত করল কামুক রিকশাঅলা। সে পড়ে গিয়ে কাতরাল এবং উঠে দাঁড়াল, স্টেশনের দিকে ছুটতে শুরু করল। চোখ মেলল একটুখানি। ট্রেনের কামরা মনে হল ঘরটাকে। ট্রেনের শব্দে কাননের গলা, গান শেষ হলে স্মৃতি সুবৃত্তকে জাপ্টে ধরল।

ঘরে আলো, অল্পই। ট্রেনে যেমন থাকে। সমস্তই ব্যবস্থা করে নিয়েছে স্বাগতা। একটুখানি চোখ মেলেছে সুবৃত্ত। সামনে সোফায় বসা পর্ণাকে ট্রেনের আমোদী মনে হচ্ছে। গলায় চেন। উটকপালী মেয়েটা এগিয়ে গেল। এবং চেনটার ঝুলন্ত নিম্নাংশ মুঠোয় নিয়ে তালুতে মেলে ধরে জানতে চাইল, 'কত পইড়েছে দিদি!' বলেই টান দিল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। ক্যাসেটে ট্রেন থামার ক্রমান্বয় শ্লথ শব্দ, নিউট্রাল জোন-এ ট্রেন থেমে পড়েছে। সুবৃত্তর হাতে মগকন্যা চেনটা গুঁজে দিয়ে ভয়ে একটুখানি শব্দ করে কেঁদে ফেলল।

অন্ধকাবে চোখ মেলে সুবৃত্ত প্রথমে খাটে উঠে বসেছে। এবং পরক্ষণে মেঝেয় নেমে পড়েছে। মনে হচ্ছে আলো আসবে। আলো আসতেই ক্যাসেটে মারধরের শব্দ, তুমুল উত্তেজিত জনতা বৈজু বাওরাকে মারছে। চেনটা তুলে ধরে টুপিতে মুখঢাকা কুদ্দুসকে দেখে অবাক হল সুবৃত্ত। 'শুনুন!' বলে আর্তনাদ করল মণি। এবং কারা যেন তাকে প্রহার করছিল। আমোদীব ডানা ধরে আছে টুপিতে মুখ আড়াল করা সুচেতন। পর্ণা কুদ্দুসের কাছ থেকে নিজের ডানা ছাড়িয়ে নেয় এবং কুদ্দুসকে ধাক্কা দিয়ে দরজার ওপাশে ঠেলে দেয়। এবং স্বাগতা ছুটে এসে প্রহৃত মণিকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলে, আর ওকে মারবেন না আপনারা। ছেড়ে দিন।

কুদ্দুস দরজার দেওয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে বলে চলে—খুকু চলে এসো। ওটার দাম মাত্র চার টাকা। কেন খামোকা জড়াতে যাচ্ছ? থানাপুলিশ হবে। তখন বাজে ব্যাপার হবে। আমরা কোথায় গিয়েছিলাম জানতে চাইবে। হাজারটা প্রশ্ন, বাজে কথা, নোংরা কথা। চলে এসো। না এলে, আমি জোর করে নিয়ে যাব। চলে এসো বলছি।

—চারটাকা দাম তো কী সুচেতন! জীবনের দাম নেই!

—তুমি খুকু! বলে সুবৃত্ত বিষম অবাক হয়ে পর্ণার মুখে চেয়ে রইল। খুকুর

শরীরের ঘ্রাণ তার চেতনার মধ্যে ঠাণ্ডা বাসনার মতো প্রবেশ করছিল। চেয়ে থাকতে থাকতে সুবৃত্ত বলল, তুমি চলেই যাও খুকু। তোমাদের বিয়েতে আমি একটা আসল সোনার শিকলি উপহার দেব। আমাকে ডাকবে তো!

এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না স্বাগতাপর্ণা। তীব্র ভাবাবেগে অসহায়ের মতো ডুকরে কেঁদে উঠল। সুবৃত্তকে ছেড়ে দিয়ে চেনটা সুবৃত্তর হাত থেকে নিয়ে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রায় পাগলের মতো বলে উঠল—মানুষ মানুষের কাছে কতটুকু চায়! বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে মৃদুভাবে ফোঁপাতে থাকল।

দেখা গেল, মগকন্যা চেনটা হাতে তুলে নিয়ে লোভার্ত দৃষ্টিতে দেখে চলেছে। মুখ থেকে হাত সরিয়ে পর্ণা ঘটনাটা লক্ষ করে উঠে পড়ল এবং নতুন কাজের মেয়েকে বলল, ওটা তুমিই নাও মিনু। দাম মাত্র চারটাকা। বলে বাইরে এসে কুদ্দুসকে চোখের ইশারায় ডেকে নেয়।

চাপা গলায় কুদ্দুসকে স্বাগতা বলে, আপনি যত তাড়াতাড়ি হয়, সুবৃত্তকে বাড়ি পৌঁছে দিন। আমাকে ভুলেও ডাকবেন না।

—কেন?

—সুচেতনের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। সুবৃত্তকে আমি নেমন্তন্ন করব। আমরা দু'জনই, আমি আর সুচেতন, একসঙ্গে বিয়ের কার্ড দিয়ে আসব। তখন কথা হবে। চলি। অখিলের মা পরে এসে ক্যাসেটফ্যাসেট, ক্যামেরা, সব নিয়ে যাবে। একলা কখনও আমার সঙ্গে সুবৃত্তর দেখা হবে না। চলি তাহলে। বলে দ্রুত বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়ল স্বাগতা। নিজের বাসায় এসে মিনতিকে বলল, ঘরের সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ করে দাও অখিলের মা। এবং শোনো, রতনকে ডাকো, ফোন করে বলো, আমি রাজি আছি।

কথা শেষ করে স্বাগতাপর্ণা খাটে পড়ে অসম্ভব ছটফট করতে লাগল। বালিশে মুখ চেপে ধরে যেন সে নিজেকেই হত্যা করবার চেষ্টা করছিল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার। চোখ ঠিকরে পড়ছে, গলার শিরা ফুলে উঠেছে।

অখিলের মা বিস্ময়ের চরমশীর্ষে উঠে হঠাৎ ভয় পেয়ে জোর করে আত্মপীড়নের হাত থেকে বাঁচাতে স্বাগতার শ্বাসরোধকারী মুখের বালিশ টেনে নেবার চেষ্টা করল। ধস্তাধস্তি চলল। অবশেষে মিনতিই সফল হল। পর্ণা ছাড়ছিল না। বিদীর্ণ চাপা কান্নায় ছিঁড়ে পড়ে বলবার কথাটি বলল—আমার কোনও চিকিৎসা নেই মিনতি!

একটি দিন এবং একটি রাত অধিকাংশ সময় ঘুম এবং আচ্ছন্নতার মধ্যেই কেটে গেছে সুবৃত্তর। ঘুম থেকে জেগে উঠে অনেকক্ষণ চুপচাপ মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল সে। মাথাটা বেশ ভার হয়ে রয়েছে। মায়ের পাশে সোফায় বসা দুর্গাপুরের মামাকেও নিবিষ্টমনে কিছুক্ষণ দেখল সুবৃত্ত। তার মনের আবেশিক দশা তখনও পুরোপুরি কাটেনি। চোখের সামনে পর্ণার মুখটা বারবার ভেসে উঠছিল। মেয়েটির হাত দু'টি তাকে বারংবার ডানার মতো জড়াচ্ছিল।

সুবৃত্ত বিড়বিড় করে নিজেকেই বলল, আমার আর সুস্থ হতে ইচ্ছে করে না আমোদিনী। তোমার অভিনয় আমার ভাল লেগেছে। আমি যেন আশ্চর্য মধুর ঠাণ্ডা ছায়ার মধ্যে ছিলাম। আমার মুখে এখনও মানুষের কাঁচা মাংসের গন্ধ লেগে রয়েছে। থুঃ! বলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে।

মামা বললেন, তুমি কোথাও যেতে চাইছ? সুস্থবোধ করছ?

—অত্যধিক নার্ভের ওষুধ খাওয়াটা ঠিক নয় মামা। আমার ভেতরটা নড়বড়ে হয়ে গেছে। কবিতা লেখাটা স্নায়ুর কাজ। কিছুই না, সেটা স্নায়বিক যুদ্ধ। সংসারের সঙ্গে একলা লড়ে যাওয়া। মানুষের মাংসের কাঁচা গন্ধটা কিছুতেই যাচ্ছে না। এই ব্যাপারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল। উনি একবার, যদ্দূর মনে পড়ছে, মানুষের শরীরপোড়া গন্ধের একটা বিবরণ চাইছিলেন তাঁর লেখার মধ্যে। বোধহয়, শ্মশানের শবদহনের গন্ধে যে সন্ন্যাস অথবা ঔদাস্য অথবা হাহাকার বিষণ্ণতা থাকে, সেই অনুভূতিটা দরকার হয়েছিল।

—আচ্ছা বেশ!

—না, ঘটনাটা মারাত্মকই হল। অনুভূতিটাকে লেখায় খাঁটি করে তোলবার জন্য উনুন থেকে জ্বলন্ত কয়লা তুলে এনে উনি নিজের পায়ের উপর রেখে চামড়ার পোড়া গন্ধ শুঁকে দেখলেন, তবেই লেখার চেষ্টা করলেন। ভাবছেন, পাগলামি, না মামা, এটা পাগলামি মোটেও না। লেখাটাকে সৎ হতে গেলে সহজাত পরাবর্তে না হলে শর্তাধীন গড়ে তোলা পরাবর্তের সাহায্য নিতে হয়। আমি ঠিক বলছি? রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শ এবং দৃষ্টি সহযোগে সংজ্ঞাবাহী নার্ভে উদ্দীপনা পাঠাতে হয়,

কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থায় অনুভূতি গড়ে নিতে হলে এইরকম পাগলামি জরুরি। কাঁচা গন্ধটা এখনও পাচ্ছি এবং আমার দাঁড়া সিরসির করছে। মনে হচ্ছে আমি মানুষ খেয়েছি। অথচ আমোদিনীর শরীরে একটি আশ্চর্য সুঘ্রাণ পেয়েছিলাম। এই দু'টি গন্ধ একসঙ্গে, যাকে বলে যুগপৎ, আমার মগজে অত্যাচার করে চলেছে। এই ধরনের স্নায়ু মানুষের পক্ষে অভিশাপ মামা।

—তোমাকে ভাবতে হবে, সংসারে হাজার রকমের গন্ধ—সুঘ্রাণ যে দিচ্ছে, সেও একদিন শ্মশানে পুড়ে মানুষকে বিষণ্ণ করবে। সেকথা জেনেও একটি সুঘ্রাণকে ভালবেসে ভাল থাকতে হয়। মানুষের কঙ্কাল সত্য, কিন্তু লাবণ্যও মিথ্যা নয়।

—মামা! আপনি এভাবে কথা বলতে পারেন!

—পারি না। তোমার জন্যে পারতে হচ্ছে। এই দেখো, তোমার একটি পুরনো ডায়েরিতে এই ধরনের কথাই তোমার কলমে এসেছে, আমি পড়ে ফেলে বেশ আনন্দে অস্থির হয়ে উঠেছি। তবে হ্যাঁ, হঠাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসে পড়াতে কথাগুলোর অন্যমাত্রা 'ফিল' করলাম।

—হ্যাঁ, একটি সুঘ্রাণের কাছে পৌঁছতে অনেক দুর্গন্ধ মাড়াতে হয়। কিন্তু আমোদিনীর ঘ্রাণ দুর্লভ হলেও প্রতারক হতে পারে।

—কেন?

—এই যুগে এই মেয়েরা কাউকেই ভালবেসে উঠতে পারে না। আমোদিনী কি সত্যিই সুচেতনকে বিয়ে করবে?

—কেন? এই রকম বলছ কেন?

—এরা অত্যন্ত কেরিয়ার সচেতন এবং ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আগে কেরিয়ার, পরে অন্য কিছু। ও আমাকে ট্রিটমেন্টের জন্য বেছেছে, এটা ওর মুখ্য ব্যাপার। যদি সে আমাকে দিয়ে কবিতা লেখাতে পারে, তাহলে এই সাফল্য মস্ত একটা কৃতিত্ব হয়ে দাঁড়াবে। ও যে আমার সঙ্গে একটা 'র‍্যাপোর্ট' তৈরি করছে, এটাই অসহ্য। আমি ভাবছি...

—কী ভাবছ?

—যে করে হোক, আমি একটা কবিতা লিখব। তারপর দেখতে চাই, ও কী করে! ছবি আঁকব, গানও গাইব। দেখতে চাই, ও তখন কেমন করে কথা বলে, হাঁটে এবং ছুটে বেড়ায়।

ছেলের কথা শুনতে শুনতে সাগরী হঠাৎ বলে উঠলেন—তোমার বাবাও এই রকম করত মণি! মানুষের পরীক্ষা নিতে চাইত। জাতধর্ম ঠেলে আমি তার কাছে সত্যিই কতটা পৌঁছতে পেরেছি, সারাজীবন সেই পরীক্ষা নিয়েছে। বলত, জাত বড় বালাই সাগরী, মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না। বলতাম, আমাকেও না? ডক্টর পাখিরা

বলত, তোমাকেও না। তখন কী যে অসহায় লাগত! চোখের জল ছাড়া আর তো কোনও জবাব ছিল না আমার। চোখেব ওই জল ছোড়দাকে টেলিফোন করতেও দু'বছর দেরি করিয়েছে। তোর বাবার মৃত্যুর পরও দু'বছর চুপ করে থেকেছি। মন সরেনি। একা একা খুব কেঁদেছি।

কথা শেষ করে সাগরী নিঃশব্দে শাড়ির খুঁটে চোখের কোণ মুছলেন। মহিম মাথা নিচু করে ডান হাতে তর্জনী এবং বৃদ্ধার সাহায্যে কপালের মাঝখানটা চিমটে ধরলেন, চোখ বুজে রইলেন। তাঁর থুতনি ভারী হয়ে উঠেছে।

দাঁড়িয়ে ওঠা সুবৃত্ত হতবাক হয়ে দু'জনকে লক্ষ করে গেল। মায়ের এই কষ্ট সে বোধহয় কখনও অনুভব করে দেখেনি। অত্যন্ত খারাপ লাগছিল তার। সে থতমত গলায় বলল, বাবা তোমাকে বিশ্বাস করত না!

—না। বলে মাথা নেড়ে সাগরী কেঁদেই ফেললেন।

সুবৃত্ত সহসা খানিকটা অসহিষ্ণুর মতো বারান্দায় বেরিয়ে চলে এল। মা তার পিছুপিছু ছুটে এসে বললেন, অথচ তোমাদের আমি কখনও ঘৃণা করিনি পাখিরা। অবিশ্বাস করিনি। আর যাই করো খোকা, কাউকে আমার মতো অসহায় করে দিও না। তোমরা পক্ষীবংশের মানুষ, মানুষকে ভরসা কর না কেন? মানুষ কাছে এলেই নিজের স্বভাবে সরে যাবে সুবৃত্ত! তোমার বাবার কাছে ঘনিষ্ঠ হতে গিয়ে বুঝেছি, ডক্টর পাখিরা সরে যাচ্ছে। কেন খোকা, এমন কেন হবে! স্বাগতাপর্ণা খালি কেরিয়ারের কথা ভেবেই তোমার কাছে এসেছে, এমন করে ভাবছ কেন?

সুবৃত্ত এবার মায়ের জলে ভেজা চোখের দিকে চেয়ে স্নান হেসে বলল, তুমি মামার কাছে যাও মা। উনি ভারী দুঃখ পেয়েছেন।

—ছোড়দার কাছে গেলেই কি যাওয়া হল মণি! ডক্টর পাখিরা আমাকে একলা করে গেছে, তোমাকেও পেলাম না। দাদা দূরে, তুমিও দূরেই রইলে। আমি তোমার পুরোটা মা হতে পারলাম না, ডক্টর পাখিরার কেই বা ছিলাম আমি! পুরো সহধর্মিণী হতে পারিনি। যত ভেবেছি হয়েছি, ততই বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করত। ডক্টর পাখিরা বলত, এই দেশে আমার এই মানুষ হয়ে আসাটা একেবারে কেমন বিশ্বাসই হয় না।

—মা!

—হ্যাঁ মণি। তোমাকেও আমি পুরোটা চিনি না। তুমি কি আমার ছেলে না, অন্য মানুষ?

—আমাকে ছুঁয়ে দেখো মা! দেখো, দেখো! এই আমি, তোমারই ছেলে মা। মানুষকে বিশ্বাস করতেই চাই। কিন্তু কাঁচা মাংসের গন্ধটা যাচ্ছে না কেন সাগরী! আচ্ছা, সুচেতন টুপিঅলাকে খুকু সত্যিই কি বিয়ে করবে? তাহলে আমার সঙ্গে

র‍্যাপোর্ট কেন মা!

মা এবার চমকে উঠে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঈষৎ ডুকরে উঠে দাদার কাছে ঘরে পালিয়ে চলে আসেন। এবং বুঝতে পারেন, ছেলের স্নায়ু আরও প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে পড়েছে।

সাগরীই সন্তানকে অনেকখানি বুঝে উঠেছিলেন। তাঁর বার বার মনে হচ্ছিল পর্ণাই মণির ঔষধি। দাদা যাইই মনে করুন না কেন, পর্ণার সাহচর্যেই খোকার ভাল হবে। মেয়েটিকে সাগরীর বেশ নরম প্রকৃতির মনে হয়েছে। খোকার কবিতা পর্ণা ভালবাসে, একথা খাঁটি। সুবৃত্ত বিশ্বাস না করলেও, পর্ণার অনুরাগ বিশ্বাসযোগ্য। কাব্যপ্রীতি সংসারে দুর্লভ ঘটনা, অল্প নামকরা কবির পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার। অবশ্যি, সুবৃত্তর ক্ষমতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মহলে প্রত্যয় খুব দৃঢ়। অল্প নাম হলেও, সেটি খুব অল্প তো নয়। এ বছর রয়ালটির টাকা ভাল এসেছে। গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। নতুন কবিতা নেই, অথচ পুরনো লেখার কদর বাড়ছে, এই ঘটনা এ সংসারে মস্ত ঘটনা। কবিতার বই বিক্রি হচ্ছে, তা-ও একজন তরুণের, যে কিনা লেখা ছেড়ে দিয়েছে, কী করে যে ঘটে!

টেলিফোন রাখা ঘরটায় ঢুকে আসেন সাগরী। দারিদ্র্যের মধ্যেও ফোনটা কষ্টেসৃষ্টে রাখা, অনেকবার ভাবেন, কেটে দেবেন। পারেন না। একলা সংসারে ডাক্তারবদ্যি ডাকতে বা বিপদে আপদে টেলিফোন বন্ধু চাকরের মতো! তাছাড়া খোকা মাঝে মাঝে পালায়, তখন টেলিফোন করে খোঁজ করেন সাগরী।

টেলিফোনে পর্ণাকে ডায়াল করলেন সাগরী। দু'জনে কথা হল এই রকম :

সাগরী—পর্ণা বলছ?

পর্ণা—হ্যাঁ বলছি। আপনি কে বলছেন?

সাগরী—সুবৃত্তের মা বলছি স্বাগতাপর্ণা।

পর্ণা—হ্যাঁ মা। বলুন, আমি শুনছি।

সাগরী—বেশি কথা তো বলতে পারব না। টেলিফোনে বড্ড বিল ওঠে।

পর্ণা—আমাকে ক্ষমা করুন মা। একটা কথা বলব, সন্তান মনে করে শুনবেন। আপনি রেখে দিন। আমিই আপনাকে করছি।

সাগরী—তা কী করে হয়। দরকার তো আমার।

পর্ণা—আমারও যে দরকার মাসি। তুমি রেখে দাও, প্লিজ।

পর্ণার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য আন্তরিক। সাগরী রিসিভার রেখে দিয়ে ভাবলেন, এই মেয়ে কি শুধুই কেরিয়ারের পিছনে ছুটে মরছে, হঠাৎ 'তুমি' করে বলে ওঠাও কি অতি চতুরতা এবং আজকার অভ্যাস মাত্র। আজকাল নতুন প্রজন্ম চট করে বয়স্কদের 'তুমি' ডাকে। 'আপনি' বলতে কাতর হয়ে পড়ে।

আধ মিনিটের ব্যবধানেই ওপ্রান্ত সাড়া দিল। টেলিফোনের খরচ পর্ণার ঘাড়ে চাপল।

পর্ণা প্রথমেই বলল, শোনো মাসিমা। আমার বাবা বহরমপুর জজ কোর্টের উকিল ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন। আমাদের আর্থিক অবস্থা বরাবরই ভাল। দাদারা বিভিন্ন পেশায় বেশ প্রতিষ্ঠিত। ফলে আমি যা রোজগার করি, সব আমার। কেউ নেবার নেই। স্বামী করেছিলাম, সংসার টেকেনি। একটি কাজের মেয়ে আমার বন্ধু, ওর সঙ্গেই থাকি। মোটা মাইনে দিই। কাজের মেয়ে মিনতি, আমার প্রাক্তন স্বামীর জোগাড় করা মেয়ে। ওর ওপর রতন এখনও দাবি ফলায় এবং সম্পর্ক রাখে।

সাগরী—তোমার সঙ্গে?

পর্ণা—না, আমার সঙ্গে নয়, মিনতির সঙ্গে।

সাগরী—শুধু মিনতির সঙ্গে রাখে বলছ!

পর্ণা—ঠিকই ধরেছেন, আমার সঙ্গেও নতুন করে আবার সম্বন্ধ করতে চাইছে।

সাগরী—তুমি কী করবে ভাবছ?

পর্ণা—সে তো আর হয় না মাসি। কলেজে আমার নতুন চাকরিটা হওয়ার পর এবং আবৃত্তিতে একটুখানি নাম করেছি বলে বা এই ধরুন কাউনসেলিং একটা ভাল পেশা হয়ে উঠছে দেখে রতন...

সাগরী—ও আচ্ছা!

পর্ণা—এখন বলো, সুবৃত্ত কেমন আছে। কুদ্দুস নিশ্চয় সমস্ত বলেছে?

সাগরী—হ্যাঁ, মোটামুটি। তবে ও ওর বাড়ির টেলিফোন নম্বরটা পর্যন্ত না দিয়ে চলে গেল। এবং তোমার সম্বন্ধে মনোভাব ভাল দেখলাম না।

পর্ণা—কী বলল, আমার সম্পর্কে?

সাগরী—অন্য কিছু নয়। তোমার কাজের মেয়ে বলেছে, মণি তোমাকে খুন করে ফেলত, চড়থাপ্পড় মেরে ছাড়িয়ে দিয়ে সে-ই খোকাকে ভোররাতে বার করে দিয়েছে। কুদ্দুস বলল, তুমি সামনে এলেই খোকা উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। আবার তুমিই আমোদীর অভিনয় করে খোকার মনে বিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছ। ছোড়দাকে সবই বলেছে। শেষে কুদ্দুস যাওয়ার আগে বলে গেল, ফল কী হয় দেখুন, আমার কিন্তু অন্য রকম লাগছে।

পর্ণা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জানতে চাইল—তুমি নিজে কী বলছ মাসি? আমি কি মণির ক্ষতি করলাম!

সাগরী—তুমি সুচেতনকে বিয়ে করবে বলেছ? কথাটা খুবই ভাবছে সুবৃত্ত। এবং দেখছি, ওই ঘটনার সঙ্গে তোমাকে চিকিৎসকও ভাবছে। ইউনিভারসিটির ছাত্রী

ভাবছে না। রেলের ঘটনার খানিকটা আর এখনকার ঘটনা মিশিয়ে ফেলেছে। খোকা সর্বক্ষণ নাকে একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছে, মানুষের মাংসের কাঁচা গন্ধ, থুঃ থুঃ করছে। এই অসুখ কি সারবে না মা! চোখের কোলে আরও কালি পড়েছে স্বাগতা। খোকা আরও শুকিয়ে গিয়েছে।

পর্ণা আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। এই সময় মহিম গাঙ্গুলি বোনের পিছনে এসে ছায়ার মতো দাঁড়ালেন। রিসিভার থেকে মুখ টেনে নিয়ে ভয়ে সাগরী আতঙ্কিত অভিব্যক্তি করেন, খোকা কোথায় ছোড়দা?

—বাথরুমে, চান করছে! বলে ওঠেন মহিম।

—শোনো দাদা, তুমি বাইরেই থাকো। খোকা বাথরুম থেকে বার হলে, আমাকে চট করে বলে যেও। তোমাকে আমি...

—কাকে করছিস? স্বাগতা? স্বাগতাকে?

—হ্যাঁ, তোমাকে সমস্ত বলছি। আগে এখন যাও তো...খোকাকে দেখো।

মহিম ছায়ারই মতো বাথরুমের রুদ্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। এবং পরে পায়চারি করতে থাকলেন।

পর্ণা—আমি, বিশ্বাস করো মাসি, আমার প্রিয় কবিকে একটুও কষ্ট দিতে চাই না। কেউ না হোক, তুমি অন্তত বিশ্বাস করো। তুমি মা, আমার কথা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে।

সাগরী—একটা কথা বলি তোমাকে। মন দিয়ে শোনো। আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছি। তোমার মনে কোনও পাপ নেই। কিন্তু তোমার জীবন বেশ জটিল স্বাগতাপর্ণা। একা থাকো, হাতে পয়সা আছে। পুরনো প্রাক্তন স্বামী তোমার উপর চড়াও হচ্ছে। এই ঘটনার চাপ খোকার নার্ভ নিতে পারবে না। লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি ভেবে দেখো। তুমি সুচেতনকে সত্যিই চিনতে?

আবার চুপ করে গেল টেলিফোনের অপর প্রান্ত। তারপর গলা ভেজা আর ভারী হয়ে এল স্বাগতার।

সাগরী—কথা বলছ না কেন? হ্যালো, হ্যালো।

পর্ণা ধরা গলায় জবাব দিতে চেষ্টা করল—মাসি। আমি রহস্যময়ী নিশ্চয়। কিন্তু ঠিক করে উঠতে পারিনি, কী করে সুবৃত্তের হবো, আমি কী পরিচয় দেব তাকে? সে কী চাইছে! ঠিক করতে না পেরেই, কখনও আমি, আমোদী, কখনও নই! তোমরাও আমোদীকে কেমন করে নেবে, আদৌ নেবে কি না, বুঝতে পারিনি। সুবোধদা আমাকে ঘৃণাই করছে মাসি।

সাগরী—তোমার কী সুচেতনের সঙ্গে পরিচয় ছিল?

পর্ণা—হ্যাঁ।

সাগরী—ডায়মন্ডহারবার গিয়েছিলে তোমরা?

পর্ণা—হ্যাঁ।

সাগরী—ক'জন?

পর্ণা—চারজন।

সাগরী—নাম বলো প্রত্যেকের।

পর্ণা—বিশাল ওরফে নিমু ঘটক, নির্মলা ওরফে বিনুনি সান্যাল, সুচেতন চৌধুরী এবং আমি স্বাগতাপর্ণা ওরফে নূপুর মুখার্জি। ওরা তিনজন যাদবপুর, আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাগরী—সুচেতনের কোনও ওরফে নেই?

পর্ণা—আছে।

সাগরী—সেটাও বলো।

পর্ণা—রতন। কিন্তু মাসি...

সাগরী—হ্যাঁ বলো।

পর্ণা—বিয়ের আগে ওর যে একটা ডাকনাম আছে জানতাম না। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে..

সাগরী—যাক গে শোনো। তুমি এখনও কিছু কিছু জিনিস লুকোচ্ছ। সুবৃত্ত চেপো মেয়ে একদম দেখতে পারে না। চেপো লোককে কঠিন ঘৃণা করে। ওর বাবাও করত।

পর্ণা—প্লিজ মাসি। সুবৃত্তকে সমস্ত বলে দিও না। কথা দিচ্ছি, সময় হলে সবই বলব আমি নিজে। সুবৃত্ত সুস্থ হয়ে উঠলে, আমি নিঃশব্দে সরে যাব, মাসিমা। আমাকে সুযোগ দাও। আর কোনও কথা না বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে দিলেন সাগরী।

তোয়ালেয় মাথার চুল রগড়াতে রাগড়াতে বাথরুম থেকে বার হয়ে আসে সুবৃত্ত। মামা পায়চারি থামিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। মামাকে সুন্দর একটি হাসি উপহার দেয় ভাগ্নে। নিজের ছোট পড়ার ঘরে ঢুকে এসে প্যান্টশার্ট পরে মাথা আঁচড়ায় বিশেষ যত্ন সহকারে। আশ্চর্য, তখনও তাকে দু'হাতে জড়াচ্ছিল স্বাগতাপর্ণা। মাথার মধ্যে তখনও বাদল রাত্রি এবং ট্রেন চলাচল করছিল।

চিরুনি হাতে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে সুবৃত্ত স্বাভাবিক গলায় মাকে বলল—মা, ভাত বাড়ো, আমি একটুখানি বার হব।

সাগরীও স্বাভাবিক ছন্দে শুধালেন—কোথায় যেতে হচ্ছে শুনি!

—আর কোথায়! শেখরদাকে গিয়ে বলব, অনেক তো হল দাদা, এবার আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দাও, আদাজল খেয়ে কাজে লেগে পড়ি। কথা হচ্ছে, খুকুর বিয়েতে

হাজার চারেক টাকা খরচ তো বাঁধা। একটা খাঁটি চব্বিশ ক্যারেটের সোনার চেন, কমসে কম চার হাজারই পড়বে। নিদেন তিন-সাড়ে তিন। আমি কথা দিয়েছি মা!

—বেশ তো, তাইই যা। কাজে না থাকলে...

—হ্যাঁ, মানুষ হাঁপসে যায় ছোট মামা! ভেবে দেখলাম, মাথার দোষে কেউ কাজ বন্ধ রাখে না।

মামা বললেন, আমি তাই বলি মণি। এখনও আমি পেশেন্ট পেলেই দেখি।

দু'বার চিরুনি চালিয়ে বেশ চটপটে প্রশ্ন করল সুবৃত্ত—আমাকে কেমন দেখলে? বলে জবাব না দিয়ে ঘরের মধ্যে আয়নার সামনে চলে গেল। ঘাড়ে একটুখানি ট্যালকম পাউডার লাগাল। মা রান্নাঘরে ঢুকলেন।

ডাইনিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সুবৃত্ত মামাকে জানতে চাইল—তুমি আমার সঙ্গেই খাবে, নাকি পরে?

—তোর খুব তাড়া, আমি পরেই খাচ্ছি। দশটাও বাজেনি। একটু আগে ব্রেকফাস্ট সারলাম, তখনও তুই ঘুমিয়ে।

—আমার কিন্তু সরাসরি ভাত। ব্রেকফাস্টের সময় হয় না। সকালে উঠে খালি এক কাপ চা, তারপর প্রাতঃকৃত্য এবং চান। তা কেমন দেখলে আমাকে? আমার তো অবশেসনাল নিউরোসিস। আমি যত শান্ত থাকব, তত ভাল থাকব। তোমার কী হল সাগরী, তাড়াতাড়ি দাও আমাকে।

ভাতের গরাস মুখে তুলে সুবৃত্ত লক্ষ করল, মামা সস্নেহে তার মুখে ভাত তোলা দেখছেন সম্মুখের চেয়ারে বসে। সুবৃত্ত হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। ভাতের দলা গলা দিয়ে ঠেলে পেটে চালান করে দিয়ে কৌতূহলী মামাকে বলল, এঁটে পাকা কথাটা বোঝো ছোটমামা! এই সব লেখক-কবিরা বেশ এঁটে পাকা হয়। এচোঁড়ে পেকে যায়। মাত্র বাইশ বছর বয়েসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা অত্যন্ত কড়াপাকের মনস্তাত্ত্বিক নভেল লিখে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ভাবি, ওই সব নরনারীর জটিলতা কোথায় পেলেন মানুষটা? এল কী করে স্নায়ুতে! অথচ তিনি কখনও কিছু টোকাটুকি করে লিখতেন না। কারও কাছে ধারটার পছন্দ করতেন না। তেঁএটে, একগুঁয়ে লোক, বাজি ধরে লিখতেন। এঁরা তো কোথাও তেল মেরে লেখক হননি, এঁদের কলজে খুব দড় ছিল মামা। যাকে একবার ধরতেন, তার শেষ দেখে তবে ছাড়তেন। যেমন ধরো খুকুর ব্যাপারে আমার শেষ পর্যন্ত যাওয়া উচিত। যে লোকটা টুপি দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে তার মুখটাও স্পষ্ট করে দেখা দরকার। ...মা, বরাবরই তরকারিতে, ডালে নুন কম দাও। ভয় পাও বুঝি!

মা বললেন, কমই তো ভাল খোকা। বেশি হলে তো আর উপায় থাকে না। সংসারটা হল আন্দাজের ব্যাপার, ভয় তো করেই।

মায়ের চমৎকার উক্তি শুনে হাতমুখ চোয়াল থামিয়ে আধ মিনিট চুপ করে রইল সুবৃত্ত, যেন সে কথাটাকেই মনে মনে চর্বণ করে চলেছে।

—সংসারটা আন্দাজের ব্যাপার বলছ মিসেস পাখিরা?

—তাই বইকি। যেমন ধবো, আমরা চোখের আন্দাজে কতকিছু করি, কাউকে ভালবাসি, কাউকে বাসি না। পরে দেখি নুন হয় বেশি হয়েছে, নয় তো, নুন পড়েইনি। পাকা গিন্নিরই কত ভুল হয়। তাছাড়া মানুষকে চেখে দেখা কত কঠিন বল।

—তাহলে কি আমি যাব না মা! আমি কি খুকুর বিয়েতে...

—তা কেন?

—ওয়াক! দিয়ে বাঁ হাতের তালুতে মুখ চেপে ধরল সুবৃত্ত, তারপর দ্রুত বেসিনে গিয়ে বমি করে ফেলল। সামান্য যা খেয়েছিল, সব তুলে ফেলল সে। গলাটা ঝাঁঝে জ্বালায় ভরে গেল।

বার বার সুবৃত্ত বলে গেল—মানুষ খেয়েছি মা। ভারী দুর্গন্ধ। বলতে বলতে রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়ল। সুবৃত্তের আর যাওয়া হল না। সেই দিনই মামা বউবাজার থেকে একটি সোনার শিকলি কিনে আনলেন।

সেদিন ছিল রবিবার। দুপুর নাগাদ চান খাওয়া-দাওয়া করে সোনার শিকলি কিনতে বার হয়েছিলেন মহিম গাঙ্গুলি। তার আগে স্বাগতাপর্ণাকে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি তার কাছে আসছেন। সমস্ত ঠিকানা আদি জেনে নিয়েছিলেন অনুপুঙ্খে। বোনের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত তথ্য, যা যতটুকু পান, পকেটস্থ করেন। তাঁর মনে হল, সুবৃত্তর মনে একটি সুস্থতাবোধে ফিরে আসার লড়াই চলেছে। কিন্তু খোকার স্মৃতি বিপর্যয় ঘটছে বার বার। তার ভেতরে সময়ের পারস্পর্য, ঘটনার আগে পরে বলে কিছু নেই। মণির চেতনা প্রবাহ কালের তিনটি ভাগ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান মানে না। নির্জ্ঞান মনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব এবং অবচেতনে আরামপ্রদ আস্থা এবং সচেতনে অনেকটাই অবিশ্বাস দানা বেঁধে জমে গিয়েছে।

শুধু তাইই নয়, সুবৃত্তের স্নায়ু সুবিধা মতো ঘটনা তুলে নিয়ে সাজিয়ে নেয়, সেই সংস্থাপনে কালের আগুপিছু থাকে না। সুচেতনের সঙ্গে খুকুর বিবাহ মণির স্নায়ুর একটি সাব্যস্ত দশা। বৃষ্টি-বাদলায় লুম্পেন প্রোলেটারিয়েটের কান থেকে মাংস ভক্ষণকে, যতদূর জানা গেল, সুবৃত্ত লু-সুনের 'উন্মাদের ডায়েরি' নামে একটি গল্পের সঙ্গে একাকার করে ফেলেছে। সুবৃত্ত বলছিল, আপনি লু-সুনের গল্পে দেখবেন, মানুষ মানুষের মাংস খাচ্ছে। জিলানি ওর মেয়ের মাংস খেয়েছে। ভূপেন হাজারিকার, 'মানুষ মানুষকে পণ্য করে, মানুষমানুষকে জীবিকা করে'—গানটা শুনেছেন? আমি বলছি, সংসারটা হচ্ছে জিলানির চরকি, তাতে কাঁটা ঘুরিয়ে মানুষের মাংস বেচে

দেওয়া হয়। না হলে, কম্পাসের কাঁটা চল হবে না। পাখিরার ডানার আশ্রয় পেলে মিনু পরী হত মামা। আমার কবিতার কোনও ডানা নেই ঠাকুর। বলে অসুস্থ সুবৃত্ত হাউমাউ কেঁদে উঠল। শিশুর মতো ফোঁপানো-ডুকরানো সেই কান্না চোখে দেখে স্থির থাকা কঠিন।

এই কান্না বুকে করে বয়ে বেড়ানো মহিম ভাবছিলেন, মানুষের ব্যাধি বাস্তবিক কোথায় থাকে? তাঁর কিছুটা রক্তও তো খোকার মধ্যে আছে, বংশগতি, জিন, সবই আছে। অথচ 'ঠাকুর' সম্বোধনে সুবৃত্ত তাঁকে বার বার ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এই সোনার চেনটা খোকা নেবে তো!

স্বাগতাপর্ণা মামাকে 'না' করতে পারল না। এদিকে এই রবিবারেই রতন একপ্রকার জোর করে ঠেলে এসে হাজির হল।

অখিলের মা ভোরবেলাতেই দুঃসংবাদটা দিয়েছে—শোনো ছোটমা, আজকেরই চৌধুরীর আসার কথা। তুমি রাজি আছ, বলে নিলাম। ঘটক আর বিনুনি সঙ্গে আসতে পারত, আমি ঠেকালাম এই বলে যে, আগে স্বামী-স্ত্রীতে কথা হোক। তোমরা পরে আসতে পারবে, সময় তো পালাচ্ছে নে।

—কখন বললে এই সব কথা?

—তোমার ওঠবার আগেই ফোন এসেছে, আগেও দু'দিন ভোরভোর চৌধুরী করেছে, একদিন দুপুরে এসে আমাকে হাতে-পায়ে ধরে আর কি। বললাম, রোসো, সবুরে মেওয়া।

—তুমি বললে?

—বলব না কেন, তুমি তো রাজিই হয়েছ মা!

—আবার আমি ডাইভোর্স করব মিনতি। মেয়েরা আজকাল চাইলেই একটা লোককে আঙুলের টুসকি দিয়ে তাড়াতে পারে। আমি আর গায়ে বিষ্ঠা মাখব না অখিলের মা।

—তাহলে! বলে মিনতির মুখ হাঁ হয়ে গেল।

তাই দেখে পর্ণা প্রচণ্ড হেসে উঠে বলল, ঠাট্টাও বোঝো না, আমি আসলে রাজিই আছি। কেন কি, লোকটাকে আমার দরকার।

মিনতি হাসবার চেষ্টা করে একটা বোকার মতো ভঙ্গি করল। সে পর্ণাকে বুঝতে পারছিল না। তার হাতের কাজ থেমে পড়েছিল। কাজ রেখে সে আলনার কাছ থেকে সরে গেল।

কিছুক্ষণ পর প্লেটে বসিয়ে এক কাপ চা রেখে দিয়ে বলল, তোমার মতলবটা বুঝলাম না ছোটমা। তবে যে বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছে, তাকে নিয়ে খেলা কোরো না।

—খেলাটা মারাত্মক জেনেও আমাকে খেলতে হবে মিনতি। আমার উপায় নেই।

—তুমি কী বলছ ছোটমা!

—হ্যাঁ, অখিলের মা। সুবৃত্তের জন্য আমি সব করতে পারি।

—রহিতের জন্যও তুমি সব পারতে।

—না, পারতাম না।

পর্ণার কথায় মুহূর্তে একটা অবিশ্বাসের হাসি মিনতির মুখে খেলে উঠে মিলিয়ে গেল। মিনতি অন্যত্র সরে চলে গেল।

রতনের সঙ্গে পর্ণার দেখা হল অনেক দিন বাদে। মিনতি দরজা খুলে দিয়েছে। রতনের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ, দৃষ্টি ভেজাভেজা, বিমর্ষ। পরনের প্যান্টশার্ট অনেকটাই মলিন, কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগটা নতুন এবং টকটকে লাল। মাথায় ক্রিকেট টুপিটা আগের মতোই রয়েছে। মাথায় রতনের কিছুটা টাকপোকার উপদ্রব ছিল। ফলে সে নানা ধরনের চুপি ব্যবহার করত। টাকপোকা ঠেকাতে নানান চিকিৎসা করেছে এবং অনেক কাল ক্যান্থারাইডিন তেল মাখে।

রতন দেখতে সুন্দর। টুপি খুলে খানিকটা খারাপ লাগে। টুপিতে তাকে চমৎকার মানায়। টোপরেও কী ভাল লেগেছিল সেদিন। সবচেয়ে আকর্ষণ করে ওর ভরাটগম্ভীর দানাদার কণ্ঠস্বর। নাটক এবং আবৃত্তির সংস্থা চালাত—ইদানীং কিছুই চোখে পড়ে না। দল বোধহয় বন্ধ করে দিয়েছে। নাটকেই জোর ছিল বেশি। আবৃত্তির মাস্টারি করত নাটকে ছেলেমেয়েদের টানবার জন্য। ওইই পর্ণার নেশা ধরিয়ে দেয়।

যাদবপুরে রতন ছিল পর্ণাদের সিনিয়র, শেষ পরীক্ষা দেওয়ার পরও হস্টেলের 'সিট' আঁকড়ে পড়েছিল নাটক-আবৃত্তির মহানাগরিক টানে। সেই বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সোস্যাল ফাংশনে পর্ণাকে খাড়া করে দেয় বিনুনি সান্যাল, রতনের হাতে এনে তুলে দিয়ে বলে, পর্ণা পারবে, ওর ইচ্ছেও আছে, খানিকটা দেখিয়ে দাও সুচেতনদা। আমিই ওকে টেনে এনেছি। কলেজে ফার্স্ট হয়েছিল। গলায় ধার আছে।

এই বিনুনি রতনের দলে ছোট পার্ট করত। রতনের সঙ্গে দোস্তি ছিল। তখনই বোঝা যাচ্ছিল সুচেতন নাটকের জন্যই নিজেকে তৈরি করতে ব্যস্ত। শোনা যায়, ওই নাটকের গুণেই পশ্চিমবঙ্গের কোনও এক নাট্যপ্রেমী মন্ত্রী তাকে রাইটার্সে চাকরি করে দেন। যদিও রতন বামপন্থীদের খুব একটা সুনজরে দেখত না, তার মধ্যে রাজনীতি-বিদ্বেষ ছিল। তাহলেও কোনও রাজনীতি তাকে সুবিধা দিলেই ভাবত, বিশেষ ক্ষমতাবান হিসেবে এই সুবিধা তার পাওনা।

রতন পর্ণার একার ঘরটায় ঢুকে এসে পারকিনসন ব্যাধি আক্রান্ত মানুষের মতো

মৃদুমৃদু কাঁপছিল। ডক্টর রাম লাগু যেমন পারকিনসন ডিজিজকে তাঁর অভিনয়ে কাজে লাগিয়ে নেন, রতন যেন বাস্তবের মঞ্চে তেমনই করেছে। ওইভাবে কাঁপুনিটা করুণারই উদ্রেক করে।

পর্ণা কিন্তু রতনকে তার কাঁপুনির জন্য প্রশ্ন করল না। শুধু বলল, সোফায় বসে পড়ো, মিনতি জল দিচ্ছে। কিছু খাবে? মিনতি বোধহয় করেছে কিন্তু তোমার জন্যে।

—তোমার নতুন ক্যাসেটটা শুনলাম নূপুর। ভাল হয়েছে। শুনলাম, বিক্রি হচ্ছে।

—বিক্রির খবর রাখি না, হলে হবে।

—রাখাই তো উচিত।

—কেন?

—বিক্রি হলে আবার কোম্পানির কাছে ডাক পাবে।

—পাব। অর্থাৎ পেয়েই বসে আছে পর্ণা, 'পাব' কথাটার উচ্চারণ তেমনই।

—ও, আচ্ছা! বলে একটু আহত এবং ঈষৎ পরাস্ত লজ্জা ফোটাল রতন। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

স্বাগতা বুঝতে পারছিল, তাদের মধ্যে কথা এগোতে চাচ্ছে না। তাই সে সরাসরি কথা পেড়ে বসা উচিত মনে করল। প্লেটভর্তি খাবার এনেছে মিনতি।

পর্ণা বলল, নাও, খেয়ে নাও। মিনতি তোমাকে কী বলেছে?

প্লেট মুখের কাছে তুলে থেমে পড়ল রতন। চামচটা খাবারে ডুবিয়ে দৃষ্টিকে পর্ণার মুখে ছুঁইয়ে জানলার বাইরে পাঠিয়ে দিল। মিনতির চোখে অজানা আশঙ্কা লক্ষ করে পর্ণা। মিনতি দাঁড়িয়ে না থেকে দ্রুত সরে যায়। রতন এবার আপন মনে হেসে মৃদুমৃদু মাথাটা কাঁপায় এবং দৃষ্টি প্লেটে এনে দেখে। তারপর খায়।

—তোমার এখানে মাঝে মাঝেই এসেছি। চোরের মতো। মিনতি কথা হয়তো বলেছে, কিন্তু খেতে দেয়নি।

—কেন এসেছ, মাঝে মাঝে?

—আচ্ছা, আজ কি তুমি আমাকে ডেকেছ?

পর্ণা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল—না।

—আমি আসব জানতে না?

খানিক আগে জেনেছি।

—মিনতি তাহলে ঠিক বলেনি।

—না।

—তুমি, এসেছি বলে বিরক্ত হয়েছ।

চুপ করে রইল স্বাগতাপর্ণা। মাথা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে খেতে থাকল রতন। হাতও ঈষৎ কেঁপে যাচ্ছিল। জল খেতে গিয়ে কিছুটা জল রতনের কোলে জামার উপরে

পড়ল।

জল শেষ করে প্লেট এবং গ্লাস সামনের অনুচ্চ খাবার চৌপায়তে রেখে রতন রুমালে মুখ মুছল।

—আজকের যুগে প্রাক্তন স্বামীস্ত্রী বন্ধু হয়ে যাচ্ছে স্বাগতাপর্ণা। এই নিয়ে একটা নাটক লেখার কথাও ভেবেছি। নতুন করে থিয়েটারে মন দেব এবারে। মাথা গরম করে আমরা দু'জন দু'জনকে ত্যাগ করলাম। ঝটিতি সব হয়ে গেল। তোমার না থাকলেও, তোমার ওপর আমার তরফে ষোলআনা টানই থেকে গেছে। কিছুতেই নিজেকে বশ মানাতে পারছি না।

—বিয়ে কেন করলে না?

—ছাড়াছাড়ির পরই বুঝেছিলাম, নিজের কত বড় সর্বনাশ করলাম নূপুর। চেষ্টা করেও দ্বিতীয় বিয়েতে মন সায় দিল না।

—তোমার তো থিয়েটারের মেয়েরা আছে।

—মানে!

—মানে, তাদের কাউকে মনে ধরল না? আজকাল তো, লিভিং টুগেদার হয়।

—তুমি করেছ?

—হ্যাঁ।

—রাগের কথা।

—রাগ কিসের! কার উপর? কেন?

—ভাবলাম, তুমি বুঝি পারতেই পার না। আমি এখনও খুব ব্যাকডেটেড নূপুর।

—তাহলে প্রাক্তন স্বামীস্ত্রীর বন্ধুত্বের প্রস্তাব নিয়ে এসেছ কেন? এই প্রোপোজাল তো মনে হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ। যাক গে। আমি তোমার বন্ধুত্ব স্বীকার করলাম। আচ্ছা, মিনতি, বেল বাজলেই মামাবাবুকে দরজা খুলে দেবে, দেরি করবে না। বলে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল পর্ণা।

—হ্যাঁ, ছোটমা! পাশেই কোথা থেকে সাড়া দিন অখিলের মা।

—কে আসবে যেন। জানতে চাইল রতন।

—একজনের আসার কথা।

—তাহলে সত্যিই তুমি বন্ধুত্ব স্বীকার করলে খুকু! আমি আর তো কিছু চাই না। এবার তাহলে উঠছি।

—চা দিলে না মিনতি?

—দিই।

—তুমি যখনই আসবে, আমাকে টেলিফোন করবে। মিনতিকে নয়।

—বেশ, তাইই করব।

—এই বিশেষ বন্ধুত্বটাও বেশ ঝটিতি করে ফেললাম আমরা। এই জিনিসটাও ভাঙে কিন্তু সুচেতন।

—রাখতে জানলে ভাঙে না।

—কিন্তু ওই পদার্থটা আমার কাছেই চাইছ কেন?

—পাব ভরসায়।

—আমিও চাইছি রতন, বন্ধুর জন্য বন্ধু কতটা করে দেখা যাক।

—কী করতে হবে বলো?

—তুমি আমাকে আবৃত্তি শিখিয়েছ। তাইতেই আমার একটা প্রতিষ্ঠা এল। এবার আরও একটু করে দিতে হবে।

—কী?

—আমার এক পেশেন্টকে সারিয়ে তোলবার কাজে তোমাকে দরকার।

—কবি সুবৃত্ত পাখিরা।

—মিনতি বলেছে?

—হ্যাঁ।

রতনের হ্যাঁ শুনে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেল স্বাগতাপর্ণা। খাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা পর্ণা বিচলিতভাবে নড়ে সরে ঘর ছেড়ে ডাইনিং-এ চলে এল। হঠাৎ তার মনে হল, রতন সব জেনেই এসেছে এবং খুব সাবধানে কথা বলছে। বাঘ একদা রক্ত খেয়েছে এবং উপোস দিয়ে রয়েছে। বন্ধুত্ব স্বীকার করে সে কি মারাত্মক কিছু ভুল করে বসল? বাইরের দরজার দিকে ছুটে গেল স্বাগতা। দু'টো বেজে গেল, মামা তো আসেন না। বাইরের গেট ছেড়ে আবার ঘরে ছুটে এল সে।

দু'চোখ বুজে চুপ করে বসেছিল রতন। সামনে কাপে তপ্ত চা। বোধহয় চুমুক দিয়েছে।

সামনে ঝুঁকে পর্ণা বলল, রতন! হঠাৎ পর্ণার গলা গাঢ় হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, নূপুর।

—ট্রেনের ঘটনার দিন আমি আমার কবিকে চিনতে পারিনি। কবি পাগল হয়ে গেল। ঘটনার মাস খানেকের মধ্যে সুবৃত্তর একটা নতুন কাব্যগ্রন্থ ছেপে বেরিয়েছিল। 'শাদা পর্দায় কালো ম্যাজিক'। ওই বইতে হার্ড ব্যাক কভারে পাখিরার ফটো দেখে সব কেমন হয়ে গেল সুচেতন!

—হ্যাঁ, মনে আছে।

—সুবোধদা বলেছিল, সুবৃত্ত মরেনি, তবে পাগল হয়ে গেছে। সবই জানলাম, কত পরে। তার আগে, আমি কেন ছুটে গেলাম না রতন! তুমি বাধা কেন দিলে? তুমি সুবোধদার সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করতে দাওনি। সুবৃত্তকে হাটিয়ে দিয়েছ এই বলে

যে, গলার চেনটা ইমিটেশন। আমরা জড়াব না। কিন্তু আমি যে জড়িয়ে গিয়েছিলাম মনে মনে। তখন আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, খুকু।

—তুমি একদিন কালো ম্যাজিক বইটার মলাটে, সুবৃত্তর ফটোর উপর লিখলে, মানুষ পাগল হলে এই রকম দেখতে। কী কুৎসিত মন তোমার রতন!

—হ্যাঁ, স্বাগতা। আমাকে ক্ষমা করে দাও। বলে স্বাগতার একটি হাত দু'হাতে বিদীর্ণ হয়ে জড়িয়ে ধরল সুচেতন চৌধুরী।

—সেই তোমাকে আমি কেমন করে বিশ্বাস করব?

—বিশ্বাস করো খুকু!

—কবিরা চরিত্রহীন। তুমিও তো সংস্কৃতির লোক, তোমার চরিত্র লাগে না?

—সেই চরিত্র আমাকে দাও স্বাগতাপর্ণা। আমি চরিত্র উদ্ধার করতেই তোমার দ্বারস্থ নূপুর।

—বিশ্বাস করি না। বলে রতনের মুঠোয় কিছু কবলিত নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে খাটে পড়ে গেল পর্ণা। বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে থাকল। এই সময় মামার আঙুলে কলিং বেল বেজে উঠল।

ওই ফোঁপানি রতনকে আঠালো কামে পর্ণার দিকে আকর্ষণ করছিল। সালোয়ার-কামিজে যৌবন লাফিয়ে উঠছিল স্বাগতার শরীরে। সামান্য মোচড়েই আন্দোলিত দেহ রতনকে তীব্র বাসনায় অবশ করে দিচ্ছিল। সে কেন যেন ভাবতেই পারছিল না, ওই ভরাট নারীবক্ষে তার অধিকার নেই।

বক্ষঃযুগলের খাঁড়িতে তেরছানো নীল জড়ুলটা এখন কেমন আছে। একবার সেখানে নিজের তপ্ত ঠোঁট দুঁটো চেপে ধরতে ইচ্ছে করছিল রতনের। কেন যে অমন করে ছিঁড়ে পড়লাম!

বেলের আওয়াজে খাটে বালিশ ছেড়ে উঠে বসেছে পর্ণা। তার কান্নার দিশেহারা ভাব চলে গেছে। চোখের ক্ষীণ অশ্রুরেখাও মিলিয়ে গেছে। সহসা সে রতনের চোখেধর দিকে চেয়ে চমকে উঠল। মদির কামনা উপচিয়ে পড়ছে দৃষ্টিতে। সেই মদিরতা যেন কত লাজুক আর সৎ, এমনই একটা ভাব ফুটিয়ে রতন মুখ নামিয়ে বসে রইল।

স্বাগতাপর্ণা কথাটি ভাবছিল, প্রাক্তন স্বামীস্ত্রীর সদ্ভাব-বন্ধুত্ব আজকের নূতন সাংস্কৃতিক রেওয়াজ। কথাটা শুনতে বিশেষ মধুর, কিন্তু সম্পর্ক ফেটে গেলে বন্ধুত্বের তালি লাগিয়ে নিজদের কাঙালই করা হয়, ব্যাপারটা জোড়াতালির বেশি কিছুই হয় না। তবে হ্যাঁ, দু'টি পৃথক হয়ে যাওয়া হৃদয়ের যদি বন্ধুত্বের জন্য তীব্র আকুলতা জাগে, বুঝতে হবে, বন্ধুত্বের ছলে প্রেমেরই অবশেষ হঠাৎ ফেনিয়ে

উঠছে। সেই উচ্ছ্বাস কোথাও অনুভব করছে না পর্ণা, বরং রতনের বাসনাপীড়িত দৃষ্টির সামনে নিজেকে বেশ শস্তা লাগছে তার মনে হল, লোকটাকে শাসন করা উচিত। কিন্তু তাহলে এই লোক আপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। পর্ণার কাজ হাসিল হবে না।

মহিম গাঙ্গুলির সঙ্গে কুদ্দুসও ঢুকে এল পর্ণার বাসায়। পর্ণা দু'জনকেই ঘরের মধ্যে আহ্বান করে বসতে বলল। কুদ্দুস একটু তফাতে চেয়ারে বসে মামাকে অন্য একটি একজনের বসার মতো সোফায় বসতে বলল। মামার সোফাটা একটি কোণে। খাটেই বসে রইল স্বাগতা।

মহিম রতনকে বারবার লক্ষ করছিলেন। তা দেখে কুদ্দুস বলল, ইনি রতন চৌধুরী। একদিন আলাপ হয়েছিল। মিনতির আত্মীয় বলে জানি। রাইটার্সে আছেন। মাঝে মাঝেই দুপুর নাগাদ ওঁকে এই পাড়ায় দেখা যায়।

পর্ণা বলল, উনিই সুচেতন মামাবাবু, আমার এক্স-হাজব্যান্ড।

—সাগরী কিছুটা বলেছে আমাকে। ভালই হল আলাপ হয়ে গেল। আচ্ছা, নমস্কার ভাই। বলে দু'হাত খানিকটা তুলে জড়ো করলেন মহিম।

কুদ্দুস সামান্য অবাক হয়ে সুচেতনকে দেখল এবং ভর্তি ঠাণ্ডা জলের গেলাস ট্রেতে করে বয়ে আনা মিনতিকেও জরিপ করল। তারপর সে বলল, আমার তেষ্টা নেই, মামাকে দাও। আচ্ছা, তাহলে কাজের কথাটা আমিই কিছুটা প্রথমে বলে নিই। আমি সুবৃত্তর একমাত্র বন্ধু বলতে পারেন। অন্য বন্ধুরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ তেমন রাখে না। সুবোধ কিছু খোঁজ নেয়। আমার ধারণা, সুবৃত্ত অত্যন্ত জটিল অসুখে ভুগছে। ওর বাঁচার কথা নয়, তবু বেঁচে আছে।

কুদ্দুসের মুখে রতন ফ্যালফাল করে চেয়ে কথাগুলো গিলছিল। বলল, ওর অসুখের জন্য আমাকেই দায়ী করা হয়েছে নানাভাবে। অথচ ঘটনাটা গণপিটুনি। সেক্ষেত্রে মানুষের কিছু করার থাকে না।

মামা বললেন, সেকথা আমরা বুঝি। কিন্তু সুবৃত্তকে বোঝানো যাচ্ছে না। ওর বড্ড অভিমান, চার টাকার চেনের জন্য সে প্রাণটা পর্যন্ত দিচ্ছিল। কেউ না হোক, অন্তত পর্ণা তাকে মারতে দেখে মুখের প্রতিবাদটুকু করতে পারত। রতন পর্ণাকে টেনে নিয়ে চলে গেল, সুবৃত্ত পরে পর্ণার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল, রতন পর্ণাকে আটকেছে, দেখাও করতে দেয়নি।

কুদ্দুস বলল, আপনি নাটক করেন রতনবাবু, নাটকই করে গেলেন। সুবৃত্তকে আশা করি আপনি চিনতেন। বেশ বছর কয় আগে একটা রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আপনি থিয়েটার করেছিলেন, কল শো, ক্লাবের সুভেনির আপনিই এডিট করেন, আপনার এক চেলা ওই স্মরণিকা আমাকে হাতে দেয়, ওই

পত্রিকায় সুবৃত্তর একটি কবিতা ছেপেছিলেন, কবিতার সঙ্গে কবির ফটোও, অতএব আপনি সুবৃত্তকে চিনতেন।

রতন অত্যন্ত মৃদু চমকে উঠে বলল, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

মামা বিস্মিত। পর্ণার দু'টি চোখ ব্যথায় ভরে গেছে।

কুদ্দুস পাঞ্জাবির পকেটে পাকিয়ে জড়ানো, গার্ডার চাপা একটি চটি পত্রিকা বার করল, তারপর রতনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, প্রথমে আপনি দেখে নিন, তারপর সকলে দেখবে। এটি সুবৃত্তর আত্মপ্রকাশের গোড়ার দিকের ঘটনাই বলব। তবে সুবৃত্তর মতো কবির আত্মপ্রকাশ ঘটে না, ঘটে আবির্ভাব। তখন ওর নামে চারিদিকে গুঞ্জন হচ্ছিল। ফলে ক্লাবেব পত্রিকাতেও ওর ছবি দিয়ে কবিতা বার হল। এই সুভেনিরের আপনি আমন্ত্রিত সম্পাদক ছিলেন। ওর কবিতা আপনি না বুঝে ছাপেননি।

পত্রিকাটা হাতে নিযে রতন বিহঙ্গদৃষ্টি ফেলল, পাতা উল্টে দ্রুত চলে গেল এবং বলল, হ্যাঁ মনে পড়েছে।

—লোকেরা যখন সুবৃত্তকে মেরে ফেলছিল তখন তো বটেই এবং এমনকী ট্রেনে চেন ছ্নতাইয়ের আগেই সুবৃত্তকে আপনি চিনেছিলেন। অথচ কথা বলেননি, কারণ পর্ণাদের সামনে একজন তুচ্ছ কবির সঙ্গে আলাপের আদিখ্যেতা আপনার ওজনের পক্ষে অস্বাভাবিক হত। থিয়েটারি যশ কিছু হয়েছিল আপনার—কবি সেখানে, কে? একজন সুনীল গাঙ্গুলি হলে আপনি নিশ্চয় আসন ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেন।

—আমি ঠিক মনে করতে পারিনি।

—কোনও দিনই পারেননি। কখনও পর্ণাকে বলেছিলেন, কাকে মারল লোকরা? কে নষ্ট হল?

—না।

—কেন বলেননি?

—আমি খুকুকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা কবতাম মামা। আপনি অন্তত বুঝুন, সুবৃত্ত পর্ণার প্রিয়তম কবি। কী করে বলি...বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল রতন।

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে কুদ্দুস বলল, শুনলে অবাক হবেন মামা। সুভেনিরটা মাস খানেক আগে পুরনো ম্যাগাজিন ঘাঁটতে ঘাঁটতে হাতে পেয়ে সুবৃত্তকে দেখাতেই সে বলেছে, ও আর এমন কী কুদ্দুস! এডিটর হিসেবে কারও ছবিসহ কবিতা ছাপলেই তাকে মনে রাখতে হবে! তবে দেখো, নাটকের দল কত! কবিও অনেক। আমি আর ওই সব জগতে ফিরব না ভাই! ঠিক এই সব কারণেই সুবৃত্তর অসুখ জটিল হয়েছে। আপনারা দেখুন, মণির কবিতাটা। ছবিও স্পষ্ট স্বাগতাপর্ণা। সুবৃত্ত বলেছে, ওই পত্রিকাতেই প্রথম তার ছবি ছাপা হয়, সুচেতনকে ধন্যবাদ, নমস্কার,

প্রণাম। বলতে বলতে খোকা কেঁদে ফেলেছে এবং বলেছে, এই লজ্জার কথা কাউকে বলো না কুদ্দুস। নমস্কার, ধন্যবাদ, প্রণাম।

মামা সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে দু' ধাপ এগিয়ে এসে পত্রিকাখানা রতনের হাত থেকে নিয়ে আবার কোণের সোফায় ফিরে আসেন। চোখের সামনে কোলের উপর রেখে প্রচ্ছদে চেয়ে থাকেন। পত্রিকাটির নাম 'বিদ্যাসাগর উপনিবেশ পত্রিকা'। নীচে ডান কোণে মুদ্রিত, আমন্ত্রিত সম্পাদক সুচেতন চৌধুরী।

রতন বলল, মধুদার কাছে উপনিবেশের ছেলেরা এসেছিল। মধুদা নাট্যপরিচালক, দলের মাথা। মধুমঙ্গল সমাদ্দার, নামী লোক। আমি তখন বি. এ. পড়ছি। মধুদা আমাকে নাটকে চান্স দিলেন। আমার অভিনয়ে এত ইম্প্রেসড্ হলেন যে, ওই পত্রিকার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে ঠেলে এল। মধুদা বললেন, কাজটা রতন ভাল পারবে। আমি বিভিন্ন কবির, নামীঅনামী সবার, কবিতা ছাপালাম। অন্নদাশঙ্করের ছড়া নিয়েছিলাম। ছোট দুটি প্রবন্ধও ছিল নাট্য বিষয়ে। কিন্তু সত্যি বলছি, আলাদা করে সুবৃত্তকে মনেই ছিল না আমার।

—খুবই ছিল রতনবাবু। কেন কী, ওই নাটকের দিন সুবৃত্ত আপনার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেছে। নাটক শেষে গ্রিনরুমে ঢুকে গিয়েছিল পাখিরা। আপনার মতো ছোকরাকে দেখে সে অভিভূত। আপনিও তাকে দেখে অবাক। অতএব সবই আপনার মনে পড়ে যাচ্ছে।

কুদ্দুস বলে ওঠে।

রতন বাধো বাধো দৃষ্টি তুলে বলল, আমি তখন হয়তো নিজেকে ছাড়া কারুকে প্রতিভাবান মনে করতাম না। অবাক হলেও হতে পারি, কিন্তু নিশ্চয় পাখিরার খুব কিছু প্রশংসা করিনি। করার কথা নয়। এবং শুনে রাখুন, পাগল কবি ভুল করে মধুদাকে সুচেতন ভেবে কবিতা ছাপার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গ্রিনরুম দ্রুত ত্যাগ করেছিল আমরা হাসাহাসি করেছিলাম। অতএব যা ভাবছেন, ঘটনা ঠিক তা নয়। এবার বলুন, আমি তাকে ট্রেনের মধ্যে চিনতে চাইব কেন? সেও তো আমায় চিনত না। তবে চাইলে, আমি হয়তো তাকে চিনতে পারতাম।

—আপনি ট্রেনে সেদিন তার ভুল ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্যও আলাপ করতে পারতেন।

—না পারতাম না। কারও ভুল ভাঙিয়ে কৃতজ্ঞতা আদায় করা আমার কাজ নয়। ওকে আমি গুরুত্ব দিইনি। তাছাড়া আমি তখন পর্ণার দিকেই একমাত্র মনোযোগী ছিলাম। কারও কথা ভাববার সময় ছিল না।

—কিন্তু পর্ণার বিপন্ন আর্তনাদ, 'বাঁচাও' শুনেও আপনি চুপ করে ছিলেন।

—আমি দুঃখিত। ওই অবস্থায় যখন আলো এল, তখন নিজেকে 'জাহির' করার দুঃসাহস কী কাজে লাগত! আপনি ওই পরিস্থিতি বুঝবেন না। ঠিক আছে, আমি

এবার উঠব।

সোফা ছেড়ে রতন দাঁড়িয়ে উঠেছে দেখে মহিম গাঙ্গুলি সতর্ক গলায় বলে উঠলেন—তোমার সঙ্গে আমার কথাই তো হল না সুচেতন।

—আপনিও আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইছেন? আপনারা বেশ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি স্বাগতার সঙ্গে একান্তে দেখা করতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, বলুন, আপনার কী বক্তব্য?

—আমি তোমার কাছে সাহায্য চাইব। তোমাকে দায়ী করে আমার ভাগ্নের লাভ হবে না। আমি সুবৃত্তর মামা, সাইকিয়াট্রিস্ট।

—শুনেছি।

—কুদ্দুস যা বলল, ইমোশনালি বলেছে, তুমি রাগ কোরো না। সংস্কৃতি জগতের . মানুষজন সম্পর্কে আমার ধারণা অল্প। তবে বাইরে থেকে যতটুকু বুঝি, এই জগতেও ভালমন্দ আছে। সবার কাছে সবার গুরুত্ব সমান নয়। শুনেছি টলস্টয় সেক্সপিয়ারকে খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখক ভাবতেন না। রবীন্দ্রনাথকেও খাটো করে দেখার লোকের অভাব এ দেশে হয়নি। একজন বড় লেখকই যখন অন্য একজন বড় লেখককে লেখক নয় বলে বসেন, তখন সাধারণ মানুষ বা পাঠকের করার কিছু থাকে না। এই নিয়ম ছোট লেখকদের বেলাতেও খাটবে। এই জগতে ব্যক্তিগত রুচির খুবই জোর। তুমি হয়তো সুবৃত্তকে কবিই ভাবতে পার না।

—না, তা নয়। সে নিশ্চয় ভাল কবি। না হলে ওর কবিতা ছাপালাম কেন। কিন্তু তাকে মাথায় তোলার যুক্তি নেই। পর্ণার ওকে ঘিরে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস আমার সহ্য হত না। এমনকী, আমি এখনও মনে করি, কবি মানেই দেবদূত বা দেবশিশু নয়। ওরাও রক্তমাংসের মানুষ, ওদের চরিত্রে অনেক দোষত্রুটি থাকে, এমনকী তারা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের চেয়েও হীন হতে পারে। আমি চাইতাম, কবিদের সম্বন্ধে পর্ণার মোহভঙ্গ হোক। আচ্ছা, আপনিই বলুন, আপনি কি নিয়মিত কবিতা পড়েন?

—না। তবে আমি নিয়মিত টিভি বা থিয়েটারও দেখি না। জীবনে খুবই কম থিয়েটার দেখেছি। এ থেকে নিশ্চয় তুমি প্রমাণ করে বসবে না, থিয়েটার জিনিসটা খারাপ। বা উচ্চাঙ্গ সংগীত শুনি না বলে, ওটার দাম নেই। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস তো বেশ্যা বাড়ির ছোঁয়ায় দূষিত বলে শুনেছি। থিয়েটারের প্রথম দিকে সতী মেয়েরা ঘর ছেড়ে দলে দলে অভিনয় করতে আসেনি। যারা এসেছিল, তারা নিষিদ্ধ পল্লী থেকে এসেছিল। তাদের যদি সাধারণ মানুষের চেয়ে হীন গণ্য করি তাহলে থিয়েটার দাঁড়ায় না রতন। এমনকী, ঠুমরি গানটাও ডেভেলপ করেছে বাঈজি মহাল থেকে, ওটাও বাদ দিতে হয়। বাদ দিতে বসলে নাটক-গান চরিত্রদোষে সবই প্রায় হাতের বাইরে চলে যাবে। চণ্ডীদাসও ধোপানির প্রেমে পড়েছিল ভাই।

সে যুগে ওই মানুষটার চরিত্র ছিল না। যাক গে, তোমাকে শিক্ষা দেওয়া আমার কর্তব্য নয়।

—আর কিছু বলবেন? অনেক জ্ঞান তো হল আমার, এবার উঠতে হয়! মামাবাবু, আপনি কী চাইছেন, সরাসরি বলুন তো। ভাগ্নের রোগ সারাতে হলে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। এই কলকাতা থেকে।

—তুমি রেগে গেছ রতন।

—আমি এখানে, এসেছিলাম, মাত্র একজনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। কিন্তু আপনারা আমাকে...

—না, না, আমরা এখনই চলে যাব। তুমি তাহলে বলছ, সুবৃত্ত ভাল হবে না?

—না।

—কেন?

—ওকে এতবেশি মাথায় তোলা হয়েছে যে, শুধুই গুমরে মরছে। এই ব্যাধি সারবার নয়।

—ও তো আর লেখে না রতন! বলে উঠল স্বাগতাপর্ণা। বলে খাট ছেড়ে নেমে সে মামার হাত থেকে উপনিবেশ পত্রিকাখানি সংগ্রহ করে। তারপর আবার খাটে এসে বসে।

রতন বলল, নাই বা লিখল। আমিও তো নাটক করি না।

—করবার কথা ভাবছ নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, সেকথা বলেছি তোমাকে।

—আমি চাইব, তুমি করো। তুমিও সুস্থ হও সুচেতন। এসো, আমরা অন্যভাবে ভেবে দেখি।

—কী ভাবে?

—যেভাবে দুই বন্ধু সত্যিকার কোনও কাজ করে সেইভাবে।

—তুমি থিয়েটার করবে?

—হ্যাঁ করব বইকি! তবে নাটকের বিষয়বস্তু এবং গল্প আমিই দেব, তুমি লিখবে। প্রাক্তন স্বামী স্ত্রী নাটকে পুনর্মিলিত হবে। পুনর্বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে সাজিয়ে তোলা হবে এবং আমরা মিলনের অভিনয়সুখ অনুভব করব রতন। তারপর মোহভঙ্গ হবে, নাটকের শেষ অঙ্কে বলা হবে, আমরা নাটকের পর একা একা ফিরব। কেন কি, আমরা কখনও মিলিত হব না, সুচেতন আর এই স্বাগতাপর্ণা। আমরা ওই থিয়েটারে এক হই, জীবনে হই না।

স্বাগতাপর্ণার কণ্ঠস্বরে কী ছিল কে জানে, ঘরের সমস্ত পরিবেশ কেমন থমথমে হয়ে গেল। রতনের চোখমুখ অসম্ভব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। ধীরে ধীরে নতমুখ চোখের

পাতায় একটা চাপা ব্যথা বাতাসের মতো ছুঁয়ে চলে গেল।

পর্ণা খাটের মামার দিকের প্রান্তে সরে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, দিন মামাবাবু। সোনার আসল চেনটা দিন। আমি রতনকে দেখাই।

মামা একটি ক্ষুদ্র বাক্সের ভেলভেটের রঙিন আলোর ভেতর থেকে চেনটা বার করেন।

সেটি হাতে নিয়ে ঝুলিয়ে ধরে পর্ণা বলল, এটা সুবৃত্ত, তোমার আমার বিয়েতে উপহার দেবে রতন। এটি ইমিটেশন নয়। সুবৃত্ত পাখিরা তোমার বিচারেও মনে করি, চরিত্রহীন নয়। এসো নাটকটা করা যাক। তোমার নাটকেও সুবৃত্ত একটি চরিত্র, গণপ্রহারেও তার মৃত্যু হয়নি। শেষ দৃশ্যে, তুমি পাখিরাকে চেনটা ফেরত দিয়ে বলবে, মিলনের এই মালাটা নেওয়া গেল না মণি! নাটক শেষ হয়ে গেছে, আমাকে এবার একাই ফিরতে হবে। সুবৃত্ত তখন স্টেজে আমার কাছে ছুটে এসে আকুল হয়ে প্রশ্ন করবে, কেন এটা নেওয়া যায় না খুকু! তাহলে এমন করে বিয়ের বাসর সাজালে কেন? ওই হাহাকারের মধ্যে যবনিকা পড়ে যাবে। তারপর যবনিকা সরে গেলে তুমি আমি দর্শকদের সামনে নমস্কার করে দাঁড়িয়ে বলব, আমরা দু'জন কখনও এক হব না। অভিনয়সুখ পাব বলে আপনাদের সামনে ঘর সাজাচ্ছিলাম, সবই ভেঙে দিয়ে একা একা ফিরে যাচ্ছি। আমি বলব, আমি স্বাগতাপর্ণা মুখার্জি। তুমি বলবে, তুমি সুচেতন চৌধুরী। আপনারা প্রত্যেকে খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, একদা আমরা অভিনয়ে নয়, জীবনে স্বামী-স্ত্রী ছিলাম।

রতন এবার সত্যিই কেঁপে উঠল। ভেজা গলায় বলে উঠল—আমি কী বোকা! তোমরা আমাকে মাফ করে দাও খুকু! আমি পাখিরার মন একটুও বুঝিনি। ওর অসুখ কেউ বুঝবে না। আমি ভুল বুঝেছি পর্ণা! আমাকে ক্ষমা করুন মামা! কুদ্দুস, প্লিজ! আমাকে দেখুন, আমি খারাপ লোক নই!

—কিন্তু রতন! সুবৃত্তর মনটা এখনও রেলের দুর্ঘটনার মধ্যে রয়েছে। আমবা ওর ওই স্মৃতি ধরে এগোব। বলে উঠলেন মহিম গাঙ্গুলি।

বিদ্যাসাগর উপনিবেশ পত্রিকাখানি হাতের মুঠোয় ধরে রইল স্বাগতাপর্ণা। প্রথমে রতন আসন ত্যাগ করে প্রায় নিঃশব্দে বাড়ির বাইরে চলে গেল। মামাও ছোট বাক্সের মধ্যে সোনার চেনটা ঢুকিয়ে ফেললেন। কুদ্দুস চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং মামার দিকে চেয়ে বলল, সুবৃত্ত আজও রতনকে চেনে না। মনে হচ্ছে, ট্রেনের সুচেতন আর নাটকের সুচেতনকে সে আলাদা ব্যক্তি ভাবে। না হলে, যখন খোকা যাদবপুরের হস্টেলে আমোদীর সঙ্গে দেখা করবে ভেবে গিয়েছিল, তখনও সুচেতনকে চেনেনি। এবং তখন অবধি রতন তাকে নিজের পরিচয় দেয়নি। সংস্কৃতি জগতের লোকেরা এতটাই বিচ্ছিন্ন মামা! কেউ কারও নয়। আচ্ছা, আমি তাহলে

চললাম। আশা করি স্বাগতাপর্ণা, রতনের নাটক আমরা দেখতে পাব।

স্বাগতা কুদ্দুসের দিকে চোখ তুলে বলল, আমি রতনকে যা বললাম এতক্ষণ, আপনারা তার কিছুই বোঝেননি দেখছি। জীবনটাই আমাদের নাটক, আমরা দু'জনই অভিনয়সুখ অনুভব করছি। ইটস আ ডার্ক কমেডি। মিলিত হলেই যন্ত্রণা বাড়ে।

মহিম গাঙ্গুলি বললেন, রতন কিন্তু নাটকটা সত্যিই লিখবে। এবং মনে হল, তোমাকে এবং তার নিজেকে সে থিয়েটারে ব্যবহার করে একটা কাণ্ড বাধাতে বদ্ধপরিকর। ও যখন উঠে গেল, ওর চোখমুখে সেই সঙ্কল্প আমি লক্ষ করলাম।

—বেশ তো, তাইই করুক না। বলল পর্ণা।

—ও খুবই মরিয়া স্বাগতা। বললেন মহিম গাঙ্গুলি।

—কে নয় মামা! নাটক করেই যদি জীবনটাকে বুঝতে হয়, আমিই বা রাজি নই কেন?

—নাটকের স্বার্থে মানুষ তাহলে নিজের যন্ত্রণাকে, সম্পর্ককে উলঙ্গ করে দেখাতে পারে খুকু!

—কারুবাসনা মামা, বিত্তবাসনার চেয়েও জবর জিনিস। শিল্পের লোভ, বিত্তের লালসার চেয়ে কঠিন।

—এ লাইনটা তুমি কোথা থেকে যেন কোট করলে পর্ণা!

—হ্যাঁ মামা! সুবৃত্ত থেকে। ও লিখেছে, বাংলা সাহিত্যে দু ধরনের ঔপন্যাসিক কাজ আছে। একটি জীবনানন্দের 'কারুবাসনা' আর একটি শংকরের 'বিত্তবাসনা'।

কুদ্দুস ঘর ছাড়াব উপক্রম করে থেমে পড়েছে। ঘাড় বাঁকিয়ে স্বাগতাকে সে বলে ওঠে—খালি নাটকের লোভেই রতন এখানে আসেনি।

স্বাগতা সঙ্গে সঙ্গে বলল, সেকথা আমার চেয়ে কেইবা জানে।

কুদ্দুস বলল, ওকে সামলাতে পারবেন তো! ওর খিদে ভয়ঙ্কর! যাক গে, আমি চললাম।

কুদ্দুস চলে গেলে মহিম গাঙ্গুলি আর এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে বললেন, ভাত খেয়ে বেরিয়েছি। তোমার এখানে জল ছাড়া কিছুই খাব না। চড়া রোদ, চা পর্যন্ত ইচ্ছে করছে না। এখন মনে হচ্ছে, তুমি বড় বিপদে পড়ে গেলে মা। তবে একটা কথা স্বীকার করছি, তুমি রতনকে কথা দিয়ে হিপনোটাইজ করেছ, সে ভারী চমৎকার হয়েছে। কিন্তু রতনের মনে কী আছে আমরা জানি না।

—আমার যেমন কবিতা। ওর তেমন নাটক। দল ভেঙে গেছে, এখন নিজেকে খাড়া করবার জন্য খেপে উঠেছে। দল চালাতে টাকার দরকার। একজন রোজগেরে লোক পেলে ওর খিদেটা মেটে। বলে খাট ছেড়ে নেমে জানলার কাছে চলে এল স্বাগতাপর্ণা।

মহিম বাইরে পা বাড়াবার আগে বললেন, চেনটা হাতে পেলে সুবৃত্ত কী করবে তাই ভাবছি।

বিদায় দেওয়ার আগে মামাকে পর্ণা বলল—ওর মন বুঝে পা ফেলতে হবে মামাবাবু! কিছু মনে না করলে একটা কথা বলতে পারি।

—মনে কেন করব! আশ্চর্য!

—ভরসা করে সুবৃত্তকে আমায দিয়ে দিন মামা।

—এখানে! এখানে তো রতন আসবে।

—না, এখানে নয়। আমার কলেজের আশেপাশে ঘর ভাড়া পাব। মফঃস্বল বলে গাছপালা আর নির্জনতা খুব।

—ওখানেও রতন তাড়া করবে। তার চেয়ে অন্য ব্যবস্থা করো। বলে মহিম একবার অখিলের মাকে দেখলেন এবং সচকিতভাবে বললেন, আচ্ছা বেশ, আমি ফোনেই তোমাকে সব কথা জানাব।

পর্ণাও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিনতিকে জরিপ করে চাপা গাঢ়স্বরে বলল, সেই ভাল মামাবাবু।

সোনার শিকলি দেখেই সুবৃত্তর দুই চোখ ঝকঝক করে উঠল। কিন্তু সেই দীপ্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। ঈষৎ বিমর্ষ ভঙ্গিতে সে বলল, মামা! এ জিনিস তোমার কেনা। আমি নেব কেন? আচ্ছা, ওদের বিয়েটা কবে যেন হচ্ছে?

মামা বললেন, তুমি আমোদিনীকে, এখন তো আর আমোদী বলছ না দেখছি, তা ওকে ফোন করে জেনে নাও কবে ডেট, কবে বউভাত। আর শোনো, তোমার কিছু পাওনা আছে আমার কাছে। সম্পত্তির ভাগ পাবে। আমি হিসেবি লোক, হিসেব কষেই যা দেবার দেব। এই চেনটা ভাগের হিসেবেই যাবে। খামোকা গোল করছ কেন?

সুবৃত্ত বলল—ভাগটাগ আমরা চাই না মামা। যেহেতু সেটা উচিত হবে না। জাতিভ্রষ্ট নারীকে ভাগ দেওয়া চলে!

—চলে। আইন জাত দেখবে কেন! কিন্তু তুমি তো আমাকে দূর করে দিতেই চাইলে খোকা! আমি শত অপমান সয়ে, কষ্ট পেয়ে, খুব লোভে লোভে এখানে পড়ে রইলাম।

—লোভ?

—হ্যাঁ। তুমি একটা কবিতা লিখে ফেললেই আমি পালাব। আমার এই ক্ষুদ্র উপহার নাও, না হলে আমি তো এ বাড়িতে তিষ্টোতে পারব না মণি! চলে যেতেই হবে।

—এখনই?

—তবে আর কখন? বলে মহিম সুবৃত্তের ঘর ছেড়ে চলে এলেন পাশের ঘরে। তিনি ভারাক্রান্ত মনে ভাবতে বসলেন, সুবৃত্তর কাছে মানুষের ঘাট হলে ক্ষমা মেলা কঠিন। দোষ করেছি ; প্রায়শ্চিত্ত করার পথ পাচ্ছি না। খাঁটি স্নেহেও সুবৃত্তর হৃদয় গলে না।

দাদাকে অন্যমনস্ক এবং বিষণ্ণ দেখে সাগরী এগিয়ে এলেন—কী হয়েছে দাদা, এমন করে চুপচাপ বসে আছ?

—চেনটা মণি নিচ্ছে না সাগরী! আমি কীভাবে তোদের আর বোঝাব বল।

—আমি আর কী বলব ছোড়দা! চেনটা নেওয়ার সাধ্য পর্ণারও নেই।

—আছে। ওটা ওদের নাটকে কাজে লাগবে।

—নাটক?

—হ্যাঁ সাগরী, নাটক। বলে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মহিম গাঙ্গুলি।

মামা প্রায় বোবা হয়েই রইলেন কয়েকটা দিন। ভাগ্নের সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গেল। সুবৃত্ত আপন মনে রইল। গভীর রাতে দেখা গেল, টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কী যেন লেখার চেষ্টা করছে পাগলটা। সাগরী জানলার ফালি ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে চিন্তামগ্ন খোকাকে দেখে খুশি হলেন। দাদাকে এসে বললেন, খোকা লিখছে! মহিম বললেন, বেশি আগ্রহ দেখাবে না।

লিখতে লিখতে গভীর রাতে টেলিফোন বাজল খোকার ঘরে। মণি কী কথা, কার সঙ্গে বলল, কেউ জানল না। এক সকালে প্রাতঃকৃত্য এবং চান-খাওয়া করে প্যান্টশার্ট পরে চুল আঁচড়ে কাঁধে শান্তিনিকেতনি ঝোলা ঝুলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল সুবৃত্ত। ট্রেন থেকে দক্ষিণ শেয়ালদায় নেমে প্ল্যাটফর্মে ঢেলে বিক্রি করা বা ঢেলে সাজিয়ে থাক করে রাখা ম্যাগাজিন এবং খবরের কাগজগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল সে। এবং হতবাক বিস্ময়ে একটি সাময়িক পত্রিকার কভারে চেয়ে রইল।

ওর পাশপোর্ট সাইজের ছবি পত্রিকার মলাটে শোভা পাচ্ছে এবং বোল্ড টাইপে মুদ্রিত হয়েছে একটি অর্ধবাক্য, 'সুবৃত্তর অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ'। কী আশ্চর্য! কোথায় ছিল এই কবিতা, কার কাছে?

মাত্র দশ টাকা খরচ করে পত্রিকাটা কিনে ফেলে সুবৃত্ত পাখিরা। এমন সময় পিছন থেকে তার কাঁধে এসে একটি হাত তাকে চেপে ধরে। কে? বলে সে ঘুরে লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করে। এবং বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

—এই কবিতাগুলো সত্যিই কি তুমি লিখেছ? বলে ওঠে বতন। সুবৃত্ত তখনও ধন্দে রয়েছে। বিমূঢ় বিস্ময় এবং সামান্য ভয় তাকে ঘিরে ধরে।

থতমত গলায় সুবৃত্ত বলে—মানে, আমি তো ঠিক... তাছাড়া আপনি এভাবে এবং কেনই বা...এবং দেখুন, আমি আমোদীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। আপনি নাটক করতেন কখনও, সেদিন প্রশ্ন করিনি। আচ্ছা, কাঁধটা ছাড়ুন আগে।

—না, না। ছাড়ব কেন? আমি জানতে চাইছি, কবে লিখলে তুমি ভাই।

—আগে দেখি।

—দেখোনি এখনও? নাও, দেখে নাও। নিজের কবিতা মনে করতে পার না!

—না, পারি না।

কাঁধ খামচে রইল রতন।

—এসো চা খাই! বলল রতন চৌধুরী, অবশ্য রতনকে একমাত্র সুচেতন বলেই জানে সুবৃত্ত।

—হ্যাঁ। বলে কবিতাগুলি দেখতে দেখতে এগোল সুবৃত্ত সুচেতনের হাতের টানে, যেন সে গ্রেফতার হয়েছে।

চায়ের স্টলের কাছে সুবৃত্তকে টেনে এনে রতন কাঁধ ছেড়ে দিল।

—বিস্কুট চলবে?

—না।

—বেশ, সিগারেট?

—না।

—মদ খাও?

—না।

—ভাল ছেলে! আচ্ছা, মনে পড়ল?

—কবিতাগুলি ভালই লিখেছিলাম। অন্তত সন্ন্যাসীর চোখে দেখলেও রস পাওয়া যায়। এই দেখো সুচেতন, এখানে লিখেছি...

—তুমি সন্নেসী, বলো কী হে! কবির আবার সন্ন্যাস! তোমাদের শব্দের প্যাঁচ কত বাবা! শোনো সন্ন্যেসী-খোকা, কথার প্যাঁচ মেরে আমার সেকেন্ড টাইম

বাগদত্তাকে স্ন্যাচ করে নিও না। আর যাই করো, পর্ণার বাড়ি অমন করে হামলে পড়ো না, মিনতি তোমাকে আবার মারবে। নাও, চা খাও!

সুবৃত্তের কলিজার মধ্যে আচমকা একখানা অদৃশ্য নগ্ন ছুরি বসিয়ে দেয় রতন।

মণির সারা দেহ থবথর করে কেঁপে উঠল। পায়ের কাছে হাতের খোলা পত্রিকাখানা খসে পড়ে গেল। ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিল দক্ষিণ শেয়ালদহের কারশেডের গা-ঘেঁষা ভেন্ডারস ওয়ের চা-স্টলটায়। ওখানে অনেক সময় সারাই হওয়া ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে, ইদানীং হাওড়া-শেয়ালদা ট্রেনও ওখানে ছাড়ার আগে অপেক্ষা করে। দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বেড়ার বাইরে জায়গাটা। কতকগুলো প্রায় মৃত লাইন পড়ে আছে, আসলে মৃত নয়, মাঝে মাঝে ট্রেন লেগে থাকে চলন্ত লাইনে ঢুকবার জন্য। ওই লাইনের মাথায় স্টল।

—আহা, নাও, নাও! ফেলে দিচ্ছ কেন! বলে সুবৃত্তর ব্যাগে পত্রিকা ঢুকিয়ে দেয় রতন।

মাটির ভাঁড়ে চা। ছোট ভাঁড়। দাম এক টাকা। কড়া লিকারে দুধের ঘন মিশেল। গন্ধও সামান্য আছে। চা চলকে পড়ল আঙুলে। বেশ গরম। সহ্য করল সুবৃত্ত। কাঁপতে কাঁপতে ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুমুক দিল। কাঁপুনি থামছে না।

সুবৃত্ত কাঁপতে কাঁপতে বলল,—আমাকে ভুল বুঝলে সুচেতনদা! আমি তোমাদের বিয়েতে একটা খাঁটি জিনিস উপহার দেব।

—মামার হাতে তোমার চেনটা দেখেছি সুবৃত্ত।

—মামা নিয়ে গেছে, এখন সেটা আমাকে কিনতে হবে।

—সে কি হে!

—হ্যাঁ। মাথার দোষে অক্ষম হয়ে গেছি দাদা! ক'দিন একনাগাড়ে চেষ্টা করেও একটা ফিচার দাঁড় করাতে পারিনি। সব এলিয়ে পড়ে। হয় না। দু'খানা পুরনো প্রবন্ধ টুঁড়ে পেয়ে পত্রিকা দপ্তরে যাচ্ছি। শেখরদা পেলে নিশ্চয় কিনবে। আর সরস্বতীর তামাশা দাদা। পুরনো গুচ্ছ কবিতা ছেপে বার হয়ে গেল। হাজার দুই নিশ্চয় দেবে। ও তোমার হয়ে যাবে। তোমার বাগদত্তাকে তুমি ছাড়া কোনও অপদার্থ ছুঁতে পারবে না।

—তুমি সন্ন্যাসীর চোখে আমার বউটাকে দেখবে!

—কথা দিতে বলছ?

—কথা কি কেউ রাখে?

—তাহলে বলছ কেন?

—সেকেন্ড টাইম একটা জিনিস হতে যাচ্ছে কিনা!

—সেকেন্ড টাইম মানে?

—পর্ণার সঙ্গে একবার ঘর করেছি পাখিরা। তুমি তো সেই পিছনে পড়ে আছ। এখন আমরা ছাড়াছাড়ির পর বন্ধু হয়ে গেছি। সেকেন্ড টাইম বাগদান হল সেদিন। তোমার উপহারটা নেব আমরা একটা নাটকের মঞ্চে।

—বুঝলাম না।

—আচ্ছা বেশ, এসো তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

আশ্চর্য সব কথা বলতে লাগল সুচেতন চৌধুরী। অবাক হয়ে শুনে গেল সুবৃত্ত। মাথাটা তার গোলমাল হয়ে গেল। সব শুনে হাহা করে হাসতে লাগল সে। এবং হঠাৎ বলে উঠল, তুমি মানুষ খাও টুপিঅলা আমোদগেড়ে নাটুকে সুচেতন? খাও না? আমি খাই। তুমি পর্ণাকে কতটা খেয়েছ? যা আছে, অবশেষ আমার। আর হাত বাড়াবে না। গুডবাই।

চায়ের আধেকটা খেয়েছিল সুবৃত্ত। কথা শেষ করেই গরম চাসহ ভাড়টা রতনের মুখে সজোরে ছুঁড়ে মারল এবং প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। দুখানা ট্রেন এসে লেগেছিল দু'টি প্ল্যাটফর্মে, তারই যুগল ধারা শেয়ালদা দক্ষিণকে প্লাবিত করেছে। ভিড়ের স্রোত নেমে গেলে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রইল মণি।

তারপর আগের সেই চায়ের স্টল ঘুরে শিয়ালদার ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সুবৃত্ত। এখন এখানে লোকজন কম। ভেন্ডারস-ওয়ে প্রায় ফাঁকা। এক ঝাঁকা পাকা কলা মাথার কাছে পড়ে আছে। চিত হয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে লোকটা। মুখ হাঁ, মাছি বসছে। এ লোকটা আর পৌঁছতে পারেনি। ট্রেনে করে মফঃস্বলে ফল নিয়ে যেতে শেয়ালদায় এসেছিল। এ নিশ্চয় হার্টফেল। লোকটা বৃদ্ধই বটে, তবে প্রৌঢ়ও হতে পারে। কাঁচাপাকা চুলদাড়ি। একটা বেপথু ধরনের মেয়ে বলল, কেউ নিচ্ছে না, কোথাকার কে জানে!

—মরে গেল!

—পৌঁছতে পাবল না।

—বয়েস হয়েছে, তা-ও ঘানি টানে। বাবা, এই হচ্ছে সংসার!

—ঘরের লোকরা জানলই না। জিব বেইরে গেল। বিভিন্ন মন্তব্য শুনল সুবৃত্ত, বিভিন্ন মুখে। একজন বলল, আর ক'ধাপ পৌঁছালেই বেঁচে যেত।

—কী করে বুঝলে?

—দম জিনিসটা ওই রকম। পৌঁছালে পর খোদা ইনারে আর মারতনি।

—পৌঁছায় নাই সবুর মিঞা! কথাটা ঠিক কইলে না। রেল আর চারটি ধাপ, এখানে কবজ করলেন খোদাবন্দ। হায় আল্লা!

—কেউ নিচ্ছে না গ।

হঠাৎ সুবৃত্তর মনে হল ডক্টর পাখিরা এখানে শুয়ে রয়েছেন। সে লাশের কানের

কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে হালকা করে ডাকল, বাবা!

—আরে ভাই, উঠবে নাকি! মরা মানুষ, বুঝতে পারো না!

—আমার বাবা!

—তোমার বাবা!

—হ্যাঁ।

—তুমি তো ভদ্দর নোক দেখত্যাছি।

—হ্যাঁ। রাগ কইরে বেইরে এসেছে। বলেছিলাম, বোঝা টানতি পারো না, যাও কেন। যেওনি। খুব জিদ করে।

—কী বলছ, তোমার বাপ!

—হ্যাঁ, আমার বাবা। আমরা পক্ষীবংশ, আমরা পাখিজন্মে আছি। বাপ মরে নাই আমার। ওঠো বাবা, ওঠো। জিলানি কাকা ডাকতেছে বাপু গো। আমার কবিতা তুমি নাও, এই তোমার বুকে রাখলাম, তুমিই প্রকৃত সারস ফলঅলা। তুমি সমস্ত নাও, কিন্তু বেঁচে ওঠো। বাবা, বাবা! বলতে বলতে মৃতের বুকে পত্রিকাখানা রেখে দেয় সুবৃত্ত। তারপর হাউমাউ করে ডুকরে ওঠে। এবং হঠাৎ থেমে সংবিত হয়েছে এমন ভঙ্গিমায় মুখ আলতো হাতে চেপে উচ্চারণ করে—ডক্টর! সুবোধদা, ডক্টর! বলে বি. আর. সিং হসপিটালের দিকে ছুটতে শুরু করে। বি. আর. সিং. বাঁয়ে রেখে রাস্তা পেরিয়ে বাঁ দিকের সাবওয়ে ধরে ছোটে নীলরতন এবং কার্ডিওলজি বিভাগে সুবোধ ভট্টাচার্যের সামনে ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়ায়, ওর সারামুখ ঘর্মাক্ত, দৃষ্টি বিস্ফারিত এবং অস্বাভাবিক।

সুবোধ ওকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে—একটা ট্রলির ব্যবস্থা করো নৃপেনদা। সরমা, দেখো তো ভাই।

সুবৃত্ত সুবোধের বুকে ঢলে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছে। মুহূর্তে একটি কেবিনে আসে অচৈতন্য সুবৃত্ত। বেডে শোয়ানো হয়। ডাক্তার আসেন। সুবোধ দু'টি জায়গায় টেলিফোন করে। মামা, মা, কুদ্দুস এবং পর্ণা ছুটে আসে।

পর্ণার আজ কলেজ ছিল না। কী মনে করে কুদ্দুস তাকে ডেকে নিয়েছিল।

সুবোধ বলল, মা ছাড়া আমরা এখানে কেউ থাকব না। পর্ণা এসো এদিকে। আচ্ছা মামা থাক। কুদ্দুস দেখো তো কী লাগবে। এসো পর্ণা, আমরা কথা বলি। দেখেছ হয়তো, সুবৃত্তর অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ।

মহিম সুবোধের আচরণ লক্ষ করছিলেন। কায়দা করে সুবোধ পর্ণাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেল। সুবৃত্তর কাছে ভিড়তে দেবে না মনে হচ্ছে। পর্ণার মুখের দিকে চেয়ে মায়াই হচ্ছিল মহিমের। বেচারির মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে, চোখে বেদনাঘন উদ্বেগ। সাগরী চোখে আঁচল চেপে নিঃশব্দে কাঁদছেন।

সুবোধ তার টেবিলে আনল পর্ণাকে। চেয়ারে বসিয়ে পত্রিকাখানা হাতে দিয়ে বলল, দেখো কেমন ছেপেছে। এখন ভাবছি, কোথা থেকে জোগাড় করল পাঁচ পাঁচটা কবিতা।

স্বাগতা কবিতাগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং অর্ধস্ফুট বলে উঠল, কুদ্দুসকে একটু দরকার সুবোধদা। তুমি প্লিজ, ডেকে আনো।

—আচ্ছা বস, ডাকছি। বলে বেরিয়ে গেল সুবোধ।

কুদ্দুস আসা মাত্র পর্ণা তার চোখের সামনে টেবিলে পাতা খুলে পত্রিকাখানা মেলে ধরল। এবং বলল, দেখুন তো, কিছু বুঝতে পারেন কিনা।

কুদ্দুস পাঁচটি কবিতাই মন দিয়ে পড়ে গেল এবং পড়তে পড়তে পত্রিকা চোখের উপর তুলে চেয়ারে বসে পড়ল।

—বিদ্যাসাগর উপনিবেশ পত্রিকায় একটি কবিতা আগেই ছেপেছে রতন। অন্য চারখানা না ছেপে রেখে দিয়েছিল। তার মানে, পাঁচটির মধ্যে একটি নির্বাচন করে ছেপেছিল। সুভেনিরে ছাপা হওয়া কবিতাসহ বাকিগুলি হঠাৎ এতকাল পর পত্রিকা দপ্তরে দিয়েছে, কিন্তু কোথাও সৌজন্য দাবি করেনি। খুবই অবাক লাগছে কুদ্দুস ভাইয়া।

কুদ্দুস মাথা নেড়ে নেড়ে সমর্থন করছিল ঘটনা। মুর্শিদাবাদি ভাষায় বাঙালি মুসলিমকে 'ভাইয়া' ডাকটা দাদা ডাকার সামিল। 'ভাইয়া' থেকে হিন্দু বচনে 'ভায়া' এসেছে। কুদ্দুস পর্ণার মিষ্টি ডাকে কেমন খানিকটা মুগ্ধ হয়েছে মনে মনে।

কুদ্দুস বলল, ঠিকই ধরেছেন। এ কাজ সুচেতন চৌধুরী ছাড়া কারও নয়।

—আচ্ছা, আমি পত্রিকা অফিসে ফোন করে জেনে নিচ্ছি। বলে উঠল সুবোধ।

পত্রিকা দপ্তরে টেলিফোন করতে দ্রুত কোথায় বেরিয়ে গেল সুবোধ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে বলল, শেখর ফোন ধরল বলে সুবিধা হল। ও আমার পত্রিকায় নিয়মিত লেখে। সুন্দর ছেলে। বললাম, সুবৃত্ত অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতাল কেবিনে রয়েছে। বাড়ির লোকেরা আছে। শেখর জানাল, সুচেতনই কবিতাগুলো দিয়েছে। এবং কোনও ক্রেডিট নেয়নি, বরং বলেছে, ভাল একটা পেমেন্ট দেবেন আপনারা, ছোকরা অসুস্থ। শেখর জানিয়ে দিল, ক্যাশেও অনারারিয়াম পাওয়া সম্ভব, খালি সুবৃত্তকে সইয়ের জন্য একবার যেতে হবে। কালপরশু, যেকোনও দিন। শেখর বলতে ভুলল না, শেখরই হাতে তুলে দেবে টাকাটা। সুবৃত্তর সঙ্গে কথা বলবে। বলল, শুনছি, স্বাগতাপর্ণা ওর কাউনসেলিং করেন। ওঁকে সমস্ত জানিয়ে তবে সুবৃত্তকে আনবেন। ভাল হয় ; উনিই যদি সঙ্গে করে এনে সুবৃত্তর পুরনো জায়গা ঘুরিয়ে নিয়ে যান।

পর্ণা বলল, সকলে চাইলে নিশ্চয় আমি যেতে পারি। সুবোধদাই বলুক, আমি যাব কিনা।

খবর এল, সুবৃত্তর জ্ঞান ফিরেছে। কুদ্দুস এবং সুবোধ দ্রুতই কেবিনে ছুটে গেল। সুবোধের ঘরেই একা বসে রইল স্বাগতাপর্ণা। মনে মনে ভাবছিল, পত্রিকা দপ্তরকে সমস্ত বলে দিয়েছে রতন। একদিন এই লোকটা তাকে হাতে ধরে আবৃত্তি শিখিয়েছিল। আজও তার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় শেখরের সামনে খুব মহড়া নিয়েছে। কিন্তু যাইই সে করুক, খারাপ তো কিছু করেনি। এবং তাইই যদি করলে, তাহলে সেদিন অমন করলে কেন? কেন যেতে দিলে না কবির কাছে? কথা কইতে দিলে না? অমন করে ডানা ধরে টেনে নিয়ে চলে গেলে!

জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়ল সুবৃত্ত। মহিম গাঙ্গুলি ডাক্তারকে বললেন, ওকে ঘুমের ইঞ্জেকশন, ওষুধ যত কম দিতে হয় ততই ভাল। হাসপাতালে যত কম রাখা যায়, ততই মঙ্গল। কালই ওর ছুটি করে দিন। ওকে লড়াই করতে দিতে হবে। আমরা দৃষ্টি রাখব, কিন্তু ও যাতে না বোঝে ওকে আমরা পাহারা দিচ্ছি। খোকা চাইছে, নিজের লেখার মূল্যে একটি খাঁটি সোনার চেন কিনে পর্ণাকে উপহার দিতে। রতন এবং আমোদীর উপেক্ষার জবাব এভাবে দিলে নিজেকে জয়ী মনে করবে সুবৃত্ত। ও বলতে চায়, আমি তোমাদের ভালবাসার মূল্য বুঝি, কিন্তু তোমরা কারও প্রাণের দাম বোঝো না। 'কোথায় তুমি সুচেতন!' এই কবিকে দেখো, এই এখানে রয়েছে মানুষের সুচেতনা—এটাই চ্যালেঞ্জ আজকের।

সুবোধ খাতায় সই দিয়ে সুবৃত্তকে ভর্তি করেছিল। পরের দিন দুপুর নাগাদ রিলিজ করে দিলেন ডাক্তার। সুবোধ সই করে দিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনল। এবং দেখা গেল ডাক্তার মহিমের নির্দেশেই সুবৃত্তকে নিয়ে যেতে একা এসেছে পর্ণা।

ওরা যখন হাসপাতালের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল, ভিড়ের মধ্যে রতনকে দেখল স্বাগতা। হাসপাতালের এদিকেই আসছিল রতন, তাদের দেখে টুপ করে ভিড়ের মধ্যেই ডুবে উড়াল পুলের তলায় চলে গেল।

ট্যাক্সি পত্রিকা দপ্তরের দিকে চলেছে। সুবৃত্তর কী হয়েছিল, মহিমের নির্দেশেই কেউ কোনও প্রশ্ন করেনি। পিছনের সিটে পাশাপাশি বসেছে ওরা। গাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে সুবোধ কেবল বলল, দেখলে তো পর্ণা, ও বেচারা সামনে আসার সাহস পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, কোথায় কী সব করে বেড়াচ্ছে। তবে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে, আমি ওকে থ্যাঙ্ক য়ু দেব।

সুবৃত্ত এখনও ঝিমুচ্ছিল। তার সুন্দর চোখ দুটি একবার জোর করে সম্পূর্ণ মেলে প্রসন্ন আলোয় চাইল পর্ণার চোখে। পর্ণার দৃষ্টিতে মণি যেন একটা মস্ত শিশু।

—খেয়ে নিন।

—কী?

—আপনি কফি হাউসের স্যান্ডউইচ পছন্দ করেন। এনেছি।

--ওটা তো ওখানে বসে খেলে ভাল লাগে।

—এখানেও লাগবে।

—পকৌড়া?

—না। ওটা সন্ধ্যায় ভাল লাগে।

—আপনি নিন।

—আমি খাব না। আপনিই খাবেন। সব খেতে হবে। ফ্লাস্কে কফিও নিয়েছি।

—ভারী সুন্দর তো!

—হ্যাঁ, গন্ধ পাচ্ছেন?

—সেই সুঘ্রাণ আমোদিনী।

স্বাগতা ঈষৎ চমকে উঠে চুপ করে রইল।

পর্ণা দু'চোখ ভরে সুবৃত্তর খাওয়া দেখছিল। খাওয়া শেষ হলে ফ্লাস্ক থেকে প্লাস্টিকের কাপে কফি ঢালল। আধ কাপ দিয়েছে।

—সাবধানে খাবেন। আবার দেব।

—কফিও খাবেন না আপনি?

—আমি খাই না।

—কী খান?

—চা। তা-ও বেশি না।

—কী করে জানলেন কফি হাউসের স্যান্ডউইচ...

—জেনেছি।

—আর কী জেনেছেন? দেখুন, খুব অদ্ভুত লাগছে।

—কী বলুন তো!

—আপনার আমার র‍্যাপোর্ট। কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে, কারও সদিচ্ছা আমাকে ভাল করতে পারবে না। কারও অভিনীত প্রেমে আমার নিরাময় অসম্ভব। আপনি অন্যের স্ত্রী। আপনার সৌরভ আমাকে লুব্ধ এবং অপরাধী করে। আমি সুচেতনের মুখে চায়ের ভাড় ছুড়ে মেরেছি এবং বলেছি...

—কী বলেছেন? শুনুন, সুচেতন আমার স্বামী নয়।

—মিথ্যে কথা।

—না, মিথ্যা নয় সুবৃত্ত। আমি ওর কেউ নই।

—বেশ। তবু বলছি, আপনি ওর বাগদত্তা। চুপ করে আছেন কেন? একটা সম্পর্ক গোপন রেখে আমার সঙ্গে মিশছেন কেন? তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে,

বিয়ের পর তোমরা ডায়মন্ডহারবার গিয়েছিলে। অথচ সুচেতন বলল, না, তখনও হয়নি। এবং বলল, পর্ণার সিঁথিতে সিঁদুর ছিল কি? এখনও তোমার সিঁদুর নেই কেন আমোদিনী?

—আপনার যা মনে হচ্ছে বলুন, আমি শুনছি।

—একটা মানুষকে সুস্থ করতে হলে উল্টাপাল্টা কথা শোনাতে নেই আমোদী। তুমি নিশ্চয় চাও না, তোমাকে আমি খারাপ মেয়ে মনে করি। সুচেতন বলল, সেকেন্ড টাইম তোমাদের বাগদান হয়েছে। এই সব তো বিদেশের কোনও অভিনেত্রী করতে পারে। তুমিও পারো?

—না।

—তুমি কী পারো পর্ণা?

—অভিনয় করতে পারি না। বলে বাঁকা করে জলভরা চোখে সুবৃত্তকে দেখে স্বাগতা।

কার্পটা গাড়ির বাইরে বাতাসে ছুঁড়ে দিল সুবৃত্ত। তারপর বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সেকেন্ড টাইম কী করে হয়...

—হয় না।

—তাহলে সুচেতন বলল কেন? কেন বলল, আমার চেনটা নাটকে কাজে লাগবে? নাটক কিসের? আমার জীবনটা নাটকে ঢুকবে কেন স্বাগতা?

—সুচেতন নাটকের লোক, তাই। আমি প্রথম দিনই বলেছি, আমাদের বিয়ে হয়েছিল, তারপর ডিভোর্স হয়ে গেছে। তুমি ভাবতে পারছ না বিয়ে সত্যি হয়েছিল। তুমি স্মৃতিব মধ্যে রয়েছ সুবৃত্ত।

—ও। বলে একেবারে চুপ করে গেল মণি। চোখ বন্ধ করে মাথাটা পিছনে হেলান দিল। বিড়বিড় করে বলল, আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি আমোদিনী!

স্বল্পস্ফুট হলেও কথাটা কানে গেলে স্বাগতার। সে সহসা সুবৃত্তর একটি হাত পাশ থেকে চেপে ধরল। চোখ মেলল সুবৃত্ত। পাশে ঘাড় ফেরাল। পর্ণার চোখে দেখল আনন্দের ব্যথিত উদ্ভাস।

পত্রিকা দপ্তরে এসে পাঁচ হাজার টাকার নগদ সম্মানদক্ষিণা পেয়ে অভিভূত সুবৃত্ত শেখরকে বলল, শেখরদা, কেমন বিশ্বাস করতে পারছি না!

—কেন পারবে না! ওই অ্যামাউন্ট বেশি বেশি লাগছে তো! ওটা পত্রিকার তরফে সহযোগিতা মাত্র। তুমি সুস্থ হয়ে কাজে ফিরে এসো সুবৃত্ত। বলে উঠলেন শেখর।

—কিন্তু এই কবিতা কোথায় পেলে তোমরা?

—সুচেতন চৌধুরীর সৌজন্যে পাওয়া। উনি জমা দিয়ে বলেছেন, টাকাটা একটু

বেশি দিতে, যাতে তোমার কাজে লাগে। আচ্ছা মিসেস চৌধুরী, আপনিই সুবৃত্তকে দেখছেন এখন?

—হ্যাঁ।

—সেই কথাই বললেন সুচেতনদা। শুনলাম, আপনারা স্বামী-স্ত্রী মিলে একটি নতুন নাটকে হাত দিচ্ছেন। স্টোরিটা আপনারই শুনলাম। শেখরের কথা শেষ না হতেই টেবিলের টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোন রেখে উনি ছুটলেন অন্যদিকে।

পর্ণা বলে উঠতে চেয়েছিল, 'আমি কারও মিসেস নই মিস্টার শেখর', কিন্তু মুখ খুলে শব্দ বার হওয়ার আগেই টেলিফোন এবং শেখরেব ব্যস্ত ছুটে যাওয়া তাকে সত্য বলার ফুরসত দিল না।

সমস্ত সহিষ্ণুতা শেষ করে বসেছিল সুবৃত্ত। কিন্তু সে উত্তেজিত হল না, বরং নির্বাক হয়ে গেল। নিজেকে তার অসম্ভব পরাস্ত এবং অপমানিত বোধ হচ্ছিল। একটু আগে কী বোকার মতো সে পর্ণাকে ভালবাসার কথা বলেছে। ছিঃ! ছিঃ! মনে মনে মেয়েটা কী ভাবছে! বা চিকিৎসার এটাই মুখোশ-কৌশল। স্বাগতার কাছে সে একটা বোকা রোগী মাত্র। অথচ কী নির্দ্বিধায় পর্ণা বলল, 'অভিনয় করতে পারি না।'

দোতলা থেকে দ্রুত সুবৃত্ত নীচের রাস্তায় ট্যাক্সির কাছে চলে আসে। ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল স্বাগতা। সুবৃত্তর পিছুপিছু ছুটে এসেছে সে। সুবৃত্তর পিছুপিছুই ট্যাক্সির পিছনের সিটে ঢুকে পড়ে বলল, বাইপাস ধরবে ভাই। ট্যাক্সিকে নির্দেশ দেয় পর্ণা।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিতেই হাসিখুশি একটা হৃষ্ট ভঙ্গি করে স্বাগতা বলল, আমরা একটু ঘোরাঘুরি করে তবে ফিরব মণি।

—না।

—তুমি আমার কথা মতোই চলবে। চলো তো বাই। এমনও হতে পারে...আচ্ছা, ভি. আই. পি ধরবে, আগ বাইপাস ধরো। জোরে চালাবে। এই ব্যাগটায় অনেক টাকা রয়েছে সুবৃত্ত। তুমি আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ো।

—নাহ্!

—দুষ্টুমি করবে না।

—দেখো মিসেস চৌধুরী, আমি দুঃখিত। লজ্জিতও খুব। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি না জেনে বলেছি তোমাকে...

—বেশ তো! তাতে কী হয়েছে! আমি অন্যের বউ। তোমাকে সঙ্গে করে পালাচ্ছি। তুমি কবি হয়ে কোনও সাহস রাখো না?

—না।

—আমার থুতনির তিলটাকে তুমি অবৈধ বলেছিলে। ঠিকই বলেছিলে। আমার

শরীর আমার মুখের মতোই সুন্দর সুবৃত্ত পাখিরা। তোমার ডানা পেলে আমিও পরী হব মণি!

—সুচেতন আমার উপকার করেছে মিসেস চৌধুরী। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

—কৃতজ্ঞ তো কী?

—আমি পারব না।

—কী পারবে না?

—তোমার সঙ্গে মরতে।

—আমি খারাপ মেয়ে সুবৃত্ত পাখিরা। অবৈধ তিল আঁকি, চার টাকার নকল গয়না পরে মানুষের মৃত্যুফাঁদ পাতি। আমার কবিকে আমি নষ্ট করেছি। কিন্তু তোমাকে বলছি মণি, প্রেম সংসারের সমস্ত নীতিজ্ঞান পছন্দ করে না।

—তা করে না। কিন্তু করে না এই জন্যে যে, 'প্রেম' নিজেই একটা মূল্যবোধ। অন্য নীতিগুলির সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বেধে উঠতে পারে। প্রেমের বোঝাপড়া মানুষের শ্রেষ্ঠ নীতিগুলির সঙ্গে। প্রেম কখনও হীন প্রবৃত্তির সঙ্গে পাল্লা ধরে না।

—কে বলেছে? একটা মেয়েকে ঘিরে দু'জন পুরুষের খুনোখুনি কি প্রেম নয়?

—না। ওটাকে আদি পাপ বলে। বাইবেলে দুই ভাই তাদের বোনকে অধিকার করতে গিয়ে লড়াই করল। এক ভাই খুন হল অন্য ভাইয়ের হাতে। এটা প্রেম কেন হবে? এটা আদিম রিপুর খেলা, এটা যৌনযুদ্ধ। 'প্রেম' একটা আধুনিক ধারণা। এ যুগে ফের যৌনতাকে 'প্রেম' বলে মানুষ। রবীন্দ্রনাথ বলতেন না।

—শরৎচন্দ্র প্রেমের কদর্য দিকেরও উল্লেখ করেছেন।

—ঠিক করেননি। প্রেম আবার কদর্য হবে কেন? সেটাকে তাহলে অন্য নাম দাও।

—আমি মনে করি, তোমাকে আমি ভালবেসেছি সুবৃত্ত। এবং সুচেতন আমাকে ভালই বেসেছে। এখন বলো, এমন কি সংসারে হয় না? এই দ্বন্দ্ব কি প্রেম নয়?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি যদি সুচতেনকে খুন করি, তাহলে সেটা আর 'প্রেম' রইল না। যেমন ধর, দেশপ্রেমও প্রেম, কিন্তু হিটলারের উগ্র দেশপ্রেমকে দুনিয়ার মানুষ নাম দিয়েছে ফ্যাসিবাদ। ভারসাম্যহীনতা, উগ্রতা, এসব প্রেমের অসুস্থ লক্ষণ। যেমন দুধে চোনা পড়লে, সেটা দুধই বটে, তবে সেই দুধের দুধত্ব থাকে না। যেমন ধর, গোরুর পায়ের ধুলা মাত্রই গোধূলি নয় এবং সূর্যাস্ত মাত্রই গোধূলি নয়, তেমনই নরনারীর কোলাহল বা বকম বকম মাত্রই প্রেম নয়। যাকগে, ট্যাক্সি ফেরাও স্বাগতাপর্ণা।

—তুমি বিরক্ত হচ্ছ কেন মণি! তুমি আমার উপর ন্যস্ত হয়েছ মনে রেখো। তোমার দায়িত্ব আমার।

—ন্যস্ত হয়েছি? বাহ্, ভাল বললে তো! আচ্ছা খুকু, এবার তো ফিরতেই হবে। অনেক দূর এসে পড়েছি আমরা। সূর্য ঢলে পড়েছে।

—তুমি কি পিউরিটান মণি?

—হ্যাঁ।

—আমি তাহলে কী করব? আমার তো শুচিতা নেই।

—প্রেমের শুচিতা ঠাকুরের দান নয় খুকু! ওটা মনের শুদ্ধতা।

—আমার আছে।

—নেই।

এবার দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল পর্ণা। সূর্য আরও ঢলে গোধূলি খুঁজতে ব্যস্ত।

—দেখো সুবৃত্ত। সাহিত্যের সমস্ত প্রেমই অবৈধ। রাধাকৃষ্ণ অবৈধ সম্পর্ক করতেন। তাজমহলের মমতাজ কেমন ছিলেন? খুব বুঝি শুদ্ধ?

—আহ্ খুকু! শুদ্ধই ছিলেন।

—তাঁর অতীত?

—জানি না।

—তোমার আধুনিকতা অসার কবি! পঞ্চ সতীরা কেমন সতী ছিলেন?

—জানি না।

—দ্রৌপদীর কি প্রণয় ছিল কিছু?

—জানি না। শুধু বলছি, প্রবৃত্তির চরণাশ্রয়ে প্রেম থাকে না। প্রেমেরও বিবর্তন হয়েছে। দ্রৌপদী কি পঞ্চসতী কি লাইলি মজনু বা রাধাকৃষ্ণ আমার চৈতন্য ভরে না আমোদিনী। তাজমহল দেখে মুগ্ধ হই, কিন্তু চোখে জল এনে ফেলার বোকামি আমার নেই। আমি বলছি, কাউকে ঠকিয়ে, হেয় বা অপদস্থ করে, মেরে, খুন করে, উচ্ছেদ করে এবং পাগল করে দিয়ে ঘর বাঁধা যায় না খুকু।

—তোমাকে মরতে দেখে, মারতে দেখেও আমরা প্রেম করেছি সুবৃত্ত পাখিরা। একটা পাগলকে আমাদের প্রেম আরও পাগল করেছে মণি!

—না। এতদিন তাইই ভেবেছিলাম। ভুল পর্ণা। সুচতেনকে ধন্যবাদ, নমস্কার, প্রণাম, বলে কপালে দু'হাত ঠেকায় সুবৃত্ত। পর্ণা দু'হাতে ফের মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে।

ফুঁপিয়ে উঠে মুহূর্তে মুখমণ্ডল থেকে নিজের দু'হাত সরিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে সুবৃত্তকে অত্যন্ত মমত্বপূর্ণ নজরে স্বাগতা দেখে। মনে মনে ভাবে, তারই জীবন জটিলতা মণিকে বার বার সিদ্ধান্তহীন করে তুলছে। সুচেতন কত বড় ধূর্ত মণিকে বোঝানো যাবে না। কবিতাগুলি ছেপে মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করেছে রতন, মণির মাথা

কিনে ফেলেছে। এই রোগীরা কোথাও একটা সুদৃঢ় আস্থা চায়, কারও উপর চরম নির্ভরতা চায় এবং কারও উপর নির্ভর করতে গিয়ে যদি সামান্যও ফাঁক বা ফাঁকি দেখে, তন্মুহূর্তে মনে মনে 'রিঅ্যাক্ট' করে সরে আসে। এক জায়গা থেকে সরে অন্যত্র যদি ক্ষীণ আশ্বাসও দেখে মনটাকে সেই দিকে ছুটিয়ে দেয় এবং বুঝেও দেখে না হোথায় কোনও গহ্বর আছে কিনা! 'আমি তোমাকে বার বার হারিয়ে ফেলছি মণি'—মনে মনে একথা বলে নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে পর্ণা।

—মণি!

—আচ্ছা বেশ।

—বলই না।

—বেজটা (Base)টা হল যৌন-প্রবৃত্তি, বেজটা সবসময় মাটির তলায় থাকে। সেটাকে দেখা যায় না, কিন্তু তার অস্তিত্ব সত্য এবং প্রতিষ্ঠিত। বাস্তুবিদ্যার এই ভিত্তিমূল যৌনতার সামিল। এটা আছে, কিন্তু তাই নিয়ে কি আমরা সব সময় মাথা ঘামাই? বরং আমরা সৌধের কারুকাজে মন দিই। আমরা তাজমহলের ভিত্তি আলোচনা করি না, করি তার উদ্ভাস বিষয়ে। এমনকী প্রকাশ্য পূর্ণিমায় তাজমহলকে উপভোগ করতে চাই। 'অমাবস্যার তাজমহল' কথাটা কখনও শুনিনি। কিন্তু ব্যাপারটা কল্পনা করা যেতেই পারে।

—তো?

—'সেকেন্ড টাইম বাগদান' কথাটা শুনতে 'অমাবস্যার তাজমহল' গোছের। কিন্তু বিষয়টা কল্পনা করে আনন্দ নেই।

—তুমি ও-কথা ভুলে যাও মণি! প্লিজ!

—আমি তো আমার সুবিধা মতো মনে রাখি স্বাগতাপর্ণা! তো, অমাবস্যার তাজকে সরু একটা মোমবাতি জ্বেলে দেখবার চেষ্টা চলেছে। তাতে হল কি, বাগদান কথাটার মোহমাধুর্যই ঘুচে গেল খুকু! 'সেকেন্ড টাইম', কী প্রাণান্তকর চেষ্টা! বলে কিছুক্ষণ চুপ করে গেল সুবৃত্ত।

সুবৃত্তর বলা কথাগুলোকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে একটা দুর্বোধ্য অসোয়াস্তি অনুভব করছিল পর্ণা।

হঠাৎ দুম করে সুবৃত্ত বলল, 'সেকেন্ড টাইম বাগদান' কথাটা বেআব্রু এবং যৌনগন্ধী। খুব তরল এবং নাটুকে। তবু সুচেতনকে, ধন্যবাদ, নমস্কার, প্রণাম।

—ওটা তোমাকে সুচেতন নাটক করেই বলেছে।

—তাহলে তোমরা স্বামী–স্ত্রীই? শেখরদা বলল যে মিসেস চৌধুরী! আচ্ছা বলো, সত্যিই তোমরা কারা? বলে সুবৃত্ত যেন নিজেকে বিদীর্ণ করে তুলল।

ভারী অবাক এবং আহত হয়ে শান্ত গলায় পর্ণা বলল, আমরা সেই মানবমানবী

যারা, সরু মোমের আলোয় অম্যাবস্যার তাজমহল দেখি, আমরা খুবই অসুন্দর সুবৃত্ত পাখিরা। অ্যাই ড্রাইভার, গাড়ি ঘোরাও, আমরা আর যাব না। এই দফার শেষ বাক্যটা বেশ উষ্ণ করেই বলে উঠল স্বাগতাপর্ণা।

—তুমি হঠাৎ রেগে গেলে।

—না। রাগ নয়। বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে ঘৃণা করছ। ঠিকই তো, আমার রুচিটা ভাল নয়। আমার 'বেজ' খারাপ। নইলে...যাক গে। আমি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি। জোরে চালাও ভাই।

—খুবই দুঃখিত স্বাগতাপর্ণা, আমি তোমাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছি।

—আমার দ্বারা হবে না মণি!

—কী হবে না?

—তোমার নিরাময়। বরং আমি সরে গেলে তুমি ভাল থাকবে।

—তাহলে সোনার চেনটা?

—তুমি স্মৃতি ছেড়ে বেরিয়ে এসো সুবৃত্ত। মানুষকে দোষেগুণে দেখবার চেষ্টা করো।

—চেনটা?

—ওটা দক্ষিণের ট্রেনে আমার গলা থেকে ছিঁড়ে নেওয়ার লোকের অভাব হবে না। আমি আর পরতে চাই না সুবৃত্ত।

ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিয়েছে ড্রাইভার।

—তুমি আমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে?

—মরতে।

—গেলে না কেন?

—তোমার সঙ্গে মরা যায় না।

—কেন?

—আমি এখন আর কোনও আনন্দ পাচ্ছি না। হঠাৎ সব শুকিয়ে গেল মনে হচ্ছে।

—আঘাত দিলাম?

—না, খুব ক্লান্ত লাগছে।

—আমিই তোমাকে ক্লান্ত করেছি?

—তোমার কবিতাও হয়তো আমার আর ভাল লাগবে না। এই দেখো, সুচেতনের হাতচিঠি। লিখেছে, নাটক করবে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি। বলে ব্যাগের ভিতর হাতড়ে একটি চিরকুট বার করে সুবৃত্তর সামনে ধরে পর্ণা।

প্রিয় পর্ণা,

আমি তোমার কাছে একটি সৎ নাটকের জন্যই এসেছিলাম। আমাদের জীবনই নাটক। গল্পটা তোমার মুখ থেকেই পেয়ে গেছি। মঞ্চে সাজাব আমাদের মিলিত জীবন। অথচ বাস্তবে কখনও মিলিত হব না। সুবৃত্তর মালা কখনও গলায় নেবে না তুমি। এই 'ডার্ক কমেডি' ঘনিয়ে তুলতে হবে দৃশ্যে। ঠিক আছে। কাজ এগোচ্ছে। টাকা চাই। দেবে তো? ইতি রতন।

—রতন?

—সুচেতনের ডাক নাম।

—আচ্ছা!

—পুনশ্চ কী লিখেছে?

আবার চোখের সামনে চিরকুট ধরে সুবৃত্ত। পুনশ্চঃ তুমি বন্ধু, তোমাতে আমাতে বন্ধুত্বের বাগদান হয়েছে, অন্যকিছু নয়। সুবৃত্তের সুস্থতা আমার কাম্য। র. চৌ.

—ধন্যবাদ, নমস্কার, প্রণাম সুচেতন। বিড়বিড় করে বলল সুবৃত্ত।

—ঠিকই। শ্লথস্বরে বলে ওঠে পর্ণা।

—তাহলে শেখরদার সামনে তোমাকে 'ওয়াইফ' বলে আইডেন্টিফাই করে কেন?

—রতন আমাদের ছাড়াছাড়ির কথা বলে না। লজ্জাবশত করে হয়তো। বা এখনও ভালবাসে।

—তুমিও বাসো?

—ক্ষতি কি বাসলে! স্পিড দাও ড্রাইভার। সন্ধ্যা হয়েছে। আলো দাও। কবির মুখ দেখা যাচ্ছে না। হয়তো আর পড়ব না তোমাকে। তুমি ভাল থেকো। জোরে, জোরে!

সহসা লক্ষ করা গেল, সুবৃত্তর চোখে গাঢ় ঘুম নেমে আসছে। সে ঢলে পর্ণার কাঁধে পড়ে গেল। পর্ণা কাঁধের সঙ্গে চেপে ধরল তার প্রিয়তম কবিকে। জড়িয়ে নিল। আলিঙ্গনে প্রগাঢ় করল কারুবাসনা। ড্রাইভারকে বলল, ট্যাক্সি ঘোরাও ভাই। যেদিকে আগে যাচ্ছিলাম, সেদিকেই যেতে হবে। চলো, কোথায় যাবে বলে দিচ্ছি।

রাত দশটা নাগাদ ওরা এল একটি রিসর্টে, নদীর আওতায়। একটি ধকধকে বড় নক্ষত্রের মাংসল আলোয় ঝিলমিলানো অন্ধকারমাখা নদীর চাপা কল্লোলে মনটা ভাসিয়ে দিল স্বাগতাপর্ণা।

ওদের দোতলার ঘরটা নদীকে টানছে। জানলা খুলে পর্ণা সেদিকে চেয়ে রইল। সাদা ধবধবে বিছানায় পড়ে আছে এলানো দেহ পাখিরা। নদীর রোল ছাড়া আর সবই নির্জন। ঘরে দু'খানা খাট।

ফুলস্পিডে পাখা ঘুরছে ঘরে। ঘুমন্ত পাখিরার গায়ের পোশাক খুব সাবধানে

খুলতে থাকল স্বাগতা। জুতো, প্যান্ট খুলে দিল। পথেই সে কিছু পরিধেয়, তোয়ালে কিনে একটি বাক্সে ভরে নিয়েছে। সাবান, টুথপেস্ট, যা লাগে সব নিয়েছে।

খালি গায়ে ঘুমিয়েই রইল সুবৃত্ত। বড় তোয়ালেটা মণির শরীরের নিম্নাংশে ছড়িয়ে মেলে দিল পর্ণা। তাবপর ঝুঁকে কবির চোখের পাতায় খুবই আলতো করে চুম্বন দিয়ে বলল, তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি পাখিরা। তোমার সুস্থতার জন্য সব করতে পারি। একটি সরু মোমবাতি অমাবস্যাব তাজমহল দেখছে সারা মহল প্রদক্ষিণ করতে করতে, প্রাণান্ত এই চেষ্টাও কি কম মণি! বলে কবিকে খাটে ফেলে বাথরুমে চানে আসে পর্ণা। তার পছন্দের সাবানটাই মাখে।

নাইটি পবে হাওয়ার নীচে চুল শুকোতে থাকে। ভেজা তোয়ালে দিয়ে কবির শরীর ধীরে ধীরে ভিজিয়ে শুকিযে নেয়। গায়ে কবির পাউডার ঢালে। তারপর ওই অবস্থায় রেখে নীচে এসে সাগরীকে একটি এস. টি. ডি করে দেয়। বলে, আমার কাছেই রইল সুবৃত্ত। একটুও ভেবো না মাসিমা। আমি তোমাকে একটি আস্ত মানুষ ফিরিয়ে দেব। পাখিরা আবার লিখবে।

ফোন করে উপরে এসে পর্ণা লক্ষ করল, মণি কাত হয়ে শুয়ে চেয়ে রয়েছে খাটের সাদায় একটি বিন্দুতে। পর্ণা ঢুকতেই নড়ে উঠে চিত হয়ে গেল। মায়ামাখানো পাখিরার চোখে শান্ত বিস্ময়। কোনও কথা বলছে না। থমকেছে পর্ণা। তারপর একটুখানি নড়ে সরে খাটেব চারপাশে ঘুরে নেয়, সুবৃত্তর দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করে। সুবৃত্তর দেহ চিত-কাত-উপুড় হয়।

খাবার দিয়ে গেল একটি ছেলেমানুষ। পর্ণা দরজা এঁটে দিল।

—উঠবে না?

—চান করব।

—হ্যাঁ।

মণিকে বাথরুমে টেনে তুলে আনল পর্ণা। জল-চালুনি ছেড়ে কবিকে ভেজাতে থাকল। তারপর বলল, সাবান ওখানে আছে। ওটাই মাখি আমি। নাও, এবার নিজে করো। দরজা ভেজিয়ে দাও, আমি যাচ্ছি। বলে বাথরুমের দোর টেনে দিয়ে বাইরে অর্থাৎ ঘরে আসে পর্ণা।

টেবিলে খাবার সাজাতে গিয়ে থামে। আগে ও আসুক।

—পাজামা পরে নাও।

—নতুন জিনিস?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু...

—পরবে না? কেচে শুকোতে পারলে ঠিক ছিল। আমি তো নাইটিটা না কেচেই

পরে ফেলেছি। এখন ভাল লাগছে না। যাই হোক, কেউ তো আগে পরেনি। অত খুঁতখুঁতে হলে...

—না, ঠিক আছে। আমি ওইসব ভাবছি না।

পরে ফেলে সুবৃত্ত। এবং বলে—

—খিদে পেয়েছে।

—আমারও।

—আচ্ছা। খুকু, না থাক।

—বলই না!

—কথা না বলেই তো চমৎকার লাগছে। নদীতে নক্ষত্রটা পড়ে যাবে মনে হচ্ছে।

খেয়ে নেয় ওরা।

খাওয়া শেষে আঁচিয়ে তোয়ালেই মুখ মুছে মৌরি মুখে ফেলে সুবৃত্ত। খাটে এলিয়ে পড়ে যায়। উপুড় হয়ে মুখ যেন লুকিয়ে রাখছে। বাহুর আড়ালে।

—এখানে এলে কেন? মুখ গুঁজে পাখিরার জিজ্ঞাসা।

—জানো, দক্ষিণে একটি নদী আছে, নাম তার মণি। শুনেছি, খুব ছোট নদী। কেমন সে দেখিনি। ধরো, সামনে সেই নদীটাই বেশ বেড়ে বইছে। তাই এলাম। এখানে তোমার পাখিজন্মের ভোর হবে সুবৃত্ত। তুমি নতুন করে জন্ম নেবে।

—পর্ণা!

—হ্যাঁ কবি। বিশ্বাস করো, আমি তোমার প্রত্যাবর্তন চাই। বৈধ-অবৈধ সব ভুলে যাও তুমি। ঘৃণা কোরো না আমাকে। নিউট্রাল জোন-এর অন্ধকারে আমি তোমাকে আর যেতে দেব না।

—খুকু!

—হ্যাঁ, সুবৃত্ত। বলে পর্ণা খটে বসে মণির স্বল্পসিক্ত চুলে আঙুল চালিয়ে নেড়ে দিতে থাকে।

—সুচেতন যদি জানতে পারে!

—এখানে কেউ নেই। নতুন জন্মে সব নতুন। আমার শরীর, আমার মন। আমার কণ্ঠস্বর, আমার ভাষা।

—ঠিক বলছ?

—অন্নের নামে, বায়ুর নামে, নদীনক্ষত্রের নামে বলছি সুবৃত্ত, তোমার অক্ষরের নামে মণি। আমি সৎ। বলে সুবৃত্তর কানে মুখ রাখল পর্ণা। এবং বলল, আমি তোমাকে কত খুঁজেছি পাখিরা। একটি সরু মোমবাতির মতো। তোমারই কথায় তোমাকে পেয়েছি ব্রাত্য। আমি তোমার ধর্ম চাই, মন্ত্র চাই শিব। আমাকে নাও পাগল। আমাকে ফেলে দিও না, উড়ে যেও না প্রকৃত সারস। বলে অকস্মাৎ সুবৃত্তর

মাথাটা কোলে তুলে শরীরটাকে চিত করে নেয় পর্ণা। এবং বলে, দেখো, আমার বড্ড অভিমান খোকা, সত্য বলি, তবু কেউ চেনে না আমাকে। কতদিন আমি যাদবপুর স্টেশনে একলা দাঁড়িয়ে কেঁদেছি। বলতে গিয়ে পর্ণার জল নামল চোখে।

—আমাকে ঢেকে রাখো খুকু। আমার ভয় করছে! বলে সুবৃত্ত পর্ণার কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলল, যেন কোনও নারীপক্ষীর পাখনার ওমে মুখ রাখল।

কিছুক্ষণ পর্ণার কোলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার পর পর্ণার কফি কালারের নাইটিকে ভয় করল সুবৃত্তর। সে মুখ তুলল এবং উঠে বসে গেল। হঠাৎ বলল, বাইরে ঝড় উঠেছে।

—কই না। বাইরে চেয়ে দেখে বলল পর্ণা।

—বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে!

—তা-ও নয়।

—ভয়ই করছে স্বাগতা। তুমি তোমার ওই রাতপোশাক খুলে শোও। ওটা ভাল নয়। রতন বলেছে, মিনতি আবার আমাকে মারবে। আমি যেন তোমার বাড়িতে হামলে না পড়ি।

—আর কী বলেছে?

—মনে পড়ছে না। তাছাড়া তোমাকেও তো আমি খুন করতে পারি। কী ভরসায় তুমি আমাকে সঙ্গে এনেছ খুকু? আচ্ছা, এই রকমই একটা রাত ডায়মন্ডহারবার হোটেলে সুচেতনের সঙ্গে কেটেছে তোমার? বিয়ের আগে তোমাদের ডেটিং

—না। আমি পাশের ঘরে গেলাম। আমার ঘুম পাচ্ছে।

—এ ঘরে থাকবে না?

—তোমার সঙ্গে?

—তাহলে!

—পাশের ঘরটা আমার জন্যে সুবৃত্ত পাখিরা। আমি আমোদী নই। আমি পর্ণা।

—তো?

—আমরা চাবজন, নিমু, বিনুনি, রতন এবং আমি ডায়মন্ডহারবারের দুই স্টেশন আগে, বাসুলডাঙায়, শাকিলের ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। শাকিল 'কুসুমের ফেরা' নামে একটি কবিতার পত্রিকা করত। শাকিলের ওখান থেকে নদী দেখতে গিয়েছিলাম, তখন পথের দোকান থেকে চারটাকার চেন কিনি। সন্ধ্যার আগেই ফেরার তাড়া। শাকিল ডায়মন্ড থেকে ট্রেনে তুলে দেয়। রাত ন'টার আগে আমাকে হস্টেলে ফিরতে হত। তাইই ফিরেছিলাম। নিমু আর রতন যাদবপুর হস্টেলে, আমি কলেজ স্ট্রিটে এবং বিনুনি থাকত বেহালায় মামাবাড়ি। তার পক্ষেও বাইরে রাত

কাটানো সম্ভব ছিল না। আমি কারও সঙ্গে কখনও হোটেলে থাকিনি মিস্টার পাখিরা। আমি আমোদী নই। আমি অন্য কেউ। এবং নিমু-বিনুনি বিয়ে করেছে। ওরা এখনও নাটকের সঙ্গে যুক্ত। ওরা যথেষ্ট সৎ। নিশ্চয় একদিন আলাপ হবে।

—আমার সঙ্গে?

—তবে কার সঙ্গে!

—তুমি সত্য বললে না। তোমরা ডায়মন্ডহারবার গিয়েছিলে।

—হ্যাঁ গিয়েছিলাম। তবে হোটেলে উঠিনি শ্রীযুক্ত কবি।

—রেগে যাচ্ছ! শোনো, তুমি রাগবে না। যদি যেতেই...

—হ্যাঁ, যেতামই যদি, তাহলে কী হত! আমি তো রতনকে ভালবাসতাম, ওর সঙ্গে রাতে কোথাও থাকলে খারাপ কী হত শুনি! কিন্তু যা ঘটেনি, তাইই কেন শুনতে চাইছ? তুমি যাকে আমোদী ভাবছ, সে তা নয়, এখানে দু'খানি ঘর ভাড়া হয়েছে। গুড নাইট। আমি এই পোশাকেই থাকতে চাই। সহ্য করতে হবে তোমাকে।

বাইরে এবং পাশের ঘরে চলে যায় পর্ণা। ওর সশব্দ দরজা এঁটে দেওয়ার কাজটি শোনা যায়। কাণ্ড বটে, ভেবে আপন মনে হেসে ফেলে সুবৃত্ত। তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের আলো নিবিয়ে দেয়। দাঁড়ায় খোলা জানলার হাতায় নদীর মুখোমুখি মৃদু কল্লোলে। ঝিলমিল করছে তরঙ্গে তারার আলো, পিছলে সরে যাচ্ছে কিসের মতো। বড্ড অভিমান, আমি তোমাকে খুন করলে বাঁচব না খুকু! জানি, ভরসা করো না। মিনতি না থাকলে সেদিন তুমি মরে যেতে পর্ণা।

হঠাৎ নীচে কী যেন গোলমাল হচ্ছে। দ্রুত নেমে আসে সুবৃত্ত।

—না, একটা মেয়ের জন্য এখানে একটা আলাদা ঘর হয় না। আপনারা দু'জন এসেছেন।

—আমি দু'টো পাশাপাশি ঘরের কথা বলেছি। আপনারা তখন মাথা নেড়ে সায় দিয়েছেন।

—আপনারা তো একই ঘরে খাওয়া-দাওয়া করলেন। একই সঙ্গে এসেছেন।

—তাতে কী হল!

—হল না?

—না হল না। দু'খানি চেয়েছি, দু'খানাই দেবেন।

—পাশের ঘরে লোক দেওয়া হয়ে গেছে। ঠিক আছে, কোণের ঘরের চাবি দাও ওনাকে, উনি একাই থাকবেন।

—না। পাশাপাশি ঘর চাই আমার।

গোলমাল এবার বাঁকা হয়ে পাকিয়ে উঠতে চাইল। হঠাৎ কেউ একটা বিশ্রী কথাও উচ্চারণ করল। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, পাশাপাশি দু'টি খালি ঘর আর খালি

নেই।

—একসঙ্গে আসবে, আবার সমস্ত করে আলাদা শুতে চাইবে। এটা কেমন হল বাচ্চু!

—কী! কে বলছেন ও কথা, সামনে এসে বলুন একবার। আই অ্যাম ডক্টর এস. পি. মুখার্জি, প্রফেসর। যাকে উপরে দেখেছেন, হি ইজ মাই পেশেন্ট, ওর সঙ্গে থাকতে হবে মানে এই নয় যে, তার সঙ্গে ফুর্তি করে রাত কাটাতে হবে। ভুল বুঝেছেন আমাদের আপনারা। অশ্রুভেজা বাষ্পরুদ্ধতা স্বাগতার কণ্ঠস্বর চেপে ধরে এবং তখন ভীষণ অসহায় লাগে তাকে।

সিঁড়ির প্রায় শেষ ধাপে এসে দাঁড়ানো সুবৃত্তর দিকে সবার চোখ এসে পড়ায় টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় খুকু। মণিকে দেখে সিঁড়ির দিকে ছুটে এসে দু'ধাপ উঠে মণির হাত চেপে ধরে বলে, তুমি কেন নীচে নামলে! চলো, শিগগির চলো। ঘুমিয়ে পড়বে। আমি তো বলেছি মণি, পাশের ঘরে থাকব। ডাকলেই সাড়া পাবে। চলো, তাড়াতাড়ি চলো।

দ্রুতই মণিকে উপরে তুলে আনে খুকু। খাটে টেনে এনে ফেলে দরজা এঁটে দেয়। এবং বলে, এই সব জায়গাও ভাল নয় বোধহয়। তুমি দেখলে কী বলল লোকটা! তোমাকে আমি কোথায় রাখব মণি। আমার খুব খারাপ লাগছে, আমি তখন কী সব পাগলের মতো বলে গেলাম। বলে সুবৃত্তর একটা হাত জড়িয়ে ধরে কোলে টেনে নিয়ে মাথা নিচু করে রইল স্বাগতা।

অপরাধীর গলায় এক সময় সুবৃত্ত বলল, আমি বিপজ্জনক আর নই স্বাগতা। তোমাকে মারব না, ভরসা করে এখানে থাকো। দেখো, আমি ভাল হয়ে গেছি। আমার নতুন জন্ম হচ্ছে। আমি গাইতে পারি খুকু। 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি।' গাইব? তুমি শুনবে? আমাকে মাফ করে দাও স্বাগতাপর্ণা। আমাকে গাইতে দাও। তোমাকে আমি বিশ্বাস করেছি নূপুর।

সুবৃত্তর কথা শুনতে শুনতে পর্ণা সচকিত বিস্ময়ে এবং আনন্দ-আশ্বাসে ভরে ওঠে। তার শরীর পর্যন্ত পুলকে ফুটে ওঠে যেন, খুশিতে ঝলমল করে মুখ। ঘর অন্ধকার করে রেখে গিয়েছিল মণি, ঘরে ঢুকে এসেই আলো জ্বেলে দিয়েছে পর্ণা। তারপর সুবৃত্তর একটা হাত জড়িয়ে ধরেছে। এখন হাতটা আরও গভীর করে চেপে ধরল। তার বারংবার মনে হতে লাগল, সুবৃত্ত গানের ভিতর দিয়ে কবিতায় ফিরতে পারবে। সে যে কখনও গেয়ে উঠতে চাইবে, এমন করে, সতত এবং আকুল আবেগে, বিশ্বাস করতে পারছিল না স্বাগতা।

স্বাগতার মুখে দৃষ্টি একদণ্ড স্থির রেখে উচ্ছ্রিত হল সুবৃত্তর গলা, যেন একটা পুষ্পবৃত্ত রোমাঞ্চিত হল, নদীতে ফেনিয়ে উঠল খোয়া উছল জল। সুবৃত্ত দেবব্রত

বিশ্বাসের ঢঙে গেয়ে উঠল।

যেতে যেতে একলা পথে
নিবেছে মোর বাতি
ঝড় এসেছে ওরে ওরে
ঝড় এসেছে ওরে এবার
ঝড়কে পেলেম সাথী
যেতে যেতে...
আকাশ কোণে সর্বনেশে
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে
প্রলয় আমার কেশে বেশে
করছে মাতামাতি
যেতে যেতে...
যেপথ দিয়ে যেতে ছিলেম
ভুলিয়ে দিল তারে
আবার কোথা চলতে হবে
গভীর অন্ধকারে
বুঝি বা এই বজ্ররবে
নূতন পথের বার্তা কবে
কোন পুরীতে গিয়ে তবে
প্রভাত হবে রাতি
যেতে যেতে...

সমস্ত দেহই যেন গাইছিল সুবৃত্তর। গলায় তার ছটফট করছিল ঝড়ের আর্তি। পথেই তার আলো নিবে গিয়েছিল—রেল পথে। তখন সে একা এবং তারপরেও একা। প্রলয় তার শরীরে-পোশাকে, ঘর এবং বাইরের হাওয়ায় মাথার চুল কাঁপছিল, নদীতে কি সত্যিই ঝড় উঠল? আকাশে ঘনাল বজ্রগর্ভ মেঘ? আকাশের প্রান্তকোণে ঝলকাল বিদ্যুৎ? কী একটা ঝলসিয়ে গুমরে মরছে সুরের ধাক্কায় ; পথভ্রষ্ট পথিকের পথ খোঁজার এই গানটাই ফের মণির চোখে দীপ্তি ভরে তুলছিল, যেন একটা সেই মোমবাতিই জ্বলে চলেছে। সুবৃত্তর গান কী ভরাট, মিষ্ট এবং উদাস।

দেখা গেল, বাস্তবিকই ঝড় উঠছে। বজ্র শুকনো কাঠ গলায় হাঁকল, বিদ্যুৎ চিরে গেল হাহা করে হাসির রেখার মতো, তারপর মৃদু মৃদু চমকাতে থাকল। নদীতে নেচে উঠল জল। ঘরে এসে আছড়ে পড়ল ছিটানো জলের ঝাপটা দেওয়া হাওয়া। ঝনঝন, মটমট করল বাড়িটা। পাশেই জানলা বন্ধ করার শব্দ হল। ওরাই শব্দ করে

কিছু আগে দরজা সেঁটেছিল। তখন সুবৃত্ত ভেবেছিল পর্ণা দরজা ভেজিয়ে দিচ্ছে।

সুবৃত্ত গান বন্ধ করে বাইরে চেয়ে রইল। চোখে তার দূর বিদ্যুতের হাতছানি, জন্মান্তরের অন্ধকার নীলিমায় কিসের সুন্দর হাহাকার। এমনই বাদল রাত্রি তাকে রিকশার তলায় ঠেলে দিয়েছিল ভয় পাওয়া পশুর মতো।

—আমি একটা গরিব মানুষকে খেয়েছিলাম, সেটা লুম্পেন—পথে খুব ভুল হল খুকু! আবার আমার বাবাকে দেখলাম, রতনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর স্টেশনে ফলঅলার ঝাঁকা সমেত মরে পড়ে আছে। বুঝতে পারি, আমি পাগল। এবং এখন তোমার নাইটি সেই বাদলা রাতটাকে মনে পড়িয়ে দেয়। বলে দু'হাতে মুখ ঢাকে সুবৃত্ত। এবং বলে, তুমি কফি রং পছন্দ করো?

পর্ণা বলল, ঠিক আছে আমি খুলে ফেলছি। সালোয়ার-কামিজ পরব?

—না থাক। নার্ভের শক্তি বাড়ুক স্বাগতাপর্ণা। গানটা আর একবার গাইছি, তুমি আমাকে ধরে থাকো। জানলা বন্ধ কোরো না। ঝাপটা বেশি হলে, বন্ধ কোরো। এই গানটায় একা হওয়ার বিশেষ একটা দুঃখ এবং আনন্দ আছে। আরাম পায় মনটা। কিন্তু কোথায় যে চলেছি! কোথায় যে ভোর! তবে ভোর তো হবেই। এবং ভাববেন না, আমি ঠিক হয়ে যাব।...যেতে যেতে একলা পথে...গেয়ে উঠল আবার সুবৃত্ত।

ভাড়ার একটি প্রাইভেট কারে ফেরার পথে সুবৃত্ত অধিকাংশ সময় দু চোখ বন্ধ করে পিছনে মাথাটা হেলান দিয়ে রইল। কথাই বলতে চাইছিল না। পর্ণাও রাতটা ভাল করে ঘুমোয়নি। চোখ বন্ধ করে খাটে পড়ে রইল। অন্য খাটে রইল সুবৃত্ত। গান গাইতে গাইতে ঢলে পড়ল। বাইরে বৃষ্টি-বাদল চলল আধঘণ্টা। একবার 'পাওয়ার' চলে গেল। ঘুমিয়েই রইল সুবৃত্ত পাখিরা। আলো এল। ঘুম ভাঙল না। দেখে মনে হচ্ছিল, গান যেন তাকে অন্য কোনও শান্ত সুন্দর পৃথিবীতে টেনে নিয়ে গেছে।

পর্ণা হঠাৎ জানতে চাইল—কী ভাবছ মণি? কথা বলছ না কেন?

—আপনাদের তথাকথিত 'সুস্থ' পৃথিবীতে আমার ফিরতে ইচ্ছে করে না, আমি আর 'পাগল' নই ভাবলেই, বেশ ভয় করে মিসেস চৌধুরী। আপনাকে হঠাৎ কখনও কখনও খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে বটে, কিন্তু মায়াও হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি সকলকে বলে দিন, আমি ভাল হয়ে গেছি। বলে চোখ খুলে পাশের পর্ণাকে একবার দেখে নিয়ে ফের চোখ বন্ধ করল সুবৃত্ত।

—আমি খুন হলে আপনার ভাল হবে!

—ঘুমের মধ্যে আপনাকে মনে মনে খুন করে আমি বেশ আরাম পাই এবং কাঁদি। কাউকে বলতে পারছি না কথাটা। আপনাকেই বললাম। বলে দুচোখ বন্ধ করেই রইল সুবৃত্ত।

—আমি তোমার শত্রু নই মণি! অমন করে বলছ কেন?

—তুমি আমার কেউ নও খুকু। 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি'—ব্যাস! আর কিছু নয়। আমার এই অসুখটা সেক্রেড অ্যান্ড ডিভাইন ডিজিজ, এটা আমি ভাল করতে চাই না। আমি নাস্তিক, ডিভাইন কথাটা পরলোক নয়, ইহলোকেই অসুখটার মধ্যে আছি, আমি এই অসুখেই ভাল থাকব। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

—তোমাকে আমি ধরে রাখতে পারি!

সুবৃত্ত চোখ বন্ধ করেই রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর সুবৃত্ত হঠাৎ বলল, সাংবাদিকতার কাজটা অত্যন্ত নির্মম। আমি শেখরদাদের জেলা প্রতিনিধি ছিলাম। মাঝে মাঝেই ধর্ষণ আর খুনের 'স্টোরি' করতাম। ফটোগ্রাফারের কাজটাও আমাকেই করতে হত। বলে আবার চুপ করল পাখিরা।

পর্ণা অপেক্ষা করছিল, আবার হয়তো সুবৃত্ত নিজে থেকেই কিছু বলবে। কিন্তু সে চুপ করেই আছে দেখে বলল, কাজটা নির্মম।

—আমার এই কাজটা যে রোগ বাধিয়ে তোলে, সেটাকে আপনি রিপোর্টারস নিউরোসিসও বলতে পারেন। ক্রমাগত ধর্ষণ এবং খুন একজনকে অসুস্থ করবেই; এবং যদি সে কবি হয়। আমি সাংবাদিকতা করতাম অন্ন আর কবিতার জন্য। খবরের কাগজের সঙ্গে থাকলে, ওদের বাইপ্রোডাক্ট সাহিত্য পত্রিকায় কবিতা ছাপার সুবিধা হবে ভাবতাম।

—সুবিধা হত?

—তা হত কিছুটা।

আবার চুপ সুবৃত্ত।

—সাংবাদিকতার চাকরি তাহলে আপনাকে অসুস্থ করেছে?

—রোগটাকে ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো নার্ভতন্ত্র গড়ে দিয়েছিল। আমি তৈরি হচ্ছিলাম। দক্ষিণের লুম্পেনরা এবং ভদ্দরলোকরা এবং স্বামী-স্ত্রী-প্রেমিক-প্রেমিকারা আমাকে বানাচ্ছিল, মাথাটা তয়ের করছিল। কোনও কালে আমার কোনও প্রেমিকা নেই। কারও কাছে কষ্টের কথা বলতাম না। ক্যামেরায় ছবি তুলতে কষ্ট হয়, বলতাম না। লিখতে কষ্ট, বলতাম না। কাকে বলব?

—কুদ্দুস!

—না। বলতাম কিছু, ও বলত, দেখো আর লেখো, ছবি তোলো এবং বলত, 'সংবাদ মূলত কাব্য'। [illegible]নাকে কবিতা করো।

—করতেন?

—হ্যাঁ, লেখার টেবিলে গলা কাটা মানুষের র[illegible] ছিটকে আসত। কবিতায় প্রেমিক বা স্বামীর এবং প্রেমিকা বা পরস্ত্রীর লাশের দুর্গন্ধ ঠেলে আসত। ক্রমাগত এইই। এক ডজন ধর্ষিতা। এবং প্রেমিকের তাগাদায় স্বামীকে খুন করে বসা স্ত্রীর একজন। এদের ছবি ডেভেলপ করে ট্রাঙ্কে রেখেছি। মাঝে মাঝে দেখতাম আর ভাবতাম কতগুলি 'স্টোরি' হল? এদের মুখগুলি কী নির্বোধ এবং যেন বা নিষ্পাপ! এদের মুখগুলি আমার সেন্ট্রাল নার্ভাস সিসটেমকে দুর্বল করে দিল। আমি মেয়েদের খারাপ ভাবতে পারতাম না। অথচ তাদের ছবি ফেলে দিয়ে সব ঝেড়ে ফেলার ক্ষমতা ফুরিয়ে আসছিল। কাকে বলি সেকথা? তাহলে তো কবিতা এবং চাকরি বহাল থাকে না। কে শুনবে?

কাতর সহানুভূতিতে পর্ণা বলে উঠল—আমাকে বলুন। আমি সব শুনব।

—সব?

—হ্যাঁ।

এবার চোখ বন্ধ করেই হেসে ফেলল সুবৃত্ত। নিঃশব্দে হেসে ফেলে চুপ করে পড়ে রইল।

—আপনি কারও স্ত্রী এবং স্ত্রী নয়। প্রথমে বিবাহের বাগদান করেন এবং পরে বন্ধুত্বের বাগদান করেন। কারও কবিতা ছেপেও তাকে আপনারা চিনতে পারেন না। এবং পরে আবার সেই কবির কবিতা ছেপে দেন। চেনটা চার টাকাব, প্রথমে বলেন না সেকথা। পরে সেই চেনটাই হয়তো একদিন পরবেন। খাঁটি জিনিস দিতে চাইলে নিতে পারেন না। চার টাকার চেনই আপনার দরকার বুঝি! আপনি আমোদী এবং আমোদী নন। তাহলে আপনি কে? ভালবাসেন অথচ ভালবাসেন না। এক ঘরে থাকেন, অথচ থাকতে চান না। কেন? কী চান? তাহলে আমি কেন ভাল হব স্বাগতাপর্ণা? বলে চোখ মেলে কটমট করে পর্ণার মুখে চাইল সুবৃত্ত।

তারপর সুবৃত্ত পাখিরা আচমকা পর্ণার গলা দু'হাতে চেপে ধরে বলল, ইউ আর

মাই ডিজিজ স্বাগতাপর্ণা। আমি তোমাকে হত্যা করব।

—প্লিজ মণি! আমার কথা শোনো!

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিল। পর্ণাকে ছেড়ে দিল সুবৃত্ত। পর্ণা বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি কেন থামলে ভাই!

—মারামারি চলছে। কী করব!

—এটা মারামারি নয়। চলো।

—তাও ভাল। মরতে হলে আমার গাড়ির বাইরে গিয়ে মরবেন। না হলে, চুপচাপ ভালভাবে যেতে হবে।

—ভালভাবেই যাচ্ছি।

—অন্যের বউকে বেশ ঘেন্না বাবুর! অথচ পরের জিনিস নিয়েই...

—চুপ করো। আমি অন্যের নই। তুমি কথা বলছ কেন?

ড্রাইভার এবার মাথার পাগড়ি খুলে টাকপোকা বার করল। বলল, তুমি অন্যের বউ নও নূপুর? রাতে আমি তো ওই রিসর্টেই ছিলাম গো। পাশের ঘরে। এই গাড়িটা তো নিমুর। ও আমাকে দিয়ে বলল, ফলো দেম, কোথায় যাচ্ছে দেখো। এই শর্মা তোমাকে তো ছাড়বে না খুকু। ঘটক বলল, চিকিচ্ছের নাম করে পর্ণা ফুর্তি মারতে যাচ্ছে। তুমি কবি সুবৃত্ত। রোগী সেজে মজা লুটলে! বাঃ, চমৎকার!

এই ঘটনার দ্বারা আবার বাতি নিবিয়ে দেওয়া হল। ধূর্ত রতন সুবৃত্তকে সম্পূর্ণ পাগল করে দিল। মাথায় কিস্তি আকারে পাগড়ি বাঁধা, মুখে খোঁচা দাড়ি এবং চোখে টাইট কালো চশমা হাঁকানো ড্রাইভার রতনকে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা পর্ণা রিসর্টের ওখানে চেনার চেষ্টাই করেনি। সে কল্পনাও করেনি, রতন তার নাটকটা কিভাবে তৈরি করছে। প্রাইভেট কার ভাড়ায় যাবে শুনেই মণিকে নিয়ে উঠে পড়েছে পর্ণা।

চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রতন এখন হ্যা হ্যা করে হাসছে আর বলছে, আমি তোমার কবিতা ছেপেছি সেকথা ঠিক। কিন্তু তুমি কোনও কবি নও। তাই না? কবিরা চরিত্রহীন হয়। সারারাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে তোমাদের সব দেখেছি, মানে শুনেছি। পাগলের যৌনপ্রবৃত্তি বেশ স্ট্রং হয় নূপুর। সারারাত বেশ পুষিয়ে নিল দেখলাম। ছিঃ। এই তুমি, সেবার ডাইমন্ডহারবার হোটেলে আমার সঙ্গে কত সতীপনাই না করলে! কত যে ফুসলাতে হল, তাও কি শক্ত গা নরম হয়! পরে কী হল! ওই রাগে কবি মার খেয়ে মরছে দেখেও তোমার ড্যানাটি আমি ছাড়লাম না। হেঁ হেঁ। আমার হাত থেকে তোমার কোনও মুক্তি নেই পর্ণা। এখন বল, কলকাতায় ফিরবে কীভাবে। জায়গাটা তো খারাপ। পাণ্ডববর্জিত মনে হচ্ছে, ফেলে চলে যাব?

এবার পর্ণা কাতর অনুরোধে প্রার্থনা করে কেঁদে ফেলে বলল, আমাদের তুমি

বাঁচাও সুচেতন। ফেলে যেও না।

—তাহলে আমার কথা শুনতে হবে।

—নিশ্চয় শুনব।

—কথা দিচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—কালই তোমার সঙ্গে তোমার বাসায় দেখা হচ্ছে এই রতনের।

—হ্যাঁ।

—বেশ। তাহলে যাওয়া যাক। বলে রতন গাড়ি চালিয়ে দিল ঝড়ো গতিতে। গাড়ি বর্শার মতো ছুটল কলকাতায়।

অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় সন্তানকে ফিরে পেলেন সাগরী। সুবৃত্ত যেন একেবারেই ধসে গেছে। একটা রাতেই পর্ণা বুঝি বা খোকাকে উন্মাদদশার গভীরতম খাদে নামিয়ে দিয়েছে। মণির দৃষ্টি পুরোপুরি উদ্ভ্রান্ত, ঠোঁট দুটি শুকনো খরখরে। হাত-পা এতই শিথিল যে মনে হয়, নিজের শরীর নামক পদার্থকে মণি সম্পূর্ণ ভুলে গেছে।

—তুমি খোকার কী করেছ স্বাগতাপর্ণা। বলেছিলে, আস্ত মানুষ ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু এ যে আধখানাও নয় নূপুর! কী কথা দিলে আর কী করলে মা! বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন সাগরী।

পর্ণা কথা বলতে পারছিল না। ভেতরে ভেতরে মৃদু কেঁপে চলেছে। বলবার মতো কোনও কথারই সে কিনারা করে উঠতে পারছিল না। এক কড়া অপরাধবোধ তাকে অব্যক্ত পীড়া দিয়ে চলেছে। তার প্রথমে মনে হল, এই অবস্থায় পুরোপুরি বোবা হয়ে যেতে পারলেই যেন ভাল ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, তার যা কাজ, তাতে এভাবে ভেঙে যদি নিজেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে মণির কী হবে। সংসারকেই বা সে মুখ দেখাবে কী করে! তার কেরিয়ারটাও প্রায় গোড়াতেই খতম হয়ে যাবে।

চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বিষণ্ণ গলায় পর্ণা বলল—মণি কিন্তু গত রাতে গান গেয়েছে মাসি, আমি ওকে গাওয়াতে পেরেছি মামাবাবু!

—কী গান? মামার দৃঢ় কিন্তু ঈষৎ চিন্তিত জিজ্ঞাসা।

—'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি'।

—ওহ্! বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মামা। তারপর সাগরীর দিকে চেয়ে বললেন, মণিকে তুই খাটে বসে ছুঁয়ে থাক সাগরী। খোকা ভীষণ ভয় পেয়েছে। ওর এখন তোকেই দরকার। তবে ঘাবড়াস না, রোগেরও ভাগ্যের মতো ওঠাপড়া আছে। পর্ণা কী করেছে, আগে আমাকে সেই সমস্ত ডিটেলে জানতে হবে। বলে গভীর স্নেহে আঙুলের সাহায্যে ভাগ্নের চোখের পাতা বুজিয়ে দিলেন। দেখা গেল, সহজেই সুবৃত্ত চোখ বুজে রইল এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল। মা ছেলের বুকে হাত

রাখলেন।

মহিম বললেন, আচ্ছা বেশ। আমরা তাহলে পাশের ঘরে যাচ্ছি। এসো স্বাগতা। তুই কিন্তু খানিক বাদে খোকার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবি সাগরী। এখনই নয়। তুমি এসো মামণি! বলে স্বাগতার দিকে দৃষ্টির ইশারা করলেন গাঙ্গুলি।

সোফা এবং চেয়ারে মুখোমুখি বসল ওরা। সোফায় পর্ণা, চেয়ারে মামা। ফলে পর্ণা খানিকটা নিচুতে রয়েছে।

মামা নিম্নস্বরে বললেন, বলো, কী করেছ তুমি?

মহিম সহজ গলাতে বললেও পর্ণার মনে হল, গলাটা চিকিৎসকের নয়, বিচারকের। পর্ণার ভেতরটা মৃদু ভয়ে ফের উত্তেজিত হল। সে একটা ঢোক গিলে সমস্ত বর্ণনা করে গেল।

মহিম গাঙ্গুলি সমস্ত শোনার পর কিয়ৎক্ষণ নির্বিকার রইলেন। হঠাৎ তারপর বলে উঠলেন—তুমি রবীন্দ্রনাথের গানটা পুরোপুরি গাইতে পার?

—তা পারি। কিন্তু ভাল হবে না।

—না হোক। তবু গাও।

গাইল পর্ণা।

—সুরটা ঠিক আছে? মামার প্রশ্ন।

পর্ণার জবাব—হ্যাঁ, মোটামুটি এই রকমই।

মামা বললেন—সুরটা কী? উদ্দীপনারই বোধহয়।

—এবং নিঃসঙ্গতারও মামাবাবু।

—তবে সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যে ভয় নেই, অন্ধকার পথ, তবু...

—ও চেষ্টা করছে ছোটমামা।

—তুমিও করছ।

—রতন সব মাটি করে দিল।

—রতন অনেককাল ধরে তোমাকে ফলো করে যাচ্ছে। লোকটা গুলি খাওয়া বাঘের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। থিয়েটারে গোড়ার দিকে হঠাৎ কিছুটা নাম করে ফেলে পরে আর এগোতে পারেনি। সার্থকতার স্বাদ পেয়েছিল একদিন এবং এখন নামটা তার একেবারেই মুছে যেতে বসেছে। এই ব্যাপারটা সে কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না।

—আমিও তাই মনে করি মামাবাবু।

—এই ব্যর্থতা ঠেলে উঠে দাঁড়াতে হলে তোমাকে ওর দরকার। সম্পর্ক ভেঙে ফেলে ওর যে জবর লোকসান হয়েছে, একথা মর্মে মর্মে বুঝেছে। তোমাকে রতন ছাড়বে না। আগেই বলেছি।

—আমি কী করব এখন মামা!

—মানুষের মন নিশ্চয় তুমি বোঝো। তোমাকেই সব বুঝে নিতে হবে। তোমার বিদ্যা এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে। আচ্ছা, তুমি থিয়েটার দেখো?

—মাঝে মাঝে দু-একটা।

—রতন নাট্যজগতে একটা অভিনব কিছু করে দেখাতে চায়। তোমার প্রস্তাবটা ও কিন্তু আক্ষরিক অর্থে নিয়েছে, ব্যঞ্জনায় নেয়নি। বিদেশি নাটকের ছায়া নয়, ও চাইছে জ্যান্ত কিছু, গনগনে ব্যাপার থাকবে তাতে। তোমরা স্বামী-স্ত্রী নও, অথচ নাটকে স্বামী-স্ত্রী হবে। এই জিনিসটার দর্শক মহলে আকর্ষণ আছে এই জন্যে যে, তোমরা একদিন স্বামী-স্ত্রী ছিলে। বোঝাতে পারছি?

—হ্যাঁ।

—নাটকটা জমবে নাটক বলে নয়, তোমাদের সম্পর্কের আপস নাটকের ডেডিকেশনকে উচ্চে তুলছে, তোমরা নাটকের জন্য বন্ধু হয়েছ, এটা মধ্যবিত্ত নাগরিক কলকাতাকে টানবে। এর মধ্যে অবৈধ গন্ধও থাকছে, ভাল বন্ধুত্বও থাকছে। ওরা চায়, থিয়েটার পাড়ার গরম আলোচনা। 'আহা' বলাটা চায় এবং 'কী কাণ্ড' বলাটাও চায়। জুটির সম্পর্ক ভাঙল কিন্তু থিয়েটার ভাঙল না। ওরা এক হতে পারছে না কেন, এই প্রশ্ন শ্রোতা-দর্শককে মজিয়ে তুলবে। বোঝাতে পারলাম?

—হ্যাঁ।

—এই একটা দিক।

—আজ্ঞে।

—অন্যদিকে সুবৃত্ত। ওর সাইকো-প্রবলেম অদ্ভুত। আমার বিচারে। সেটা কী রকম? ওর অবসেশনাল নিউরোসিস ঠিকই ; তবে তার অনেকখানিই তোমাকে ঘিরে। তোমাকে ওর মনটার ধাঁচা বুঝতে হবে। ও যে লোকের হাতে মার খেতে খেতে তোমাকেই ভালবেসে ফেলছিল, সেকথা সুবৃত্তও জানে না। এটা হয় ' যার জন্যে মার খেয়ে মরতে বসেছিলাম, তাকে ভালবেসে ফেলাটাই তো দস্তুর হয়ে পড়ে কারও কারও ক্ষেত্রে। এবং এক্ষেত্রে লাভ-হেট রিলেশন গড়ে রোগী, নিজের মধ্যে, বুঝতে পারে না।

—মামাবাবু! আমিও বুঝেছি হয়তো।

—তোমাকে যতবারই ত্যাগ করতে চায়, ততবারই বেশি করে গ্রহণ করে বসে। এবং যতবার ধরতে চায়, ততবারই ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে ঠেলে ঢুকে পড়েছে রতন এবং দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তুলেছে। রতন জানে, সুবৃত্তকে নষ্ট করা সংসারে সবচেয়ে সহজ কাজ। সুবৃত্তকে যত সে পাগল করে তুলবে, তত সে তোমাকে ঘায়েল করতে পারবে। ধর্ষকামের এটা একটা চোরা চেহারা।

—আমি কী করব!

—বলা মুশকিল। তোমাকেই ঠাউরে বার করতে হবে পথ। কিন্তু মনে রেখো, সুবৃত্তর নিউরোসিসের একটা অংশ অধিকার করে আছে গণহিংসার চোট। সে মানুষকে ভালবাসে যত, ঘৃণাও করে তত। এই চোটটা এসেছে চরম অবস্থায় তোমার চার টাকার শিকলে বেঁধে, এই শিকল তোমাকেই খুলতে হবে মামণি! সুবৃত্তকে তুমি বাঁচাও!

—আমি কি চাইছি না ছোট মামা!

—চাইছ, কিন্তু রতনকেও তুমি এড়াতে পারছ না!

—কী করে পারব! ওর সঙ্গে যে একদিন ঘরও করেছি মামা!

মামা হঠাৎ এবার মাথা নিচু করে চুপ করে গেলেন। এবং তাঁর থুতনিটা ঝুলে পড়ল। চোখে চাপা অশ্রু খেলে গেল। একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেললেন মহিম গঙ্গোপাধ্যায়।

একটুখানি মুখ তুলে চাপা অল্পফোটা গলায় স্বগতোক্তির মতো করে মামা বললেন, তোমাকে মণি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

যেন বা মামা বলতে চাইলেন, আমরাও তোমাকে বুঝতে পারছি না। ওই কথা ও কণ্ঠস্বরে সূক্ষ্ম সন্দিগ্ধতা ফুটে উঠেছে। পর্ণা মাথা নিচু করে রইল। তার বারংবার রতনের ছদ্মবেশী আচরণ এবং ধূর্ত সংলাপ মনে পড়ছিল।

—আমাকে বিশ্বাস করছে না ছোটমামা! মুখ নিচু রেখেই বলল পর্ণা। এবং বলবার চেষ্টা করে বলল, কিন্তু...বলে কথা খুঁজে পেল না।

—তুমি কখনও ওর সামনে ফ্যাকচ্যুয়াল মিসটেক করবে না। ওকে বলার মতো দরকারি ঘটনা নিখুঁত হবে। তোমাকে কখনও যেন সে মিথ্যুক না ভাবে। আজকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত একটা প্রায় মিথ্যুক জাত। চোরা মিথ্যা হরদম বলতে ভালবাসে। আগেও একদিন বোধহয় বলেছি তোমাকে।

—আপনি এভাবে, আবার বলছেন কেন মামা!

—আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, সাধারণ স্তরের মানুষ কম মিথ্যা বলে, বললে নিতান্ত প্রাণের দায়ে বলে। মিথ্যা বলে শিক্ষিত ক্লাশ। অনেক সময় বিনে কারণেই বলে। তার মধ্যে মেয়েরা বলে সবচেয়ে বেশি। মণির ডায়েরিতে দেখলাম, মন্তব্য, মেয়েরা বেশি মিথ্যা বলে কেন? খোকা লিখেছে, মেয়েদের মিথ্যে বলাটা তাদের কী বলে, রহস্য, তারা আর্টিস্টিক্যালি লায়ার।

—আর্টিস্টিক্যালি লায়ার কথাটা ওর?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু সমস্ত সত্য সুবৃত্তর নার্ভ সহ্য করবে না ডক্টর গাঙ্গুলি।

এবার ঈষৎ চমকে উঠে মহিম নিঃশব্দে সূক্ষ্ম হেসে বললেন, তুমি রেগে যাচ্ছ,

—রাগছি না, মামাবাবু, আপনি আমাকে ভুলই বুঝছেন।

—না পর্ণা। ভুল আমি কাউকে বুঝছি না। তোমাকে না, তাকেও না। আমি শুধু মণির অসুখের কারণ বার করতে চাইছি। ও ওর দিনলিপিতে একটি শুদ্ধ সমাজের কল্পনা করেছে। ও মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রমের কল্পিত Sane Society-র কথা লিখেছে এবং মন্তব্য করেছে, মিথ্যা বলা কমালে, মানুষ সেইন সোসাইটি গড়ে তুলতে পারবে। মানুষের 'সাউন্ড মাইন্ড' মিথ্যাকে সরিয়ে যুক্তিপূর্ণ সুস্থ জগৎ গড়ে তুলবে।

—মানুষ কিন্তু মিথ্যা বলবে ছোটমামা। মানুষ বাধ্য।

—বাধ্য কেন?

—না হলে সম্পর্ক বাঁচে না।

—তুমি নিজেই তাই মনে কর?

—কতকটা। কেন কি, হিপনোসিস করাটাই তো মিথ্যা, যেটা আমরা রোগীকে করি।

—রচনা আর মিথ্যা এক কথা নয় স্বাগতা। সম্মোহন মিথ্যা নয় এই জন্য যে তা মানুষের হারানো রিফ্লেক্স ফিরিয়ে দেয়। ঘণ্টা বাজিয়ে কুকুরকে খেতে ডাকলে কুকুরের লালা ঝরে, ঘণ্টাধ্বনি তাহলে মিথ্যা? না, মিথ্যা নয়। কিন্তু খাদ্য না ঘণ্টা বাজালে মিথ্যা। মণি লিখেছে, যে-আচরণ বা কথা মানুষের সৎ পরাবর্ত নষ্ট করে দেয় তাকেই 'মিথ্যা' বলে। প্রতারণা পূর্ণ যৌন-আচরণও এই ধরনের মিথ্যা। যে মেয়েটা কাজ বাগাবার জন্য, কেরিয়ারের জন্য কাউকে দেহ দেয়, মন না দিয়ে দেহ, এই দেহ ঠক, এ মিথ্যা, মণির কথা পর্ণা, আমার নয়।

—আমি এর কোনওটাই করিনি মামা!

—আহা, আমি তাই-ই কি বলছি। তুমিই ভুল বুঝছ কথাগুলো। আরও একটু ধৈর্য ধরে শোনই না তুমি। দু'জন আমরা একজন রোগীকে নিয়ে কথা বলছি যার মনটাকে বুঝে ওঠাই কঠিন। ওর লেখাপত্তর এবং ডায়েরি আমাদের কিছু সাহায্য করছে। তাই না? আমি তোমাকে ওর একটা পুরনো ডায়েরি দিচ্ছি, তুমি নিয়ে যাও। সব কথা মুখে বলা যাবে না। তবে শোনো, তোমাকে মণি কী ধরনের ভালবাসে তোমাকেই বুঝতে হবে। মনে হচ্ছে, আবার বলছি, ও তোমাকে ঘৃণাও করে। রাগ কোরো না। দাঁড়াও, খোকাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে। বলে মহিম গঙ্গোপাধ্যায় আচমকা পাশের ঘরে উঠে চলে গেলেন।

মামা উঠে যেতেই পর্ণার ভেতরটা ধূসর ব্যথায় ভরে গেল। সে মনে মনে বিড়বিড় করে বলে উঠল—আমাকে কেন তুমি ঘৃণা করছ সুবৃত্ত। আমি কি সত্যিই দায়ী? চার টাকার শেকলে বেঁধেছি তোমাকে, এ বাঁধন তো একা আমি দিইনি। রতন

আমার জীবনকে জটিল করেছে। আমার কষ্ট কেন তুমি বুঝতে পারছ না? ডায়মণ্ডহারবা হোটেলে উঠে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি বেরিয়ে চলে এসেছিলাম. রতনকে বলেছিলাম, তোমার সঙ্গে এ কাজ এখানে আমি করব না। পারব না। রেগে গেল। সারাটা পথ ফুঁসতে ফুঁসতে এল। তারপর ঘটল সেই ঘটনা। যৌনক্রোধে মানুষ পশুর চেয়ে অধম সুবৃত্ত। কিন্তু ধরো, আমি রতনের সঙ্গে হোটেলে ছিলাম, তাতেই বা কী অপরাধ? রহিতের সঙ্গে থেকেছি, সেটাও তো...আচ্ছা তুমি যখন জানবে রহিতের সঙ্গে...তখন কি আরও ঘৃণা করবে? তুমি যে বলেছ, মনের শুদ্ধতাই আসল। এখন আমি কী করব বলে দাও।

তিন-চার মিনিটের মধ্যে মামা ফিরে এসে পর্ণাকে বললেন, যাক, সাগরীই খোকাকে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে, এমনিতেই ও গাড়িতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, ঘুম এসে যাবে। ঘুম থেকে ওঠার পর যত ঘটনা আগে ঘটেছে, তার কিছু মনে পড়বে, কিছু হয়তো ভুলে যাবে। এমন হতে পারে, সমস্ত ভুলে গিয়ে একটি মাত্র ঘটনায় মনটা ওর আটকে রইল। ক্ষণে ক্ষণে ভাঙা স্মৃতির আক্রমণ চলে ; মনটা ওর কিছুতেই শান্ত হতে পারে না। বলে মামা মাথা নাড়তে থাকেন। এবং তাঁর চোখে গভীর দুশ্চিন্তা ফুটে ওঠে।

মামার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে মনে পর্ণা অপরাধী হয়ে পড়ে। কোনও কথাই সে আর বলতে পারে না। চুপচাপ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বারান্দায় আসে। সুবৃত্তর ঘরের দিকে দু'ধাপ এগিয়ে থেমে পড়ে। ভেতরে ঢোকার সাহস পায় না। বাড়ির বাইরে চলে আসে। রিকশা ধরে। মামা তাকে সুবৃত্তর ডায়েরিখানা দিতে ভুলে গেলেন নাকি ইচ্ছে করেই দিলেন না বোঝা গেল না। এবং পর্ণাও চাইতে পারল না।

মামা যে দ্বিধাগ্রস্ত সন্দেহ নেই। ক্ষণে ক্ষণে তাঁর দুশ্চিন্তা বাড়ছিল, অভিব্যক্তি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল।

'ফ্যাকচুয়াল মিসটেক', 'মিথ্যা বলা', 'সেইন সোসাইটি' ইত্যাদি কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে পর্ণার। মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় মামা কি তাকেই আক্রমণ করছিলেন? মামার কথা সাগরীর মতো সাধারণ এবং সোজা ছিল না, অবশ্য থাকার কথাও নয়। আচ্ছা, পর্ণা কি কোনও হীনম্মন্যতায় ভুগছে? স্বাগতা নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে। আমি কি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ছি। বলে আপন মনে ভয় এবং বিস্ময় প্রকাশ করে।

বাড়ি ফিরে নিজেকে কেমন অবসন্ন লাগে স্বাগতার। 'আবার আমি রতনের সঙ্গে জড়াচ্ছি কেন?' নিজেকে জিজ্ঞাসা করে পর্ণা। এবং নিজেকেই জবাব দেয়—সুবৃত্তর জন্যই ওকে আমার দরকার। মণিকে আমি নাট্য-অভিভাবনে ফেলে সুস্থ করব।

নাটকটা রতন নয়, আমারই গল্পে, আমার আকাঙক্ষায় গড়ে উঠবে। এমনভাবে হবে, যাতে করে নাটকেরই মধ্যে ড্রামাটিক্যালি একটা পম্পাস সিচুয়েশন গড়ে উঠবে, মণির জন্য সেটা হবে থিয়েট্রিক্যাল হিপনোসিস, ও বুঝবে আমি কখনও রতনকে ভালবেসে উঠতে পারিনি। না, মণি। কখনওই নয়। ওকে আমি কখনও শরীরের মধ্যে নিয়েও সুখ পাইনি। তোমারই জন্য ও আমাকে পীড়ন করেছে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে নিজেরই ভেতরটা কেমন ভিজে নরম হয়ে আসে। কে যেন চোখের জল দিয়ে গভীর কোনও উৎসবের মধ্যে পর্ণার আত্মাকে ধুইয়ে দিচ্ছে। সুবৃত্তর সুন্দর অতল চোখ দু'টি পর্ণাকে দুর্বার টানে উথালপাতাল করে দিচ্ছে। বলছে, এখানে তোমার আশ্রয় আছে স্বাগতাপর্ণা। এসো, এসো—চলে এসো।

ভাবনার আদর খেতে খেতে কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছিল মনটা ; 'তোমার দুটি চোখ মনে করে এত আরাম সুবৃত্ত!' বিড়বিড় করে নিজেকেই শোনায় পর্ণা। নিজেরই ভাবনার মধ্যে কখন বিকেল হয়ে এল। রিসর্টে থাকার সময় ভোরে চান করে নিয়েছিল, গরম বলে সুবৃত্তদের ওখান থেকে চারটে নাগাদ ফিরে আবার চান করেছে পর্ণা। এখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। মিনতি কী খেতে দেবে প্রশ্ন করে জবাব পায়নি।

অখিলের মায়ের চোখেমুখে চরম সন্দেহ, রাতটা কোথায় ছিল পর্ণা? একটা ফোন পর্যন্ত করেনি। ফিরে এসে ভাল করে খেলও না, মনটা কোথায় যেন ফেলে রেখেছে। ঘোরের মধ্যে পড়েছে, এ কিছুতেই ভাল নয়—রহিতের বেলায় এই রকমই করত। এই মেয়ে মাতবে যখন, তখন আর দেখতে হবে না!

—কী গো, একাই ছিলে, না পাগলটাও সঙ্গে ছিল?

—রতন সব জানে অখিলের মা, তোমাকে আর খবর জোগাড় করতে হবে না। চা দাও।

—ও, তাহলে আমারে আর বিশ্বেস কর না!

—কথা ব'লো না। চা নিয়ে এসো।

—জীবনে একটা শুধপুছের মানুষ লাগে ছোটমা। জীবনে যদি শুধাবার না থাকল, তাহলে জীবনই বা কিসের! সংসার করলে টের পাবে, স্বামী যদি পাগলও হয়, হিসেব-হদিস চাইবে।

—দেব।

—রাতে কার সঙ্গে ছিলে বলতে পারবে?

—মুখ সামলে কথা বলো মিনতি। যা বলছি করো।

—আমাকে ধমকাচ্ছ, কিন্তু লোকে সবই দেখছে।

—লোক? মানে রতন? বললামই তো ও সব জানে।

—না, লোক আরও আছে।

—কে?

—কুদ্দুস।

নামটা শুনেই পর্ণা বাস্তবিক চমকে উঠে জানলার কাছে ছুটে গেল। অবাক হল, কুদ্দুস এদিকে চেয়েই দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে সরে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এল।

সন্ধ্যা সাতটায় রতন এসে উপস্থিত হল। ভেজা বেড়ালের মতোই ঢুকে এসেছে। টুপিপরা মাথাটা মৃদুমৃদু কাঁপছে। সোফায় বসে স্বাভাবিক গলায় বলল, নাটকের একটা দৃশ্য লিখেছি নূপুর, ভাবলাম তোমাকে শুনিয়ে আসি।

—আগে সম্পূর্ণ কর, তারপর শুনব। কিন্তু তোমার তো কাল আসার কথা।

—আজই এসে পড়লাম। তুমি কাহিনী দেবে, কথা হয়েছে। তাই শুরুটা কেমন হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। না চাইলে এখনই চলে যাচ্ছি।

—সুবৃত্ত ভাল আছে।

—আচ্ছা, আমি কি জানতে চাইলাম? কই না, শুধাইনি তো, তুমি বললে কেন? বলে অদ্ভুত নাটুকে ভঙ্গিতে বাতাসে কান পাতলে রতন, কানের পিছনে হাত রেখে।

—জানতে চাইবে ভেবেছি, যাক গে, যা লিখেছ, রেখে যাও, পরে আমি দেখব। বলল পর্ণা।

—দেখো, নূপুর, ওই রোগী সারবার নয়, কিছু মনে ক'রো না, ও তোমার প্রেমে পড়ে তোমাকেই খুন করার কথা ভাবছে।

—আর তুমি কী ভাবছ?

—থিয়েটার ছাড়া কিছুই ভাবছি না।

—তাহলে নিমুর গাড়ি নিয়ে আমাদের 'ফলো' করলে কেন? থিয়েটারের কোন কাজে লাগবে তোমার ছদ্মবেশ? তোমার কাছে আমি এই বন্ধুত্ব চাইনি রতন।

—আমার ভুল হয়েছে। আমি তোমাকে ভুলতে পারছি না খুকু। আমার দুর্বলতা তুমি ক্ষমা কর।

—তুমি মনে রেখো, তুমি সত্যিই আর কারও স্বামী নও। তোমাকে আমি ডরাই না রতন।

—জানি।

—আমি তোমার স্ত্রী নই।

—তা-ও জানি স্বাগতাপর্ণা।

—তুমি মনে কর, এখনও আমি তোমায় ভালবাসি। মনে কর না?

—কী করে বলি!

—তুমি পাগলামি করছ রতন।

ঘাড় বাঁকিয়ে মুখ নিচু করে নাটুকে ভঙ্গিতেই বসে রইল রতন। তারপর সহসা মেঝেয় দাঁড়ানো পর্ণার পায়ের তলায় পড়ে গেল। পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পাগলের মতো বলল—আমিও অসুস্থ নূপুর। আমাকে ঘৃণা করে ফেলে দিও না।

—আমি বেকায়দায় পড়লেই তুমি ফণা তুলবে। রাস্তায় সেই পরিচয় পেয়েছি।

—ওটা আমার ছদ্মবেশ পর্ণা। কেন যে অমন করে ছুটে গেলাম।

—তুমি বন্ধু নও। ওই জিনিসটা তোমার স্বভাবে নেই। প্রত্যেকেই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী। একটা নিউরোটিক পেশেন্টকে তুমি নোংরাভাবে ছোবলাও। ছিঃ! আমি সুবৃত্তর সঙ্গে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছি? না, রতন। নাহ্!

—আমার ভুল হয়েছে, মাফ কর স্বাগতা। বলে পর্ণার পা আঁকড়ে ধরে রতন। তারপর বলে, বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমিও সুবৃত্তর ভক্ত খুকু। ওর সমস্ত পড়েছি। অনেক কবিতা মুখস্থ স্বাগতাপর্ণা! তোমাকে শোনাচ্ছি আমি। বলে পর্ণার পা ছেড়ে মেঝেয় এলিয়ে বসে পড়ল।

এবং বিস্ময়করভাবে সুবৃত্তর কবিতা আবৃত্তি করে গেল সুচেতন।

বাতাসে করাঘাত করে পাগল ;
আঙুল দিয়ে কাটে,
চাবির মতো ঘোরায় বায়ুপথ—
ভাবে দুয়ার খুলে যাবে ; আঙুলে সমস্ত হয় আঁকা, একে একে,
সমস্ত তিমির-সৌধ, সিঁড়ি, লিফ্‌টের শব্দ থেকে থেকে—
তারপর দরজায় ছিদ্র, তালা, ভিতরে তুমুল বেল বাজে,
কান পাতে বাতাসে উন্মাদ, আঙুল ঘোরায় কারুকাজে ;
হাত দিয়ে কোপায় হাওয়া, পর্দা সরায়, আলো ছায়া—
বাতাসে পাগল হাসে একা, বেকুফ, বেহায়া!
এই তার ঘর, এই তার সদর-অন্দর বায়ুময়
আঙুলেই ভাঙে গড়ে, সমস্ত আঙুলেই হয়।

বাতাসে আঘাত করে পাগল, তারপর বুকে ও পাথরে ;
আঙুলেই কাটে হাওয়া, ভাবে, খুলেছে কপাট চরাচরে—
কিন্তু আঙুল কামড়ায়, বৃদ্ধ, তর্জনী, অনামিকা
বাতাসেই আছে লিখা, দুয়ার খুলবে না।

মেঝেয় লেটিয়ে বসে ভরাট গলায় খর বেদনায় এ কোন পাগল আর্তনাদ করে চলেছে, বুক ভেঙে যাচ্ছে তার বিপন্ন অবরোধে, যেন বাতাসেই বন্দি কোনও

নিরাকার হৃদয়, শূন্যে আছড়ে পড়ছে বাসনার অদৃশ্য অশ্রুকণা, এত হাহাকার মানুষের কণ্ঠে বেগ ধরে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে যায় বাতাসে, শূন্য সৌধ-স্বপ্ন আঙুলের আঁচড়ে গড়ে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে, বাতাসে আঘাত যে বুকের পাষাণে আঘাত হয়ে ফিরছে, কিছুতেই খুলছে না দ্বার, কিছুতেই না। বাতাসে এমন করে মাথা ঠুকতে কাকেই বা দেখেছে স্বাগতাপর্ণা!

পর্ণার বুকের ভিতরে আশ্চর্য মায়া ছলছল করে উঠল। তার কেমন কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। এই মুহূর্তে মন তার রতনকে ক্ষমা করে দিচ্ছিল, সেই মনই অদ্ভুত নিশ্চয় যে কবিতার অভিভাবনে ভেসে যায়, তলিয়ে যায়, ডুবে যায় এবং বুঝতে পারে না, রতনকে ক্ষমা করার জন্য এত আবেগ কোথা থেকে এল! এই মানুষটাই এমন ঐশ্বর্যবান কণ্ঠের সহায়ে তাকে আবৃত্তি শিখিয়ে শিল্পী করেছে। এরই সঙ্গে একদা দিনরাতগুলি কেটে গেছে প্রমত্ত বেগে। যেন বা কবিতারই মদে বিচূর্ণ হয়েছে তারা, গলে গেছে, যেভাবে বরফ গলে নেশায় মিশে যায়। তারপর সব কেমন স্তব্ধ শৈত্যে থেমে গেল, কবিতা বাক্য, সংলাপ এবং জীবনের সমস্ত ম্যাজিক, মনে হল, প্রেম একটা কালো জাদু, শরীরে ভর করে একসময় ছেড়ে পালিয়েছে।

পায়ের কাছে পড়ে আছে রতন। কণ্ঠ থেমে গেছে। কিন্তু বাতাসে করাঘাত, বাতাসে তালা খোলার চেষ্টা, বাতাসে আঙুলের কারুকাজ থামেনি, যেন সে মুকাভিনয়ে নির্দয় বায়ুপথ কুপিয়ে চলেছে। এই মানুষটা সত্যিই কত খারাপ হতে পারে! কতই বা মন্দ করবে তার! সুবৃত্তকে মানুষটা কি পছন্দও করে?

—সুচেতন। স্বপ্নস্ফুট প্রগাঢ় মায়ায় চলকে গেল পর্ণার গলা। এই অপ্রত্যাশিত লুকনো আবেগকে নিজেই সে ভয় পেল।

মূকাভিনেতা উন্মত্ত রতন হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে এবং দু'হাতে মুখ ঢেকে বলল, আমাকে চেতনা দাও খুকু! আমি আর পারছি না। কত অধঃপাতে চলে গেছি আমি। বলে অশ্রুপীড়ায় থরথর করে গলা কাঁপিয়ে তুলল, একটা নির্দোষ পাগলই যেন কাঁদছে।

কান্না শুনে এ ঘরে ছুটে এল মিনতি। অবাক হয়ে বলল, এইভাবে কাঁদছ তুমি চৌধুরী।

মিনতির প্রশ্নে থমথম হয়ে গেল রতনের কান্নার চাপা ব্যথা। সে মুখ দু'হাতে চেপে কান্না থামানোর চেষ্টা করল। মিনতি বলল, ভিখিরির মতো ক'রো না এখানে। অনেকদিন পাড়ায় ঘোরাঘুরি করেছেন, লোকে তোমারে চেনে। এইরকম করলে ছোট মায়েরও ভাল লাগবে না। শোন, পাঁচশো টাকার নোটটা তোমারে ফেরত দিচ্ছি, নাও ধরো। ধরো, ধরো, হাত বাড়াও।

মুহূর্তে চোখের সমস্ত জল শুকিয়ে গেল রতনের।

—এই-ই তোর সদিচ্ছা মিনতি! বেশ দে, থিয়েটারে কাজে লাগবে। তবে এভাবে নূপুরের সামনেই ফিরিয়ে দিলি!

—কেন দেব না! ছোটমা নিজে হাতে দিলে ভাল হত?

—ভিখিরির আবার দেওয়া-থোওয়া, কিছু মনে করিস না মিনতি। মাথার ঠিক ছিল না।

—মাথাটা তাহলে আগে ঠিক করো। যা তা ক'রো না। এভাবে হয় না চৌধুরী, কাউরে তুমি কাঁচা খুকি পাও নাই। এক কাপ চা খাবে? এখন তো তুমি কোথাকার মেসে থাক, নাওয়া খাওয়া ঠিক মতন হয়? দুপুরে কী খেয়েছ? বিকেলের টিফিন?

—আর অখিলের মা! বলে টাকার নোটটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে রতন।

—চা খাবে না? ফের প্রশ্ন করে মিনতি।

পর্ণা এবার কথা বলে ওঠে—চায়ের সঙ্গে কিছু খেতেও দিও মিনতি। যাও নিয়ে এসো। শোন রতন, তুমি সোফায় উঠে বসো। এই কবিতাটা তুমি আমাকে একটু শিখিয়ে দেবে?

—তুমি শিখবে আমার কাছে! বলে মাথাটা কাঁপাতে কাঁপাতে ভয়ানক চাপা খুশিতি আহ্লাদিত রতন সোফায় উঠে বসল। কেমন একটা সলজ্জ আনন্দে নিজের আঙুল মটকাতে থাকল। পর্ণার মনে হল, এই সব মুদ্রা নিশ্চয় মানুষের কোনও অভিনয় নয়।

প্লেটের খাবার সাবাড় করে চায়ে চুমুক দিয়ে রতন হঠাৎ একটা বেফাঁস-কথা স্বাভাবিক গলায় বলে উঠল—আমার সেক্স খুব বেশি, তুমি জানতে খুকু! ইদানীং সেটা দমেছে, ভগবানকে রোজই বলি, ওটা কমিয়ে আর একটু প্রতিভা দাও ঠাকুর, যেন উঠে দাঁড়াতে পারি। তুমি আমাকে খারাপ ভাবছ না তো।

কিছু আগে কোণের চেয়ারে বসে পড়েছিল পর্ণা। রতনের কথা শুনতে শুনতে গায়ের কাপড় যুৎ করে টেনে দেয় এবং তার নিভৃত মনে প্রাক্তন স্বামীর বাসনা ধাক্কা দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে। সে তখন জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি চালিয়ে একটু বেদনাও অনুভব করে। স্বাগতা রতনের কথার মধ্যে বিচ্ছেদের দহন দেখতে পায়।

—রাগ করলে! বলে চায়ের কাপ ঠোঁটের কাছে এনে থেমে পড়ে রতন।

পর্ণা শুধু ছোট্ট একটা 'না' উচ্চারণ করে বাইরেই চেয়ে থাকে। এবং হঠাৎ একসময় বলে ওঠে—নিউট্রাল এবং ডার্ক জোন-এ নাটকটা শুরু হবে রতন। প্রথমে একটা পর্দায় ট্রেনের কামরা সরে যাওয়া দৃশ্য বা মঞ্চেই ট্রেন চলেছে, আলো এবং আওয়াজের মাধ্যমে, বোঝাতে হবে, হঠাৎ আলো চলে যাবে, তখন অন্ধকারে আমি চেঁচাব, কোথায় তুমি সুচেতন, আমাকে বাঁচাও। সমবেত গলায় গোলমাল এবং আমার গলার প্রকট আর্তি, দৈহিক নিগ্রহের, শালীনতাহানির গোঙানি, এমনভাবে

হবে যে, সেই তীব্রতাই নাটককে একটা শক্ত দাঁড়ায় দাঁড় করিয়ে দেবে।

—হ্যাঁ।

—তুমি কী লিখেছ?

—ঠিক তাই, যা বললে।

—কই দেখি। না, থাক। পরে দেখব। সুবৃত্ত সাংবাদিক। গলায় ঝোলানো ক্যামেরা। মঞ্চে সার বেঁধে শোয়ানো কালো কাপড় মোড়ানো লাশ, সে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যাবে এবং পাগলের মতো ছবি তুলবে, ও দর্শকদের বীভৎস অনেক ছবি দেখিয়ে বলবে, সবই আমার তোলা। অনেক আছে। পর্দায় দেখানো হবে ছবিগুলোর সক্রিয়তা, ছায়ার বীভৎসতা, চপার মারার দৃশ্য এবং ধর্ষণের চিৎকার এবং সামনে দিয়ে জ্যান্ত লাঞ্ছিতাকেও টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। এক কোণে একটা লোক ম্যাজিক দেখাবে, সে একটা জ্যান্ত পশু গিলে খাচ্ছে, তার মাথার উপর একটা রক্তাক্ত বিপজ্জনক খড়্গ ঝুলে থাকবে। জনান্তিকে ভোটের মহড়া শোনা যাবে। কী হবে জানি না। সুবৃত্ত বলবে, আমার হচ্ছে রিপোর্টার্স নিউরোসিস। আমি পাগল হয়ে গেছি।

—তারপর?

—এই দৃশ্য থেকে আবার ট্রেন চলার শব্দ এবং আমার চিৎকারে ফিরে আসা।

—সব বোঝা গেল না। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ভেবে দেখি।

—কীভাবে হবে তাহলে!

—রিপোর্টার্স নিউরোসিস কথাটা কি ঠিক?

—আলবাত ঠিক। কিন্তু সুবৃত্ত বলবে, এত নিষ্ঠুর ছবি তুলেও পাগল হইনি, তবে শিগগির হব, দেরি নেই।

—কখন বলবে?

—তুমিই ঠিক করো।

—ওকে লোকেরা মারবে।

—হ্যাঁ।

—আমরা দু'জন চেয়ে চেয়ে দেখব। তুমি আমার ডানা ধরে টেনে রাখবে। সুবৃত্তর চোখ আমাকেই খুঁজবে খালি। তোমার সঙ্গে আমার পরে বোঝাপড়া হবে রতন। কেন তুমি আমাকে আটকে রাখলে! সেই সব দৃশ্য আমিই তোমাকে বলে দেব। দেখাতে হবে, আমি কখনও প্রতিক্রিয়াহীন ছিলাম না। আমি চেষ্টা করেছি, ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। ওই সব দৃশ্য খুব যত্ন করে সাজাতে হবে। ড্রামা থেরাপির জন্য এই সব দরকার সুচেতন।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—সুবৃত্ত কবিও। আমার প্রিয় কবি।

—হ্যাঁ।

হঠাৎ এবার চুপ করে গেল স্বাগতা। এবং হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

চায়ের কাপ রেখে রতন পর্ণার কাছে উঠে এসে পিঠে আলতো করে হাত রেখে বলল, তোমার মনের ওপর অনেক জুলুম করেছি নূপুর। সুবৃত্তর জন্য তোমার কষ্ট আমার চোখ এতদিনে খুলে দিয়েছে। নাটক আমার ধ্যান, কিন্তু সেটা তোমার চিকিৎসার উপায়। বেশ তো, তাই-ই হবে। থিয়েটার যাই-ই হোক, সুবৃত্ত যেন সুস্থ হয়ে ওঠে। ভাবতে পারছি না, আমি কত নির্লজ্জ!

—মানে! বলে আঁতকে উঠল পর্ণা। মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে ফেলল।

রতন পর্ণার পিঠ থেকে হাত তুলে নিয়ে সরে চলে গেল সোফার দিকে। সোফায় বসে মাথা নিচু করে রইল। সে ভাবছিল, সুবৃত্তর প্রতি পর্ণার অনুরাগের তন্ত্রী কী টানটান, বাঁকা আঘাতে বেশি ঝংকৃত হয়ে ওঠে, নিজেকে পাগল-বেহায়া ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না রতনের।

'মানে' শব্দটি উচ্চারণ করে আঁতকে ওঠার পর সোফায় বসা রতনকে দেখে একজন চরম ব্যর্থ মানুষকে প্রত্যক্ষ করে পর্ণা। মায়াই হয়। লোকটার কামনার তীব্রতার ভাষা হঠাৎ কানে গুঞ্জন করতে থাকে কেন স্বাগতা বুঝতে পারে না। সে কি তাহলে বহুদিন পর প্রাক্তন স্বামীকে কামনা করছে! কথাটা মনে ভেসে ওঠামাত্র পর্ণা শরীরময় সংকোচে এবং নিজের প্রবৃত্তির চেহারা মনে করে মনময় গ্লানিতে একটা চরম অসোয়াস্তি অনুভব করে।

—তুমি কি চলে যাবে এখন। (রতনকে আসলে যেতেই বলছিল পর্ণা)।

—না। আর একটু থাকব।

—খেয়ে যেও তাহলে। (রতনকে আসলে থাকতেই বলছিল পর্ণা)।

—মিনতিকে তাড়াতাড়ি করতে বলো।

—হ্যাঁ, বলি।

মিনতি কিন্তু রান্না শেষ করতে রাত করে ফেলে। খাওয়া শেষ হলে বেশ চিন্তাগ্রস্ত রতন বলে, দশটার পর অনেক দিন বাস থাকে না। ব্রেক করে যাওয়া, তা-ও অটো পেলে তবে।

মিনতি বলে বসে—তাহলে থেকেই যাও চৌধুরী।

পর্ণা বিমূঢ় হয়ে চুপ করে যায়, প্রাক্তন স্বামীকে তাড়াতে পারে না। অগত্যা পাশের ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। রতন শুয়ে পড়ে, কিন্তু ঘুমোতে পারে না। রাত তিনটে নাগাদ উঠে বসে। আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখে। ঘড়ি দেখে বসেই থাকে। হঠাৎ মনে হয়, এখনই বেরিয়ে পড়া ভাল। ব্যাগটা যে পর্ণার ঘরে থেকে গেছে।

তাহলে তো জাগাতে হয়, ব্যাগে নাটকের পাণ্ডুলিপি আছে।

পাশের ঘরে এসে রতন চাপা গলায় ডাকে, খুকু! নূপুর!

বেশ কতকবার একই স্বরগ্রামে পর্ণাকে ডেকে চলল রতন। পর্ণার শরীর একসময় নাড়া খেয়ে জাগল। নীল আলোয় চোখ খুলে গেল। রতন এভাবে ডাকছে কেন? কী হয়েছে লোকটার? এত ডাকাডাকির কী আছে? থেকে গেলে যখন, চুপচাপ থাকলেই তো পারতে।

শরীরের রাত-পোশাক অনেকটাই বেসামাল ছিল স্বাগতাপর্ণার। বুকের ফিতে ভাল করে আটকায়নি সে। দরজার উপরের ছিটকিনি হাত বাড়িয়ে খোলার সময় তার দেহের অনেকাংশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। একটা বুক ঠেলে বেরিয়ে আধখানা প্রকাশ্য হয়ে গেল, সেদিকে নজর দেওয়ার আগেই রতন ঘরে ঢুকে এসেছে। রতনের চোখ ক্ষুধার্ত জীবের মতো আটকে গেল।

শরীরের কাপড় সামলাবার আগেই পর্ণা দেখল, রতনের মুখ তার বুকে আচমকা চেপে ধরা। প্রবল আবেগে প্রাক্তন স্বামীর বাহু-আলিঙ্গনে সে বাঁধা পড়ে গিয়েছে। তার গলা থেকে ত্রস্ত কাতর স্বর আঠা হয়ে ফুটল—না রতন, অমন কোরো না, ছাড়ো আমাকে। না ছাড়লে, আমি চেঁচাব!

প্রাক্তন স্ত্রীকে জিহ্বায় মাখিয়ে নিয়ে রতন বলল, চেঁচাবে মানে! কুদ্দুস শুনতে পেয়ে যাবে বউ। বলে পর্ণাকে শরীর দিয়ে ঠেলে খাটে চিত করে ফেলে দিল এবং সমস্ত আকাঙক্ষা দিয়ে চেপে ধরল।

—অন্যায় করছ সুচেতন।

—নাহ্!

—ছেড়ে দাও, প্লিজ।

—আমি ঘুমাতে পারছিলাম না। খুব কষ্ট খুকু!

—এমন করবে জানলে কিছুতেই রাখতাম না তোমাকে। আহ্, আস্তে। নাহ্, ছেড়ে দাও, মিনতি জেনে গেল, তুমি পশুর মতো কোরো না।

—মিনতি জানে। চুপ।

—এ কী করছি আমি! কেন তোমাকে রাখলাম!

—তুমি কথা দিয়েছিলে।

—কবে, কোথায়, কী কথা দিয়েছিলাম?

—রাস্তায়। বলেছিলে, সব শুনবে। বলনি? বলতে বলতে নাইটি খুলে ফেলতে থাকে রতন। প্রাক্তনীর পুরনো দেহ নবীন উচ্ছ্বাসে ফেনিয়ে উঠছে সুচেতনের চোখের সামনে। একসময় পর্ণা প্রাক্তনের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে ওঠে।

রাত সাড়ে চারটেয় বাড়ির বাইরের আলো জ্বেলে দিল মিনতি। রতন বেরিয়ে

পড়ল পথে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল বাতাস, রাস্তার আলো এবং পথে, আকাশে দুর্বোধ্য আঁধারের মতো মেঘ কী অবস্থায় ছিল চোখে পড়ে না।

খাটে আলুথালু হয়ে ছড়িয়ে বেঁকে পড়ে রইল পর্ণা। ওর দু'চোখ বেয়ে নিঃশব্দে জলের স্বেদ নামছিল। হঠাৎ বুকের মধ্যে লাভাস্রোতের মতো ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ল। সে এক আশ্চর্য আশ্লেষিত ঘৃণা, শরীরে মদ আর গ্লানি সমান মাত্রায় যেন মাখামাখি হয়ে গেছে।

সকালে মিনতির সামনেও লজ্জা করছিল স্বাগতার। কলেজে কাল থেকে গ্রীষ্মের ছুটি পড়ে যাচ্ছে। আজ একবার যেতেই হবে। শরীরের অভ্যন্তরে একটা অদ্ভুত নতুন কষ্ট টিউমারের মতো জমে উঠল।

মিনতি বলল, কলেজে গিয়ে বেশিক্ষণ থেকোনি।

—কেন?

—আজ আর নিজেকে সামলাতে পারবে না।

মিনতির কথায় সচকিত ভ্রূবঙ্কিমা ছিল, যা কপালে ফোটে না এবং যা চাপা হাসিকেও আড়াল করে রাখে। এবং সেই অদৃশ্য বক্র হাসি সৎ পরামর্শে মানুষকে ভোলায়।

কলেজে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল পর্ণা। দরজার মুখে এসে সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে মিনতির দু'টি হাত সকাতরে জড়িয়ে ধরল এবং কাঁপা গলায় বলে উঠল—অখিলের মা! কাউকে ব'লো না, আমার এমন সর্বনাশ হয়েছে। বিশ্বাস কর মিনতি, আমি কী করলাম, এখনও বুঝতে পারছি না।

—ভেবো না অত। কী করবে, পুরুষের জোর।

—তাহলে কি আমার কোনও জোরই থাকতে নেই, আমি কেমন মেয়ে? বলে মিনতির হাত ছেড়ে বাইরের দিকে ঘুরে দাঁড়ায় স্বাগতাপর্ণা। এবং বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা সাইকেল রিকশায় প্রায় ছুটে গিয়ে উঠে পড়ে।

—তাড়াতাড়ি ফিরবে। বাইরে থেকোনি। আবার সতর্ক করে পর্ণাকে মিনতি। পর্ণা কোনওই কথা বলে না। আকাশে চোখ তুলে তাকায়। ঝড়ো হাওয়ায় মেঘ ছুটে চলেছে।

এক ঘণ্টাও কলেজে থাকে না পর্ণা। ট্রেনের জানলার পাশে বসে দুপুরের পর একটি অদ্ভুত নিঃসঙ্গ কামরায় একা ফিরতে থাকে। কামরায় একটিও লোক নেই। সোনারপুর স্টেশনের নিউট্রাল জোন-এ আলো নিবলে বুঝতে পারে, যাত্রী ঠেসে ভরে উঠেছে।

কখন দেহের ভিতর থেকে বিবমিষার মতো ধাক্কা খেয়ে অসচেতন চিৎকার বার হয়ে আসে, একটি কাকুতি অন্ধকারে মাথা কুটে পর্ণার গলা চিরে দেয়—আমাকে

বাঁচাও সুচেতন।

—কী হল। কে চেঁচাল অমন করে। আরে হলটা কী! কথা বলুন। শালারা ইমার্জেন্সি লাইটটাও দেয় না। কার যে কী হয়ে যায়। কথা বলুন। এই একক গলাকে ঘিরে হইচই, চেঁচামেচির মচ্ছব লেগে পড়ে অন্ধকার কামরায়। পরে আলো এলে কার চিৎকার কেউ বুঝতে পারে না।

এই রকম চিৎকার গোপন করাই কি জীবন সুবৃত্ত, আমিও কি তোমারই মতো পাগল হয়ে গেলাম? ভাবতে ভাবতে আশ্চর্য বোবা হয়ে যাচ্ছিল পর্ণা।

যাদবপুর স্টেশনে নেমেই গেটের মুখটায়, যেখানে তার ডানা ধরে টেনে রাখা হয়েছিল, ঠিক সেখানে এসে পর্ণা বিনুনিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে।

—তুই?

—তোর জন্যে। মিনতি বলল তাড়াতাড়ি ফেরার কথা। ভাবলাম, তাহলে স্টেশনেই ধরব তোকে।

—কেন এসেছিস?

—আসতে পারি না?

—না।

—বাঃ, রেগে আছিস মনে হচ্ছে! দোষ তো আমি করিনি।

—কিসের দোষ?

—গাড়ি কিন্তু নিমু একার সিদ্ধান্তে দিয়েছে, অফিসে ছিল নিমু, রতন চাইলে। বোকার মতো ছেড়ে দিল গাড়ি। এখন শুনছি...

—কী?

—রতনের কিন্তু ডিভোর্সের পর থেকেই মাথার গোলমাল। কেন গাড়ি চাইছে নিমুকে গুছিয়ে বলেনি। বলেছে একটা ছেলেকে নিয়ে পর্ণা ফুর্তি করতে যাচ্ছে, আমি ধরব।

—থাক বিনুনি, আমি আর শুনব না।

ছোটখাটো ভীষণ সুশ্রী বিনুনি এবং চটপটে বিনুনি কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে রইল। তারপর পর্ণার একটা হাত গাঢ় আবেগে এক হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলল, আজ দুপুরে আমিই রতন চৌধুরীকে ফোনে কানেক্ট করলাম। কেন যেন মনে হল, তোকে বিপদে ফেলে দিল না তো! শুনলাম, কবি সুবৃত্ত তোর সঙ্গে ছিল।

—আমি ওর বাচিক চিকিৎসা করছি।

—বুঝেছি। কথা দিয়ে শুশ্রূষা একটা মেথড। তাই না? ভালই তো। আর ওষুধ?

—ওর মামা দেন।

—ডাক্তার বুঝি!

—হ্যাঁ।

—শেষে সুবৃত্ত তোকেই ঘিরে ধরল পর্ণা। ওর জন্যে তোর কী আকুলতা, আমি তো জানি। বলে স্পষ্ট মায়াপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর চোখে চাইল বিনুনি। হঠাৎ দৃষ্টিনিবদ্ধ পর্ণা বলল, সঙ্গে তোর গাড়ি আছে?

—হ্যাঁ। ড্রাইভার নেই। আমিই চালিয়ে এসেছি। কেন?

—সুবৃত্তর চোখ দু'টো এইবেলা একবার না দেখলে থাকতে পারছি না। আমি কি খুব খারাপ হয়ে গেলাম?

—মানে!

—কী যে বলছি তোকে! আচ্ছা, একটা কথা। তোকে রতন পাঠায়নি তো!

—খুকু, নিমু কী করছে জানি না! আমি তোর দুশমন নই, সুবৃত্তর কথা শুনেই ছুটে এসেছি।

—তুই রতনকেও একটু একটু ভালবাসতিস বিনু। হঠাৎ এসেছিস দেখে, কেমন ভয়ও করছে।

—একটু-আধটু প্রশ্রয় দিতাম রতনের গুণের জন্য এবং থিয়েটারে ভাল সুযোগের আশায়। ওটা হালকা তোষামোদ পর্ণা। একটু-আধটু আলতো হাত দিত গায়ে, হেসে উঠে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে দৃষ্টি দিয়ে মিষ্টি শাসন করতাম, তার মানে, অমন ক'রো না, করতে নেই। এটাকে ভালবাসা বলে? মেয়েদের তো আজকাল এ রকম কতই করতে হয়।

—এখনও তুই করিস?

—হ্যাঁ। নিমু অবশ্য ব্যাপারটা বোঝে এবং উপভোগই করে। নাটকে পাঁচমিশেলি মানুষ, একেকটা বেশ বাচ্চাদের মতো চোখে খিদে নিয়ে আসে, ছোঁবেই ছোঁবে, গা ঘিনঘিন করলেও বুঝতে দিই না, সাবধানে চোখ পাকাই, আড়ালে চাপা গলায় বলি, ভাল হচ্ছে না, থাবড়া খাবেন কিন্তু। তবে ওইসব 'পিস' দু'একটাই হয়। অন্যরা সত্যিই ভাল। দ্যাখ, জিনিস পচে একটু করে একদিক ধরে, মানুষও তাই। ঠাকুমা বলেন, পচাটুকু ফেলে দিয়ে ফলটা ঠাকুরকে ভোগ দাও। ঠাকুর দিব্যি খাবেন।

—আমার এই দেহটা বোধহয় আর কাউকে দেওয়ার মতো রইল না বিনু। গত রাতে রতন...

—কী হয়েছে?

—না না। কিছু নয়।

—আমাকে বিশ্বাস করে বলে দে খুকু! আমি নেমকহারামি করব না। শম্ভু মিত্রের নামে শপথ করে বলছি। তোকে দেখে সত্যি বড্ড মায়া হচ্ছে রে।

—রতন আমাকে ধর্ষণ করেছে। ঠিক বোধহয় তা-ও নয়। প্লিজ বিনু, কাউকে বলিস না। বললেই নিমু...রতন...

—না, না। বলে অন্যমনস্ক এবং গম্ভীর হয়ে গেল বিনুনি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পর্ণার হাত ধরে টানল—আয়। গাড়িতে কথা হবে।

গাড়িতে বিনুনি পর্ণাকে পাশে বসিয়ে গাড়ি ছাড়ল। জানতে চাইল, সুবৃত্তর বাড়ি কীভাবে যেতে হবে।

গাড়ি চলতে চলতে একসময় পর্ণা দুম করে বলে বসল—থাক বিনু। আমরা যাব না।

—কেন রে!

—খুব কান্না পাচ্ছে আমার। কেমন অশুচি লাগছে। অথচ রহিতের সঙ্গে কখনও অপরাধবোধ ছিল না। ভারী আশ্চর্য এই দেহ। যাকে ভালবেসে বিয়ে করে সহবাস করেছি, তাকেই আজ এত ঘেন্না করছে কেন? ও যখন জোর করল, ভাল করে বাধাও দিলাম না। তাই বা পারলাম না কেন? আমি কি খুবই খারাপ মেয়ে বিনুনি? বলে পর্ণা পাশে বিনুনির চোখে চাইল।

বিনুনি বলল, আমি বললে হবে কেন? সুবৃত্ত যদি বলে, তুই পবিত্র, তাহলে তুই পবিত্র। চ। ঘুরেই আসি। এত ভয় কেন? ভয় করলে হেরে যাবি খুকু। তোর মনের জোরের কত তারিফ করেছি আমরা। সেই তুই ভেঙে পড়ছিস। না, না। ঠিক নয়। বলে গাড়িতে স্পিড দেয় বিনুনি সান্যাল ঘটক।

বিনুনি বারবার পর্ণার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। বেশ অসুস্থ দেখাচ্ছে বেচারিকে।

—যাকে ছেড়ে এসেছিস তাকে আবার কেন, খুকু!

—ভেবেছিলাম কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। এবং রতন হয়তো বন্ধুত্বই চাইছে, সত্যি সত্যিই শরীরটাই যে এভাবে...তাছাড়া ড্রামা থেরাপি সম্ভব।

—তোর কথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, ঠিক করে বল। ঠিক তুই জানিস, রতনকে কেন তোর প্রয়োজন?

—হ্যাঁ। নাট্য-অভিভাবন বা থিয়েট্রিক্যাল হিপনোসিস বলে একটা কথা তোকে আমি নিশ্চয় বোঝাতে পারি বিনু। আমি বিশ্বাস করি, থিয়েটারকে মনের অসুখ সারাতে ব্যবহার করা সম্ভব।

—পৃথিবীর কোথাও কি এই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে?

—কথা বলে বলে মানুষকে যদি সুস্থ করা সম্ভব বলে মনে কর, তাহলে নাটক তো আরও ভাল উপায় বা মাধ্যম। এখানে তুমি আলোর পেশাদারি ব্যবহার পাচ্ছ, শব্দ-সঙ্গীত-নৈঃশব্দ্য ছাড়াও পাচ্ছ ভাস্কর্য-চিত্র এবং কাব্য। কথাব জোর এখানে

সাংঘাতিক! বাচিক এবং কায়িক অভিনয় মিশিয়ে মানুষের মগজে তুমি যা সেঁদিয়ে দেবে, নাচেগানে যা দেবে, আলোয় নাট্যচিত্রগুলো পর্যন্ত স্নায়ুতে গেঁথে যেভাবে দেবে, তাইই চলে যাবে অবচেতনের তল অবধি। অতএব যা ভেবেছি, তাতে কোনও ভুল নেই।

—বেশ তো!

—হ্যাঁ। অনেক নিউরোসিসের পিছনে থকে সমাজের গড়া নাটক। বলতে কি মোলোড্রামা থাকে। এটাকে যদি তুমি মেলোড্রামাটিক নিউরোসিস নাম দাও, মন্দ হবে না। সুবৃত্তর নিউরোসিস টোটালি মেলোড্রামাটিক। অথচ সোসাল কর্নার থেকে দেখলে ন্যাচারাল। গণপ্রহার আসলে মেলোড্রামা এবং ওই ঘটনার পিছনে অনুঘটক একটি চার টাকার চেন। ওই চেনটা আমার গলায় ছিল। আমি অপরাধী। বিষে বিষক্ষয়, এটাই হচ্ছে পদ্ধতি। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, এটাই হচ্ছে মেথড। নাটক করতে আমি বাধ্য।

—নাটকই তো করছ তুমি খুকু!

—হ্যাঁ, করছি বইকি। রোগীকে সম্মোহিত করার সময় ডাক্তার রোগীর কানের কাছে মুখ রেখে অত্যন্ত নাটুকে গলায় কথা বলেন এবং পেশেন্টের আইবলের ভিতরে চড়া সরু আলো ফেলেন—এটাকে আমি ড্রামাটিক মেথড বলতে চাই। কী বলেন ডাক্তার? একটা কথাই বলে বলে রোগীর স্নায়ুকে তাতিয়ে তুলে সমস্ত চিন্তাক্ষমতাকে একটা বিন্দুতে কনসেন্ট্রেট করেন, মানে দানা বাধিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, স্মৃতির একটা দৃঢ়বিন্দুতে রোগীকে নিয়ে যান। সুবৃত্তের চেনটাই হচ্ছে সেই বিন্দু।

—তো?

—থিয়েটারের যে নাটক তাতে দু'টি জিনিসই মারাত্মক সম্ভব।

—কী?

—ঘৃণার চরম, ভালবাসারও চূড়ান্ত।

—বুঝলাম। রতনের করা রাত্রির অপমান তুই ভুলতে পারছিস না।

—ওকে আমি মঞ্চে ফেলে অপমান করব।

—হা হা হা। তোর জন্যে মায়াই হয় খুকু। আসলে আমরা নিজেদের মনটা কতটুকুই বা বুঝি! রাত্রে তোর দেহটা তোর হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। নিজেকে ক্ষমা করে দে।

—সুবৃত্তের জন্য আমি বেশ্যা হতেও রাজি। আমি মনে করি, রতন আমাকে রেপ করেছে। আমি ওকে চাই না বিনু! বিশ্বাস কর। আমি কেন ওকে তাড়িয়ে দিলাম না!

—ওকে তোর দরকার।
—নাহ্। আমি চাইনি।
—আহা! নাটকের জন্য তো দরকার। হাহাহা!
—তুই আমাকে...এইভাবে...হাসছিস কেন?
—না খুকু! আমি তোকে...না না হাসছি না।
—প্লিজ বিনুনি। গাড়ি ঘুরিয়ে নে। আমি যাব না।
—এই তো পাগলামি করছ! এভাবে তুই সুবৃত্তকে সুস্থ করবি?
—আমি আর পারব না বিনু।
—তোকে পারতেই হবে পর্ণা।
গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল বিনুনি। স্বাগতাপর্ণা চুপ করে গাড়ির বাইরের পৃথিবীর দিকে চেয়ে রইল।
সুবৃত্তর বাড়িতে পৌঁছে দুই বন্ধুই কেমন আশ্চর্য হয়ে গেল। সাগরী গেট না খুলেই সদর দোর থেকে বললেন, দাদা আর মণি দু'জনকেই সকাল দশটা নাগাদ কুদ্দুস এসে কোথায় নিয়ে গেল জানি না। একটা ভাড়ার প্রাইভেট কার এনেছিল কুদ্দুস। বার হয়ে যাওয়ার সময় দাদা বলে গেল, পাখিরাকে হাওয়া বদলের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খোকার কথা বলা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। দাদা যা ভাল বুঝবে করবে, আমি তো কিছু বলতে পারি না। তাছাড়া কুদ্দুস অন্য রকম। এত গম্ভীর দেখলাম, তাকে কোনও প্রশ্ন করতেই পারলাম না।
—আমার কথা কিছুই বলেননি মামা?
—না।
—আমাকে তুমিও কিছু বলবে না মাসি!
পর্ণার অদ্ভুত ভেজা গলার স্বর সাগরীকে সচকিত করে তোলে। তিনি ত্রস্তস্বরে বলেন, গত রাতে সুচেতন তোমার কাছে ছিল শুনলাম। কুদ্দুস দাদাকে আলাদা ডেকে বলল সেকথা। আমাকে শুনিয়েই বলল। তারপর আর কোনও কথা ডক্টর গাঙ্গুলি খরচ করতে চাইলেন না। বেরিয়ে পড়লেন। তোমার জন্য আমার তো কিছু করার নেই। আগে তো আমার সন্তান। সুবৃত্ত ছাড়া আমার আর কী আছে বল? ওটা তোমার বন্ধু?
—হ্যাঁ। বিনুনি ঘটক।
—ঠিক আছে, দাদা জানতে চাইলে বলব, তোমরা এসেছিলে।
বিনুনি এবার পর্ণার চোখে টলমল করা অশ্রুর দিকে মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে হাত ধরে নরম করে টানল এবং বলল, আয় খুকু। আচ্ছা মাসিমা পরে আমরা যোগাযোগ করব। আয় চলে আয় স্বাগতা। আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে।

সহসা শক্ত করে দরজার গ্রিল আঁকড়ে ধরে পর্ণা বিষণ্ণ গলায় প্রার্থনা করে বসে—সুবৃত্তর ডায়েরিগুলো আমাকে দু'দিনের জন্য দেবে মাসি?

—না বাছা। দাদার অনুমতি ছাড়া আমি তো আর কিছুই পারব না। তাছাড়া কুদ্দুসকে আমার ভয়ই করছে। হ্যাঁ, কুদ্দুস আর একটা কথাও আমাকে শুনিয়ে বলে গেল, আমরা আর একটি সামান্য ভুলও করতে চাই না। খুব হয়েছে।

'খুব হয়েছে'—কথাটি একেবারে সিধে আক্রমণের মতো পর্ণাকে বিঁধিয়ে দিল। তার আপাদমস্তক চমকে উঠল। তার মনে হচ্ছিল, কাউন্সেলিং-এর ব্যাপারে ডকটর গাঙ্গুলি তাকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছেন। কুদ্দুস তার বন্ধুকে আর ছুঁতেও দেবে না।

—আয়।

—হ্যাঁ বিনু। আমাদের যেতেই হবে। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রিলের বাতা ছেড়ে দেয় স্বাগতাপর্ণা। কেমন যেন মুহূর্তে একটা অপমান-ক্রুদ্ধ দৃঢ়তা তাকে সোজা দাঁড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল। অত্যন্ত দ্রুত পায়ে প্রায় দু'টো ছোট ছোট লাফ দিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা বিনুনির গাড়ির কাছে চলে গেল স্বাগতা। দরজা খুলে সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে পড়ল।

গাড়ি ছাড়লে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রথম কথাটি পর্ণাই বলল, আমার প্রত্যেকটি ছেড়ে যাওয়া এই রকম। হঠাৎ হয়ে যায়। কেমন অসম্পূর্ণভাবে আচমকা সব ছিঁড়ে যায়। আমি সেই বিচ্ছিন্নতা ঠিক বুঝতে পারি। ডক্টর গাঙ্গুলির সমস্ত কথা এখন মন পড়ে যাচ্ছে। আমি যেন একটা মিথ্যা দিয়ে বানানো ডাইনি, আমার ছায়াও মাড়াতে চায় না মানুষ।

—বড্ড বেশি বেশি ভাবছিস। সুবৃত্ত কথা বন্ধ করে দিয়েছে, সেটা ভেবে দেখ একবার। কুদ্দুসেরই বা দোষ কী? মামাই বা কী করবে? ওরা তো দিশেহারার মতো বেরিয়ে পড়েছে।

—হ্যাঁ, সুবৃত্ত আমার গলা টিপে ধরে বলেছিল, ইউ আর মাই ডিজিজ স্বাগতাপর্ণা।

—তাইই বলেছে?

—হ্যাঁ বিনু। আমার আর হল না।

—এখনই আশা ছেড়ে দিচ্ছিস কেন?

—মন বলছে, সমস্ত কেটে গেল। কেরিয়ারের গোড়াতেই কুঁড়ি বিনষ্ট হল। লোককে কী বলব, তাই ভাবছি। রতন সমস্ত রাষ্ট্র করে দিয়েছে।

—বলবি, আমি আর সুবৃত্তকে দেখি না। ব্যস।

—অতই কি সহজে বিনুনি!

—আচ্ছা, আজ সন্ধ্যায় বাংলা একাডেমিতে তোর অনুষ্ঠান, কাগজে দেখলাম। সময় তো হয়ে যাচ্ছে। যাই তাহলে?

—না।

—সর্বনাশ, অনুষ্ঠানের কী হবে?

চুপ করে রইল স্বাগতাপর্ণা। বিনুনিও আর কোনও কথা না বলে চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে পর্ণাকে নিজেদের ফ্ল্যাটে এনে তুলল। কাজের মেয়ে ছাড়া বাড়িতে কেউ ছিল না।

—নির্মল কোথায়?

—নিমু কোথায় জানিনে ঠিক। একটা কোথায় যেন তাস খেলতে যায়, অফিস থেকে বেরিয়ে, মাঝে মাঝে মদ্যপান করে ফেরে, ভাল লাগে না। তবে রোজ করে না, উৎপাতও নেই। মদ খেলে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কথা বলে না।

—তোরা ভাল আসিস?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—কী করে?

—ভালবেসে।

—তুই থিয়েটার করিস বলে কোনও সমস্যা হয় না?

—আগেই বলেছি, নিমু খুবই সহমর্মী, আমাকে পরিষ্কার বোঝে। ও বেশ সেকেলে ধরনের লোক। সন্দেহবাতিক নেই। আমাকে বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। একটু গোঁড়া, কোথাও সম্পর্ক ভেঙে গেল শুনলে কষ্ট পায়। অদ্ভুত, জোড়া দেওয়ার তালে ঘুরে বেড়ায়। খুব রিসেন্ট অনুকূলচন্দ্রের শিষ্য হয়েছে। ওর অনেক মুসলিম গুরুভাই আছে। তাদের সঙ্গে ওর খুব সদ্ভাব। বাড়িতে পর্যন্ত ধরে আনে। ওই রকম ধর্ম করে বলে মদ খেতে লজ্জা পায়। খেয়ে এসে বলে, কাউকে বোলো না। আমি নিজে থেকেই ছেড়ে দেব।

—তুই কী করিস?

—ধর্ম?

—হ্যাঁ।

—কিছু না। তবে নিমুর ধর্মকে একভাবে সমর্থনই করি। ওটা একধরনের লোকধর্ম। তবে তোকেই বলছি, একজন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের ধর্ম লাগে না। শুনে নিমু বলে, একজন নাস্তিকও আমার ঠাকুরের ধর্মে আসতে পারে। তখন বলি, আমি তাহলে আছি। বলে বিনুনি হাহা করে হাসতে লাগল।

ভারী ধরনের টিফিন করতেই চেয়েছিল বিনুনি। পর্ণা খেতে পারল না। ঠাণ্ডা পানীয় মন দিয়ে খেল। সামান্য কিছু মুখে দিল মাত্র। তারপর বাংলা একাডেমির

উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

—আমার ভাল লাগছে না।

—কাদের অনুষ্ঠান?

—মনেও রাখি না। পয়সা দেবে না। হাওড়ার একটা সংস্থা বোধহয়। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে বললি, তা-ও দেখিনি। তুই না এলে যেতামই না। তাছাড়া আজকাল ভুলেও যাচ্ছি, সুবৃত্ত আমাকে অন্যকিছু ভাবতেও দেয় না। অথচ সব হঠাৎ থেমে গেল বিনু।

—যায়নি।

—সুবৃত্তকে কুদ্দুস আমার কাছে থেকে সরিয়ে নিল। ডক্টর গাঙ্গুলিও সেটাই চাইছিলেন বোধহয়।

—ভাবিস না অত।

—সুবৃত্ত একদম কথা বন্ধ করে দিয়েছে। এ কিছুতেই ভাল হল না বিনুনি।

—তুই একটা মাত্র কবিতা আবৃত্তি করে দিয়ে নেমে চলে আসবি।

—আমাকে তো অনুষ্ঠানের শেষে দেয় সব সময়।

—আজ প্রথমেই চাইবি।

—আমি বোধহয় পারব না।

—এত ভয় পাচ্ছিস কেন? তুই তো প্রায় প্রফেশনাল হয়ে গেছিস। তোর দক্ষতাই তোকে রক্ষা করবে।

—ঠিক তা নয়। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে কেন? গলার কাছে একটা কী যেন দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। এমন তো কখনও হয়নি বিনু। কাউকে ভালবেসে কখনওই এই রকম কান্না তো পায়নি। বলে স্বাগতাপর্ণা জলভরা দু'চোখ বাইরে দিগন্তের দিকে মেলে দিল। ভীষণ কালো একটা মেঘ বিনে শব্দে কোথায় ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। একবার মেঘটা গুমরে উঠলে সমস্ত আকাশে সেই শব্দ গড়িয়ে চলে যাবে এবং অনেকক্ষণ সেই গুমরানি গড়াতে থাকবে বলে মনে হল স্বাগতার।

অনুষ্ঠানে স্বাগতভাষণ এবং অনুষ্ঠান ঘোষণার দায়িত্বে রয়েছে সুচেতন চৌধুরী। স্বাগতভাষণের ফাঁকেই স্বাগতাপর্ণার পৌঁছে যাওয়ার আবেগতাড়িত ঘোষণা করে দেয় সুচেতন ওরফে রতন। ঘৃণায় পর্ণার সমস্ত সত্তা রি রি করে ওঠে। ওকে দেখেই অনুষ্ঠানের কর্মকর্তা এক প্রৌঢ় ছুটে আসেন এবং সম্মুখের চেয়ারে বসার অনুরোধ জানাতে জানাতে এগিয়ে যান। বিনুনিকে সঙ্গে করে পর্ণা পিছনের সিটেই বসে পড়তে চাইছিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক কিছুতেই মানলেন না, অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন।

বিনুনি শুধু চাপা গলায় মন্তব্য করল, হল তো।

—কী আর হবে। আমি প্রথমেই স্টেজে যাব। শুনুন, ও মশাই। বাইরেটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। দু'ফোটা গায়েও পড়ল। আমি প্রথমেই চাইছি, ব্যবস্থা করুন। বৃষ্টি হলেও আমাকে চলে যেতে হবে।

প্রৌঢ় বললেন, প্রথমে আপনাকে দিলে শ্রোতা ধরে রাখব কী করে?

—বৃষ্টি শুরু হল বলে। কেউ যাবে না। সব থাকবে।

—বলছেন! বলে প্রৌঢ় মধুর একটা হাসি হেসে মঞ্চের দিকে চাইলেন।

পর্ণা বলল, আমার চাহিদা সম্পর্কে আপনারা বাড়িয়ে বলেন কেন? আপনাদের আলোচনাচক্র আছে, সেটাই 'মেইন'।

ভদ্রলোক মিঠে হেসে মঞ্চে উঠে সুচেতনের কানে পর্ণার দাবি পৌঁছে দিতেই সুচেতন স্পষ্ট অলজ্জ দৃষ্টিতে পর্ণাকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে নিতে মাথা নেড়ে গেল। রতনের মুখচোখ কী একটা আনন্দে চকচক করছে।

স্বাগতার নাম ঘোষণা করে সুচেতন ঝুড়ি ঝুড়ি আবেগমিশ্রিত বিশেষণ প্রয়োগ করে গেল, তারিফ করল নানাখানা করে, পর্ণার সদ্যপ্রকাশিত এবং ইতিমধ্যে জনপ্রিয় ক্যাসেটের প্রসঙ্গ তুলল এবং একথা বলতে ছাড়ল না মনোরোগ চিকিৎসায় তার ভূমিকা উজ্জ্বল, সুবৃত্ত পাখিরাকে অনেকটাই সুস্থ করে তুলেছে স্বাগতাপর্ণা। পূর্ণ সুস্থ করে তোলার জন্য তার নিষ্ঠা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া থিয়েটারে তার আগ্রহ রয়েছে, শিগগিরই নাট্যমঞ্চে আমরা নতুন একটা কিছু দেখতে পাব। আমরা তার আবৃত্তির নতুন ক্যাসেটের দিকেও চেয়ে রয়েছি। আমরা চাইব, এই অনুষ্ঠানে তিনি নতুন কবিতা শোনাবেন। আসুন স্বাগতাপর্ণা।

পিছনের 'সিট' থেকে একটা আশ্চর্য মন্তব্য ছিটকে এল—এরা শুনেছি, একসঙ্গে থাকে না, কিন্তু কী ভদ্র বল? একটি কমবয়েসী মেয়ের গলা। যাকে সে কথাটা শোনাচ্ছে, সে-ও নবীনা।

সেই নবীনা বলল, এদের সেপারেশন হয়ে গেছে?

—তাইই তো শুনছি।

—কী খারাপ লাগে না!

—চুপ। আস্তে।

—আস্তে কী, এতো ওপেন সিক্রেট ভাই। কিন্তু দু'জনকেই দেখতে কী অসম্ভব ভাল।

—অ্যাই, চুপ চুপ।

পর্ণা একটা তীব্র ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। মঞ্চে চলে এল। একবারও সে কারও মুখের দিকে চাইল না। সামনে চেয়ারে বসা বিনুনির দিকে অপলক চেয়ে একটি মাত্রই কবিতা আবৃত্তি করল।

প্রথমেই বলল, সুবৃত্ত পাখিরার 'পাগল'। সুন্দর মিঠে আঁশ এবং মীড়ভরা ভারী গলা স্বাগতার।

বাতাসে করাঘাত করে পাগল ;

আঙুল দিয়ে কাটে,

চাবির মতো ঘোরায় বায়ুপথ—

ভাবে দুয়ার খুলে যাবে।

তার গলার বিষণ্ণ গভীরতা প্রত্যেক শ্রোতাকে হৃদয়ের তলবর্তী আবেগে সাড়া জাগিয়ে মুহূর্তে সজাগ আর নিবিষ্ট করে দিল।

পর্ণা, 'ভাবে দুয়ার খুলে যাবে' বলে থেমে গেল এবং গোড়া থেকে পুনরাবৃত্তি করল কবিতা এবং শ্রোতাকে একেবারে হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে বাকিটা অগ্রসর হল।

কবিতার সঙ্গে আঙুলের অদ্ভুত শান্ত কারুকাজ দেখাচ্ছিল, যা দর্শক-শ্রোতার চোখে লাগছিল না অর্থাৎ সুন্দর লাগছিল। এতই স্বাভাবিক ছিল সেই মুদ্রা যে কখনও কারও মনে হচ্ছিল না যে, সে অভিনয় করছে। আবৃত্তির সঙ্গে কায়িক অভিনয় শুধু দোষের তাই নয়, ভোক্তা সেটাকে খারাপ দেখে এবং কবিতার জগতে দূষণীয়ই মনে করে। অথচ এক্ষেত্রে ঘটনা অন্য রকম হচ্ছিল।

এই কবিতাটি যে আঙুলের কারুকাজ এবং পাগলের শূন্য অবরুদ্ধতার তীব্র কষ্টে দিশেহারা, আঙুলেও সেই আর্তি ফুটে উঠছিল। মাঝে মাঝে দু'টি হাতকেই ব্যবহার করছিল পর্ণা।

কবিতার পঙ্‌ক্তি বিন্যাসে এসে, বায়ুময় গৃহ ভেঙে যায়, আঙুলেই গড়ে তোলা বাড়ি শূন্যে মিলিয়ে যায়, তা পর্ণার ভাষায় ফুটে ওঠে। তার ঠোঁটে পাগলের বোকা ফুটে ওঠা হাসিও মিলিয়ে যেতে দেখে দর্শক এবং বাতাসে পর্ণার কান পাতার উন্মাদমুদ্রাও দেখেছে।

এবং শেষে পর্ণা দ্বিতীয়বার যখন বলে, 'বাতাসে আঘাত করে পাগল তারপর বুকে ও পাথরে', তখন কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির আঘাতের সঙ্গে স্পষ্ট পার্থক্য বোঝা যায়, বুকেই যেন আঘাতটা পড়ে, বাতাসে নয়।

'আঙুলেই কাটে হাওয়া, ভাবে, খুলেছে কপাট চরাচরে—'

এই লাইনে পর্ণার চোখে অদ্ভুত অভিব্যক্তিময় আলো খেলে ওঠে এবং তারপরই যন্ত্রণায় ভরে যায় মুখ, সে আঙুল না কামড়ে বা হাতের বৃদ্ধাতর্জনীর সাহায্যে ডান হাতের বৃদ্ধা চেপে ধরে বলে—'কিন্তু আঙুল কামড়ায়, বৃদ্ধ, তর্জনী, অনামিকা' ব'লে ডান হাতের আঙুল বাঁ-হাতের আঙুলে এমনই অসহায় মুদ্রায় ধরে ধরে দেখায় যে, পাগলই লাগে তাকে এবং মনে হয়, কী যেন ভুল অঙ্ক গুনে চলেছে সে।

এবং যখন শেষ পঙ্‌ক্তি আসে, আঙুল ছেড়ে বাতাসে চোখ মেলে বলে—'বাসাতেই আছে লিখা, দুয়ার খুলবে না'। তখন তার চোখে রীতিমত জল, সে ডান হাতের তালুর গর্তে ডান চোখ ঢেকে ফেলে। এবং কাউকে কোনও নমস্কার না জানিয়ে নেমে চলে আসে। মঞ্চ থেকে নামতে পাঁচ সেকেন্ডও লাগে না।

প্রথম সারির চেয়ারে বসে থাকা বিনুনিকে ইশারা এবং শব্দে ডেকে নেয়—আয়! তারপরে প্যাসেজ ধরে দ্রুত ছুটতে থাকে। বিনুনিও পিছুপিছু দ্রুতই নিঃশব্দে পর্ণাকে অনুসরণ করে।

সিঁড়ি ভেঙে নামবার সময় সিঁড়ি বাঁক নিলে বেশ কিছু শ্রোতার সঙ্গে রতনের দিকে চোখ পড়ে স্বাগতার।

রতন বিমূঢ় ভঙ্গিতে দর্শকদের মধ্যে তার কদর বোঝাতে এবং তীব্র কামনায় বলে, কালপরশু একবার যাচ্ছি তাহলে।

—কোথায়?

—তোমার কাছে। বিনুনিকেও সঙ্গে নেব, নিমু থাকবে।

—সুবৃত্তর কবিতায় আমি তোমাদের সমস্তই বলেছি, বাতাসে লেখা রইল। গুডবাই। আয় বিনু। চলে আয়।

—আমি যাব না?

—একদমই নয়। লোক তোমাকে খুঁজছে রতন, স্টেজে চলে যাও। আয় বিনু।

নন্দন চত্বরে নেমেই দেখা গেল বাতাসে গাঢ় বৃষ্টির ঝাঁক, পর্ণা বৃষ্টি ভেদ করে ছুটতে ছুটতে দেখল, একটি সুন্দর মেয়ে বিনুনির পাশাপাশি ছুটে আসছে।

গাড়িতে ঢুকে পড়েছিল ওরা দুই বন্ধু। সুন্দর মেয়েটি ভিজে যাচ্ছে। এতক্ষণ নিশ্চয় মেয়েটি কবিতা শুনছিল। এখন গাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে বলে উঠল—প্লিজ।

—হ্যাঁ, কী বলছ তাড়াতাড়ি বলো। বলল পর্ণা।

মেয়েটি বলল, সুবৃত্তদা কেমন আছে?

—তুমি কে?

—আমি মেধা।

—কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি আর ওকে দেখি না।

—কী বলছেন স্বাগতাদি! সুচেতন যে বললেন ..

—না, ঠিক বলেনি। কাঁচটা তুলে দে বিনুনি।

—আমি বিশ্বাস করি না। সুবৃত্তদা কথা বলতে পারে না, বিশ্বাস করি না। আপনি মিথ্যা বলছেন। এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। বলে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে, তীব্র জলধারায় ভিজে যেতে যেতে তুমুল আর্তনাদ করে উঠল মেধা। তার দু'চোখে পদ্মকুঁড়ির স্নিগ্ধতা, নিষ্পাপ প্রণয় বাদলায় গোঙানিতে ব্যথিয়ে উঠছিল। মেয়েটি

পাগলের মতো বাতাসে আঘাত পাওয়া বাহু যেন আছড়ে ফেলছিল—না, আমি বিশ্বাস করি না। বলে সে বৃষ্টির প্রহারে আকাশকে মথিত করছিল বারবার। বিনুনি কাচ তুলে দিয়ে গাড়ি ছাড়ল। মেধার আর্তনাদ বাতাসেই লিখিত হতে থাকল।

কুদ্দুস সুবৃত্তকে বহরমপুরের গঙ্গার ধারে একটি সাদা বাড়িতে এনে তুলল। এবং বলল, এটা আমার ছোট খালার নার্সিংহোম। এখনও চালু হয়নি। নতুনই তৈরি করে ফেলে রেখেছে। কবে চালু হবে ঠিক নেই। বুঝলে সুবৃত্ত, এখানে মাঝে মাঝে এসে থাকতে পারি। এসো, এখানে দাঁড়িয়ে একটা জিনিস বোঝবার চেষ্টা করো। গঙ্গার সিধে ওপারে একখানা কাঁচাপাকা বাড়ি দেখা যায়। এখন ওখানে যাব, গঙ্গা ব্রিজ পেরিয়ে। ব্রিজটাও চোখে পড়ছে। রাধার ঘাটের ব্রিজ। ওই বাড়ির মালিক একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম, খুবই গরিব। নার্সিংহোমের দেখভাল ওর ওপর। নূর ভাই, আধা-মৌলবি গোছের সুন্দর দেখতে।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে গঙ্গার ওপারে চাইল সুবৃত্ত। গঙ্গায় মন্থর স্রোত, কিন্তু ওপারে স্রোত কিছু বেশি চঞ্চল।

—তুমি কোথায় থাকতে চাও, তোমাকেই ঠিক করতে হবে। তোমার যখন ভীষণ একা থাকতে ইচ্ছে করবে, এখানে চলে আসতে পারবে। আমি নূর ভাইকে বললে, ওপারেই ওর বাড়িতে ব্যবস্থা হবে। সেখানেও থাকতে পারো। বা যখন যেখানে খুশি। চলুন মামা, ওপারে গিয়ে দেখি। বলে নীচে নেমে আসতে থাকে কুদ্দুস।

সুবৃত্ত গঙ্গার পাড়ে এসে দাঁড়াল। মামা জানতে চাইলেন—খাওয়ার ব্যবস্থা?

—এখানে গ্যাসওভেন আছে, হাঁড়িকুড়ি আছে, সব আছে। নূর ভাইয়ের বউ এসে রেঁধে দিয়ে যাবে, দু'বেলা। বউয়ের নাম শান্তি বেগম। ভাবনার কিছু নেই, যা বলব তাই হবে। চলুন যাওয়া যাক। বলে সুবৃত্তর হাত ধরে টানল কুদ্দুস।

গঙ্গার ওপারেই রয়ে গেল সুবৃত্ত। এবং শান্তি বেগম রাত্রে সুবৃত্তকে তাদের ছোট বৈঠকখানায় শুতে দিল। তার আগে ছোট পিউলি মাছ, চমৎকার বড়ি, উচ্ছে ভাজা, ডাল ইত্যাদি দিয়ে ভাত বাড়ল, আশ্চর্য সুন্দর হাতের রান্না। খাওয়ার শেষে বটের আঠার মতো গাঢ় ঈষৎ-উষ্ণ দুধ জীবনে এই প্রথম। দুধ খেতে খেতে সাদা কালো লাল ফুটকিঅলা গাইটাকে দেখতে পাচ্ছিল সুবৃত্ত। দুধ খাওয়া হলে বাটিটা নিতে এল নিশা, বারো বছরের অসম্ভব সুন্দর একটি বালিকা।

রাত্রে মামা এবং কুদ্দুস কোথায় রইল সুবৃত্ত জানে না। নূর ভাই এল রাত্রি এগারোটায়, এসে স্ত্রীর কাছে সমস্ত শুনে সুবৃত্তর কাছে দেখা করতে এল। বলল, সালাম! আপনি কুদ্দুসের দোস্ত? আমার মেহমান। শুকুর খুদা কী, খাওয়াদাওয়া করেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—নাম কী আপনার?

—সুবৃত্ত। বলে ফেলেই পাখিরা বুঝতে পারে, তার নামের উচ্চারণ এবং অর্থ, দুইই এই ব্যক্তিটির কাছে দুরূহ। তাই সে সামলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে আমার নাম মণি!

—প্রথমে কী বললেন?

—ওটা ভারী শক্ত, ওটা তোলা নাম, কলকাতায় চলে।

—তা-ও বলুন।

—সুবৃত্ত।

—ও, আচ্ছা, মণিই তাহলে থাক।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী করা হয়?

—কিছু না। বেকার।

—সেডাই কি একিন করতে বলেন? কিছু কাজ তো করতে হয়।

—না। কিছুই হয় না। হ্যাঁ, নিশা পড়াশোনা করে, আমি পড়াব। সেটা পারি।

—বেশ, বেশ। আমি মৌলবি মানুষ, খুদার ‘জিগির’ করে অন্ন জোগাড় করি। ওয়াজ-নসিহত করি। বউ গরু-ছাগল পালে, পাটি, কাঁথা বোনে। সন্তান দুইটা। নসরত আর নিশা। আমার ঘরে একটা হ্যান্ডমেশিন আছে, সেইডি চালিয়ে বউ জামা-পিরহান বানায়।

—আপনি বসুন।

—এখানে আপনার কষ্ট হবে।

—না। হবে না। নদী এত কাছে।

—হ্যাঁ, সব সময়। খপ্‌খপ্ করে। আমি এখানে আসার পর ভাঙন থেমেছে। লোকে বলে, আমার দোয়া কবুল করেছেন করিমুল্লা। আমি উঠে গেলে সব বসত ভেঙে যাবে। বলতে বলতে খুঁটি ধরে টলটলে মাটির মেঝেয় সুবৃত্তর সিঁথানের কাছে বসে পড়ে নূর।

গায়ের আধেকটা কাঁথায় পা পর্যন্ত ঢেকে কাত হয়ে শোয়ার চেষ্টা করেছিল সুবৃত্ত। এবার উঠে বসে গেল। কাঁথাটা হালকা এবং সুদৃশ্য।

—আপনি উঠে বসছেন? আরাম করুন না। বলল নূর।

—না, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি বলছেন, আপনি উঠে গেলে...

—আমি বলছি কোথায়! লোকে বলে, এইডে একটা গাওনা। আমি পয়লা হিম্মত করে নদীর কিনারে ঘর বানালাম, তারপর বসত পড়ল একে একে। আগে পিত্যেক সন, ভাঙনে খেয়ে যেত। তবে দোয়াকালাম করি, আয়ত আউড়ে শোয়ার আগে নদীর বুকে ফুঁ দিই। খুদাকে বলি, সামাল খোদাবন্দ্, বান্দাকে বাঁচাও, ওই যে পাশের পাকা দালান দেখছেন। ওখানে এক প্রফেসর থাকে। তেনার কথা হচ্ছে, তুমিই নদীকে ঠেকিয়ে রেখেছ নূর ভাই। আলাপ হয়েছে?

—না।

—হবে। উনাকে আমরা 'বাবা' ডাকি, ভয়ানক বিদ্বান। স্ত্রীপুত্র ছেড়ে একলা পড়ে আছে। আমি বাবাকে বলেছি, কিছু না, আমি মানুষকে খাঁটি দুধ আর খাঁটি কালাম দিই। খাঁটি শুদ্ধ দুধ ঈমান শুদ্ধ করে। পাক জুবান, পাক ইনসান।

—পাক মানে?

—শুদ্ধ পবিত্র নেক।

—ওহ্।

—তাই জন্য কী করেছি, গাই পুষেছি। দুধে যেদিন এক জরা পানি মিশাব, নদী আমাকে খাবে, বসত গিলে নিবে পানির ফরিস্তা। গাইডাকে আমি নদীর ধারের খুঁটায় বেঁদে দিব মণি দাদা। ওই গাই একডাও হারাম দানা খায় না।

—কী বলছেন নূর ভাই! বলে শিরদাঁড়া সোজা করে তোলে সুবৃত্ত। নদী খপ্‌খপ্ শব্দে কিনারে মাথা কুটছে আর কী যেন ক্রমাগত বলে যাচ্ছে। সেই শব্দ শুনতে শুনতে মহাবিস্ময়কর এক বান্দাকে দেখে চলেছে সে। মানুষটার সৌন্দর্য দেবদূতের মতোই আলোকময়, প্রশস্ত ললাটে অপূর্ব প্রশান্তি, সাদা ঝকঝকে দাঁতে পবিত্র দ্যুতি, স্বল্প সুন্দর দাড়িতে ঈমানের দৃঢ় অঙ্গীকার, দেখেই মনে হয়, এ মানুষ সৎ হৃদয়ের বশীভূত। সাদা কলিদার জামায় পরিচ্ছন্নতা টলটল করছে।

সুবৃত্তর বারবার মনে হচ্ছিল, নূর ভাই লেখাপড়াও কিছুকিঞ্চিৎ জানে, হয়তো ছোটোখাটো পাশও দিয়েছে।

কাছে কোথাও মাটির মসজিদ আছে, ভোররাতে আজান শোনা গেল। তখন নদীর ভাষাও কেমন বদলে গেছে। বৈঠকখানাটি খাপরার চালের, পুবমুখো, গঙ্গার ওপারে শহর ভেদ করে সূর্যোদয় হবে। উঁচু দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে এল সুবৃত্ত। এদের বড় ঘরখানা ইটের দেওয়াল গাঁথা কিন্তু মাটি লেপা, মাথায় খড়ের চাল, তাল গাছের তিরবর্গা করা, এছাড়া একখানা ছোট ঘর পুরোপুরি পাকা, সবচেয়ে ভাল যা, তা হল, একখানা সেনিটারি পাকা পায়খানা এবং একটি টিউবওয়েল।

নূর গরিব কিন্তু ভয়ানক গরিব নয়। ওর ধর্মোপদেশ দিয়ে রোজগার হয়তো আছে, দুধ বেচে পয়সা হয়, সেলাইফোঁড়া থেকে সামান্য হলেও আয় রয়েছে। সংসারে সন্তানাদি কম। অল্প জমিজিরেত থাকাও অসম্ভব নয়।

গাইটা নদীর গড়ানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোনও কারণে পা হড়কে গেলে জলে পড়ে যাবে। গাইটাই নদীর ভাঙন থামিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন বা। এই গরুটা হারাম দানা খায় না। কথাটি খুব একটা বোঝেনি সুবৃত্ত। গরুর আবার হারাম খাওয়া কী?

শান্তি বেগম নামাজ পড়ছে ঝাপসা আলো ফুটেও না-ফোটা আঁধারে। এই মহিলাও যথেষ্ট সুন্দরী, চোখ দু'টি অত্যন্ত উজ্জ্বল আর নিষ্পাপ। দোহারা গড়নে কর্মঠ ভঙ্গি ফুটে ওঠে, কখনও মুখ ভার হতে দেখল না সুবৃত্ত। চার বছরের নসরত সর্বক্ষণ আঁচলের তলায় রয়েছে। দিব্যি ফুটফুটে বাচ্চা।

আলো ফোটা মাত্র খাঁটি দুধের চমৎকার চা পেল সুবৃত্ত। নিশা একটা কাঁসার ছোট গেলাসে করে নিয়ে এল, কাঁসারই থালায় বসিয়ে, সঙ্গে গোল শুকনো পুরু বিস্কুট।

—পানি দিব?

—দাও। শোনো, পড়তে বসতে হবে।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ করে দ্রুত জল আনতে ছুটল নিশা। সূর্যের লাল আলো এসে পড়েছে। কী অপূর্ব, একটি সাদা পাল তোলা নৌকো ভেসে গেল।

এত ভোরে ওঠার অভ্যাস সুবৃত্তর কোনও কালেই নেই। অথচ নতুন একটা উৎসাহে নদীই তাকে জাগিয়ে তুলেছে। হঠাৎ তার মনে হল, এখানে আজানাটা নদীর মতো প্রসারিত হয়ে কোথাও কোনও দূর গাঁয়ে ভেসে যাচ্ছিল যেন। সে ভারী অদ্ভুত সুর। আজান এবং পাখির ডাক একসঙ্গে নদীর স্রোতে মিশে যাচ্ছিল যেন। তার মনে হল, পাখি নয়, মানুষই এখানে পাখিকে ডেকে তুলে গাইতে বলে। নদী সেই সুর বয়ে নিয়ে চলবার জন্য ছটফট করছে। নদীর একটা সোঁদা গন্ধ নাকে এসে লাগে।

সূর্য আরও খানিক নদীর দিকে এগিয়ে এল বুঝি বা। শহরটা জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। ব্রিজের উপর বাসলরির শব্দ ক্ষীণভাবে ভেসে যাচ্ছে। নদীর উপর দিয়ে

একঝাঁক ছোট ছোট পাখি বাতাসে সাঁতার দিয়ে চলে গেল। এই সময় মাথালে ঘাসের আঁটি বসিয়ে নূর আলি বাড়িতে এসে ঢুকল। মাঠের ঘাস।

নূর বলল, প্রফেসরের ঘাস। ওনার জমিতে নেমে কেটেছি শান্তি। উনিও মাঠে খালি পায়ে হেঁটে ফিরলেন, সঙ্গে কুদ্দুস আর মণির ডাক্তার মামা। উনারা আসছে। চা খাবে। নিশা, পানি বসাও, চার কাপ। নিশার মাথাডা কেমন দেখছেন ভাইয়া?

—সুন্দর। সবই পারে, বেশ সড়গড়।

প্রফেসরকে দেখে সুবৃত্তর মনে হল, মানুষটাকে কোথাও সে দেখে থাকবে। নূরের পিছুপিছুই ওঁরা এসে পৌঁছলেন। বৈঠকে বসেই প্রফেসরের বাড়ির দরজা দেখা যায়। কখন এঁরা বার হয়েছিলেন সুবৃত্ত টের পায়নি।

প্রফেসর বেশ লম্বা, মজবুত স্বাস্থ্যের মানুষ, ষাট ছুঁইছুঁই বয়েস, কিন্তু বৃদ্ধ মনে হয় না। বললেন, তোমাকে সুবৃত্ত আমি চিনি। কুদ্দুস আমার ছাত্র, ও ওর মাসির এখানে থেকে আমার কলেজে এক বছর পড়ে হঠাৎ কলকাতায় চলে গেল। পরে মাঝে মাঝে এসেছে, এলেই দেখা করেছে। তা কথা হচ্ছে, তুমি আমার প্রিয় কবি। তোমাকে এভাবে পাওয়া যাবে ভাবিনি। দাও হে নূর ভাই, তোমার চা দিয়ে সকালটা শুরু হোক। আপনি বসুন ডাক্তারবাবু, তুমিও বসো কুদ্দুস।

—আপনি আমাকে চেনেন কী করে? আগে কখনও দেখেছেন কোথাও?

—হ্যাঁ। কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তোমার মনে নেই। না থাকাই স্বাভাবিক। ওই অনুষ্ঠানে আমি কিছু বক্তৃতাও করি। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে।

—আমি আর কবিতা লিখি না।

—জানি।

—শহরের সংস্কৃতির সঙ্গে সদ্ভাব নষ্ট হয়ে গেছে।

—তা-ও জানি। কলকাতায় আমার বোন আছে, ভাই আছে। বন্ধু আছে। আমার শিক্ষক আছেন। আমি সব খবর রাখি। কলকাতা আমাদের খবর রাখে না। বলে সুন্দর করে হাসলেন প্রফেসর।

সুবৃত্ত কোনও কথা না বলে মামার মুখের দিকে চাইল। নূর তিনখানা মোড়া এনে বৈঠকখানায় ফেলে বলল, আপনারা বসেন।

সুবৃত্ত কুদ্দুসের দিকে চেয়ে বলল, নূর ভাইয়ের বাড়িটাই এখানে প্রথম পত্তনি।

প্রফেসর বললেন, নূর ভাই ওর ঈমান দিয়ে নদী-বন্ধন করেছে যে! ওর সাহসেই আমি পাশের প্লটে দালান তুলে বসলাম। দেখা যাচ্ছে, নদী আর ভাঙে না। লোকবিশ্বাসের অদ্ভুত জগতে তুমি এসে পড়েছ সুবৃত্ত। বলে আবার সুন্দর করে নিঃশব্দে হাসলেন।

মামা এবং কুদ্দুস মোড়ায় বসে সুবৃত্তর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। যদিও চোখেমুখে সেই বার্তা ফুটে উঠতে দিচ্ছিল না তারা।

মামা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, আচ্ছা প্রফেসর, লোকবিশ্বাসের এই জগৎ কি কখনও মুছে যেতে পারে?

—না, এই জগৎ অনেক কাল টিকে থাকবে। নূরের ধারণা, সৎ কালাম এবং সৎ অন্ন সব সময় মানুষের দরকার। ও বলে, খাঁটি যা তা কিন্তু ফুরায় না, সেটাকে তথাকথিত সভ্যতা তাড়া করে ফিরছে কিন্তু একেবারে খতম করে দিতে পারছে না। ও ওর ভাষায় বলে, আমি আমার ভাষায় বললাম। বলে ফের হাসলেন প্রফেসর।

সুবৃত্ত হঠাৎ নরম করে বলে উঠল—ব্যাখ্যার কিছু দরকার নেই স্যার। আমি দেখলাম, দুধটা খাঁটি, এখন দেখব নূর কী করে দুইছে, ব্যস। আমি সারাজীবনে এই প্রথম খাঁটি দুধ খেলাম।

—আমরাও খাই সুবৃত্ত। শান্তি আমাদের বেচে। স্কুল যাওয়ার আগে নিশা ওই দুধ ঘটিতে করে মেপে বাড়ি বাড়ি দিয়ে বেড়ায়, মাপ এক কাঁচ্চা কম নেই। আমি লক্ষ করেছি, জল না মেশালে লোকসান, এই অনুভূতিটাই নূরের মধ্যে জন্মাতে পারছে না।

সুবৃত্ত প্রফেসরের চোখে দৃঢ়ভারে চেয়ে দেখে বলল, কেন পারছে না?

প্রফেসর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দিয়ে দু' হাতের মুঠোয় চায়ের গেলাস সযত্নে এবং সস্নেহে চেপে ধরে চায়ের দিকে দেখতে থাকেন।

শান্তি মাথায় খানিকটা ঘোমটা টেনে এগিয়ে এসে সুবৃত্তকে শুধাল, আপনার চা দিই? নিশা বুঝতে পারছে না, হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আনবে?

—হ্যাঁ। বলে শান্তির ঘোমটার তলায় একটি গভীর কালো চোখ দেখতে পেল সুবৃত্ত।

নূর উঠোনে মোড়ায় বসে চা খাচ্ছিল। বলল, ওই ঘাসের মধ্যে পানি আছে মণি দাদা। বাড়তি পানির আর দরকার নেই।

এইরকম জবাব পাবে কেউ ভাবতেই পারেনি। প্রফেসর মাথা তুলে হেসে ফেলে চায়ে চুমুক দিলেন। কথা বললেন না। কেউই কোনও কথা না বলে চুপচাপ চা শেষ করল।

এক সময় প্রফেসর মোড়া ছেড়ে উঠোনে নেমে বললেন, দ্যাখো নূর ভাই। মেহমান তোমার-আমার দু'জনেরই। দুপুর পর্যন্ত তোমার, তারপর আমার। কুদ্দুসের সঙ্গে কথা হয়েছে। নাস্তাপানি করে সুবৃত্ত আমার বাড়িতে আসবে। খাওয়ার সময় হলে শান্তি ডেকে নেবে। অথবা সুবৃত্ত যা ভাল মনে করবে। আমি ঘরে যাচ্ছি ডাক্তারবাবু, কুদ্দুস এসো তাহলে।

প্রফেসর উঠোন পেরিয়ে নিজের বাড়ির দরজায় পৌঁছলেন। তারপর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেলেন। কুদ্দুস এবং মামা আরও কিছুক্ষণ বসে রইলেন।

নূর বলল—প্রফেসর পঁচিশ বছর মানুষের সঙ্গে আছে, মানুষে রস পায় মানুষডা।

মানুষের রস পায় এক বিদ্বান, এমন কথাও কানে ঢুকল সুবৃত্তর। সে চমকে উঠে নূরকে দেখতে থাকে।

—আমি নিশাকে আর একটু দেখিয়ে দিতে চাই মামা। তোমরা যাও, আমি ঘণ্টাখানেক বাদে স্যারের কাছে যাচ্ছি। আয় নিশা। চলে আয়। মাদুরটা ঠিক করে পেতে দে। চায়ের পাত্তরগুলি সরিয়ে দাও শান্তিভাবী। বলে কাঁথাটা নিজেই ভাঁজ করতে শুরু করে সুবৃত্ত।

আধঘণ্টাটাক নিশাকে পড়া দেখিয়ে বৈঠকের উঁচু দাওয়া থেকে নামল সুবৃত্ত। প্রাতঃকৃত্যের দরকার। ৮টা বেজে গেছে। আকাশে এখন মেঘ নেই। নদীতে অবশ্য বর্ষার পূর্বাভাস দেখা যায়। জলের চেহারা অল্প অল্প ভারী হয়ে উঠছে। সুবৃত্ত নদীর চেহারা প্রায় কিছুই বোঝে না। তবু তার মনে হচ্ছিল বর্ষা আসছে। দক্ষিণের মফস্বলে সাংবাদিকতার কাজ সে করেছে বছর দুই, কিন্তু গ্রামবাস করেনি বললেই চলে, কলকাতার উপকণ্ঠেই ঘোরাফেরা করেছে বেশি। খুনোখুনির সংবাদ থানা থেকে পেত এবং ছুটে গিয়ে ছবি তুলত। তার মনে হত গ্রাম একটা নিষ্ঠুর জায়গা। বিশেষ করে কলকাতার দক্ষিণের গ্রামগুলি তার কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল।

নদীতে স্নান করার সাহস পেল না সুবৃত্ত। ৯টা নাগাদ টিউবওয়েলে চান করল। নাস্তা করতে করতে নূরের দুধ দোওয়া দেখল। অনেক দিন ৭টা নাগাদ দুধ দোওয়া হয়। বকনা বাছুরটার ছটফটানি দেখছিল সুবৃত্ত। বকনার বাঁটে মুখ লাগিয়ে টেনে নেওয়া এবং দুধ নামানোর কায়দা তার ভিতরে একটা বঞ্চনার সিরসিরানো অনুভূতি গড়ছিল এবং সে ভাবছিল গাভীর দুধে কার কতটুকু অধিকার বোঝা যায় না।

—বাছুরটাকে সব দুধ খেতে দিলে কী হয়? কথাটা বলেই ফেলে সুবৃত্ত।

—আপনি বেজায় ভুল করছেন মণি ভাই। পাখরির থলিতে শাবকের দুধ লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা পাকা, সব দুধ তো পাখরি আমাদের দিবে না। বাঁট টানলেই দুধ কিন্তু আসে না ভাইয়া। শাবকের দুধ কিছুতেই নামে না এই বালতিতে। এই দুধ মনিবের। এই দেখুন আধ বালতি পুরা করেছে পাখরি। আর কিন্তু পড়ছে না। হাজার টানলেও এক ফোঁটাও নামবে না। তাই বলে দুধ কি নাই ভাবছেন! আচ্ছা, দেখাই তাহলে, বাছুরের গলতানি ছেড়ে দে নিশা। বলে নিশাকে নির্দেশ দেয় নূর।

বকনাটা ছাড়া পেয়ে গলায় ঝোলানো দড়িসুদ্ধ মায়ের পেটের তলায় ছুটে গেল। দুধ খেতে লাগল।

নূর কাছে ডাকল সুবৃত্তকে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, এই দেখুন, বকনার গলা

দিয়ে দুধ নামছে। দেখুন। এবার দেখাচ্ছি আসল ঘটনা। বকনাকে ধর নিশা, গলতানি টেনে রাখ। আমি দুইছি। তখন দেখলেন এক ফোঁটাও নামছিল না, এবার দেখা যাক। বলে বকনার মুখ ছাড়িয়ে বাঁটে টান দেয় নূর। পিচকারির মতো দুধ বেরিয়ে আসে। নূর হেসে উঠে বলে, এই দুধ ছুপা দুধ মণি ভাই, শাবকের ভাগ। এই দুধে আমার হক নাই। তাছাড়া ভোররাতে বকনাকে এক মিনিট খাইয়ে তবে এতক্ষণে দুইছি।

সুবৃত্ত একটি তাজ্জব করা মানুষকেই দেখছিল বটে। বকনার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে নূর সুবৃত্তর দিকে চেয়ে বলল, আমি দুধ বেচি। কিন্তু বকনাকে মেরে ফেলে তো পারব না। যতটুকু বকনাকে খেতে দিচ্ছি সেইটুকুনই আখেরাতে আমার জন্যে জমা রাখছেন খুদা। সেই দুধ হল 'শারাবান তহুরা' অর্থাৎ বেহেশ্‌তি পানীয়, স্বর্গে এই শরবত আমি পাব, আমার আর খিদেতেষ্টা লাগবে না।

—আপনি বেহেশ্‌তে বিশ্বাস করেন, আমি করি না নূর ভাই।

—না করেন, নাই করলেন। আমি করি। স্বর্গ যদি সত্যি থাকে, তাহলে আপনি কিন্তু ঠকে যাবেন ভাই। আপনার গেলাসে 'শারাবান তহুরা' আপনি পাবেন না।

—আপনার দুধই তো শারাবান তহুরা, খেয়ে মনে হচ্ছিল, আমার আয়ু বৃদ্ধি হচ্ছে।

—আপনাকে মনে হচ্ছে দেখে, আপন গো-শাবকের তর্‌হা নেক, সৎ মানুষ। আমার গাইয়ের দুধ খেয়ে কেউ এত বড় প্রশংসা করেনি।

—আমি কিন্তু হিন্দু।

—সেকি দাদা! সুরা হুজুরাতে খোদা বলেছেন, 'লা-আসখর কউমুম মিন কউমিন।' কোনও সম্প্রদায় যেন অপর কোনও সম্প্রদায়কে বা জাতিকে উপহাস না করে। কেন এই নির্দেশ? ভাল করে শুনবেন কথাডা। কেননা, যাকে উপহাস করা হয়, খোদা বলেছেন, উপহাসকারী অপেক্ষা সেই লোক উত্তম হতে পারে। উপহাসের পাত্রই হতে পারে উপহাসকারীর চেয়ে সৎ। দেখা গেল কি, খোদা সম্প্রদায় দেখেন না, মানুষ দেখেন। আপনি তারিফ করলে আমার গাইয়ের দুধ বৃদ্ধি পাবে ভাইয়া। ঘাস থেকে যে দুধ জন্মাচ্ছে সবাই তারিফ করতে পারে, জাত-সম্প্রদায় এখানে উঠে না।

—আমি দুঃখিত নূর ভাই। আপনাকে চিনতে পারিনি।

—চেনা জিনিসডা এক লহমায় হয়, ফির তামাম জিন্দেগিতে হয় না। চিনবেন কী করে? কারও হাতের এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি 'শারাবান তহুরা', কারও হাতে বিষ। আমাকে শান্তি প্রথম যেদিন এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি খেতে দিল ওর মুখ দেখানির দিন, খেয়েই বুঝলাম, 'শারাবান তহুরা', তাই ওকে শাদি বসিয়ে ঘরে আনলাম। বলে নূর হাহা করে হাসতে লাগল।

সুবৃত্তর চোখের সম্মুখ দিয়ে নিশা ঘটি করে বাড়ি বাড়ি দুধ দিতে বার হয়ে গেল।

—আপনার প্রিয় মন্ত্র কী?

—মন্তর ; মন্তর আবার কী? তাহলে শুনুন—

মহান খোদা তোমাব দ্বারে
যে কথা মোর বলিবার
বলার আগে শুধাই প্রভু
আছে কী বাকি বুঝিবার!

—মানে!

—খোদাকে যা বলতে চাইছি, তা হল, সংসারে কোন জিনিসটা বোঝা গেল না, আমাকে হে খোদা, সেই জিনিসটা বোঝাও, বুঝবার তাগদ দাও, যা বোঝার এখনও বুঝিনি, সেটা কী এমন বাকি রইল! কোন জিনিসটার আনন্দ বা দুঃখ আমার পাওয়া হল না! এইডে আমার মন্তর।

—নূর ভাই!

—হ্যাঁ, ভাইয়া। এই ধড়ডা হচ্ছে নানান কিছু বুঝবার থান।

নাস্তা শেষ করে আর এক গেলাস চায়ের নেশা সুবৃত্তকে ধরে। সে সংকোচে আর চাইতে পারে না। স্যারের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ধাক্কা দিতেই খুলে যায় দোর।

দরজায় শব্দ পেরে বারান্দায় একটি কেতলি হাতে করে প্রফেসর বেরিয়ে এসেই হাসিমুখে শুধালেন, তোমার জন্যও জল দিই সুবৃত্ত?

—চা?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। বলে ভিতরে ঢুকে গেলেন প্রফেসর।

বাড়ির ভিতরে কাঁঠাল, আম, পেয়ারা ইত্যাদির গাছ যত্ন করে পোষা হয়েছে। ফুলের গাছও রয়েছে। লঙ্কার গাছও দেখা যাচ্ছে। সুবৃত্ত হঠাৎ লক্ষ করল একটি কাঁঠাল পেকে মাটিতে পড়ে ফেটে কোয়া বেরিয়ে পড়েছে। একটি কাক সেখানে এসে কা-কা করছে। হঠাৎ প্রফেসর চায়ের ছাকনি হাতে বেরিয়ে এসে বললেন, ওকে খেতে দাও সুবৃত্ত। দ্যাখ বেচারি কী করে খাচ্ছে। নূর ভাই বলে, কাক একা কিছু খায় না। কাক একা যখন কোনও খাবার পায়, তখন কা-কা নয়, খা-খা বলে চেঁচায়। অর্থাৎ কে আছ, খেতে এসো। হাহাহা। এই হচ্ছে নূরের হাদিস। দ্যাখো, কাক একা কিছুতেই খাবে না। আমরাও তোমাকে ছাড়া চা খাচ্ছি না সুবৃত্ত। সুবৃত্ত লক্ষ করল, কাকটা কোয়ায় ঠোঁট না ডুবিয়ে সত্যিই খা খা বলে সকলকে ডাকছে।

বাস্তবিকই দেখা গেল, একদল কাক উড়ে এসে ভাঙা কাঁঠালের পাকা কোয়ার ভোজে অংশ না নেওয়া পর্যন্ত নিঃসঙ্গ কাকটি কোয়া স্পর্শ করল না। এই পর্যবেক্ষণ

সুবৃত্তকে অবাক করে দিল।

অধ্যাপক অত্যন্ত সমীহের ভঙ্গিতে প্লেটে চায়ের কাপ বসিয়ে ডান হাতটা সুবৃত্তর দিকে প্রসারিত করলেন। তাঁর ডান হাতে ধরা সামান্য চা যেন তিনি দেবতাকে উৎসর্গ করছেন এমনই একটা নিবেদন ফুটে উঠল যখন তিনি মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে বাঁ হাতের তালু ডান হাতের কনুইয়ের তলায় আলতো করে রাখলেন।

—আপনি এইভাবে দিচ্ছেন স্যার! কথাটা সুবৃত্তর মুখ দিয়ে ফুটে বেরিয়ে পড়ল।

—কেন, আমি তো আমার প্রিয় কবিকে দিচ্ছি। তাছাড়া এটা হচ্ছে বাউলে বা ফকিরি রীতি, মানুষ পূজা! আজাহার ফকির আমাকে এই রীতিটা শিখিয়ে দিয়ে বলেছিল, বুঝলে স্যার, মানুষ ছাড়া অন্য পূজায় ভক্তি নাই এই অধমের। পাথরে কি মাটির ঢেলায় সিজদা করব কেন? নাও, এই রকম দেওয়াটাই এখন আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। নাও, ধরো!

সুবৃত্ত রীতিমতো বিস্ময়ের সঙ্গে কাপপ্লেট হাতে নেয়। এবং দেখা গেল, মামা এবং কুদ্দুসকে একইভাবে চা নিবেদন করলেন বাবা।

চায়ে চুমুক দিয়েছিল সুবৃত্ত এমন সময় স্যার বললেন, এককালে মতবাদের পূজা করেছি। রক্তাক্ত সেলাম জানিয়েছি কমরেডদের। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পর আমার সামনে মানুষের একটা অন্য রাস্তা অন্বেষণের দরকার হল। বাউল-ফকিরের পথ। এটাও মতবাদ, কিন্তু এ পথে পার্টিকে পূজা করতে হয় না। সরাসরি মানুষ পূজা, ব্যস।

—এটাই কি শ্রেষ্ঠ পথ মনে হল আপনার?

—না।

—তাহলে?

—পার্টি-পলিটিক্স, শ্রেণীসংগ্রাম, সমাজ-বিপ্লব বাদ দিলে মানুষের সামনে আর কী থাকে? জনসেবা? গ্রামে পার্টির হস্তক্ষেপ এত প্রবল যে, নির্ভেজাল জনসেবা করা যায় না। চ্যারিটি উইদাউট পলিটিক্স, কমরেডরা করতে দেবে না। লুম্পেনাইজড পলিটিকাল ভিলেজ অর্থাৎ কিনা দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক গ্রাম, মানুষের শুদ্ধ জনসেবার পথও বন্ধ করে দিয়েছে। সমস্ত জনসেবার কেন্দ্রগুলো আর্টির মস্তানরা দখল করে ফেলেছে। উপায় কী?

—বুঝলাম না। বলে উঠল সুবৃত্ত।

—বোঝানো কঠিন। অভিজ্ঞতা বোঝানো যায় না। একজন ডাক্তার যদি কোনও রোগীকে ওষুধ সাহায্য করতে চায় তাকে তা পার্টির নামে করতে হবে। রবীন্দ্র-জয়ন্তী পার্টির নামে করতে হবে। ক্লাব পার্টির নামে করতে হবে। বারোয়ারি পূজা-

প্যান্ডেল পার্টির নামে করতে হবে। ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হবে পার্টির নামে। একে আমরা বলি, হাঁড়িতে-কুড়িতে পলিটিক্স। লুম্পেন তোমাকে আজ রাজনীতি শেখাচ্ছে। এই অবস্থায় তুমি কী করবে? তুমি ধর্মকর্ম পছন্দ করো না। তোমার পথ কী?

—কী পথ?

—কবিতা!

—না, স্যার! ওটা কোনও পথই নয়।

—নাটক? থিয়েটার? এই শহরে অন্তত পঞ্চাশটা নাটকের দল আছে। সেই সব দলও পার্টির আন্ডারে।

—নাটক কোনও পথ নয়। কারণ এখানেও গ্রাম্য-পলিটিক্স ঢুকেছে। ওখানে নাম কামাবার জায়গা হয়েছে। মানুষ আজ শিল্পের নামে নিজের নামডাক ভালবাসে। শিল্পকে নয়, নামকে।

—কিন্তু সংসারের ইতিহাস অন্য রকম, আজ পর্যন্ত। কবিতাও একটি পথ, যদি কবিতাটি তুমি নূরের দুধের মতো খাঁটি করে তোলো। আমি পারিনি।

—কী পারেননি? কবিতা?

—না, কবিতা আমার পথ নয়, লালন ফকিরের একটা পথ এই গাঁয়ের ভিতর দিয়ে গেছে, সেই পথের প্রকৃত পথিক আমি হতে পারিনি। এই পথে নাম নেই, যশ নেই, অর্থ নেই। প্রতিষ্ঠা নেই। আখের বলতেও কিছু নেই। একটা একতারা আর তুমি। একটি সামান্য কলম আর তুমি। তাই না সুবৃত্ত?

—স্যার! বলে বিস্মিতই হল শুধু সুবৃত্ত।

বাবা বললেন, 'হতে পারিনি', এটাই লালনের ধ্যান। কে লালন? যাকে সমাজ লালন করেনি সেই-ই লালন। সমাজচ্যুত, ধর্মচ্যুত, পরিবারচ্যুত, সমস্ত পরিচয় বিচ্যুত মানুষ। শোনো পাখিরা, কুদ্দুস বলছিল, তোমার হল পাখিজন্ম, শুনেই আমি শিহরিত হয়েছি।

চায়ে চুমুক দেওয়া থেমে গেল সুবৃত্তর। সে খাদের গলায় প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল, হ্যাঁ স্যার। পাখিজন্ম।

বাবা বললেন, লালনও একই জীবনে নিজেকে মৃত এবং পুনর্জীবিত ঘোষণা করেছিলেন। বাউলদের পোশাক ভাল করে লক্ষ করবে, আসলে একটি কাফন ছাড়া কিছু নয়। ওই কাফনই খানিকটা পোশাকের ঢঙে বাউল পরে বটে, তবে ওটা মৃতের পোশাক ছাড়া কিছু নয়।

—কী বলছেন!

—হ্যাঁ সুবৃত্ত।

কিছুক্ষণ চুপ করে বইলেন অধ্যাপক। চা খেতে থাকলেন। কুদ্দুস চুপ। মামাও কথা বলছিলেন না। কী মনে করে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, লালন নিজেকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন কেন?

অধ্যাপক বললেন, কারণ সমাজ তাঁর মৃত্যু হয়েছে মনে করেছিল, ভাগ্যের ফের এমনই। সমাজ তাকে অশুচি ভেবে পরিত্যাগই করেনি, ভেবেছিল লোকটা বেঁচে নেই। ফলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত মানুষটি সিরাজ সাঁইয়ের সেবায় প্রাণ ফিরে পেয়ে সমাজের ঘোষিত মৃত্যুকে মেনে নিলেন। পূর্বনাম, পূর্ব-পরিচয় অস্বীকার করলেন, মৃতের পোশাক পরলেন। তাঁর পুনর্জন্ম হল, গলায় সুর, হাতে একতারা।

—স্যার! আমারও কি মৃত্যু হয়েছে বলছেন?

—কেন নয়? সমষ্টি পথ আজ নষ্ট হয়ে গেছে, আজ আত্মপথই উপায়। যাদবপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তোমার মৃত্যু হয়েছে সুবৃত্ত। সমষ্টি পথকে আজ দূষিত রাজনীতি নষ্ট করে দিয়েছে। গণপ্রহার লুম্পেন রাজনীতিরই একটা চেহারা, মানুষের হাতে আইন রাজনীতিই তুলে দিয়েছে। গুণ্ডা-পলিটিক্স হীনবীর্য মানুষের রক্তে রক্তপাতের আদিম নেশা জাগিয়ে তুলেছে। তুমি মৃত, কেন নিজেকে মৃত বলে ঘোষণা করছ না?

—স্যার! বলে কেঁপে উঠল সুবৃত্ত।

—তুমি তোমার পাখিজন্মে সন্তুষ্ট নও কেন? মানবজন্ম বিরল, পাখিজন্ম বিরলতর। গণপ্রহারে মানুষ তো বাঁচে না, যে বাঁচে, সে তো পুনর্জন্ম লাভ করে। করে না? তুমি বলো, করে না! ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন অধ্যাপক।

সুবৃত্ত ফের কেঁপে উঠে মুখ তুলে বলল, করে।

—মনে রাখবে তুমি পুনর্জীবিত। পূর্বজন্মের কোনও স্মৃতি তোমার নেই।

—বেশ তো। আমি কবিতা লিখি না, আমি কবি নই।

—লালন কিছু গান নিয়েছিলেন গলায়, বাকি সব ফেলে দিয়েছিলেন। তুমি তা না করে মাত্র চার টাকায় একটি মেকি জিনিস স্মৃতিতে বয়ে বেড়াচ্ছে। কেন? বলে অতি আগ্রহে অধ্যাপক সুবৃত্তর মুখের দিকে নিবিড় করে চাইলেন।

সুবৃত্ত চুপ করে রইল। মামা কী যেন বলবার জন্য মুখ খুলছিলেন, তাঁকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিলেন অধ্যাপক এবং আরও বেশি করে সুবৃত্তর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। অধ্যাপক সুবৃত্তর সামনে একটি কাঠের চেয়ারে বসেছিলেন। সুবৃত্ত-সহ মামা এবং কুদ্দুস বিছানা পাতা চৌকিতে বসেছে।

সুবৃত্ত হঠাৎ নিঃশব্দে হেসে নেয় আপন মনে। তারপর বলে, চেন একটা গোল জিনিস, আমার স্মৃতির মতো। ঘুরে ঘুরে সুবৃত্ত হয়, একটা নিটোল গল্পের মতো। আচ্ছা, আপনি তখন ওইভাবে কাকটাকে দেখতে বললেন কেন?

—সমষ্টিধর্ম পাখিদের চিরকালের, আমাদের নয়। আমরা সময়ের স্বভাবে সেই ধর্ম থেকে সরে এসে আত্মপথ খুঁজি। কারণ দলবদ্ধ হয়ে এ যুগে মানুষ একা অসহায়কে খুন করে, দলের পলিটিক্স এভাবে মানুষকে শেষ করার, ধ্বংস করার ছাড়পত্র দিয়েছে।

—সমস্ত প্রজাতির পাখি এক রকম নয় স্যার। চখাচখি বলে এক ধরনের পাখির কথা শুনেছি, বা জোড় মানিক, এরা নরনারী দুজনে একসঙ্গে বাঁচে, দুজনে একসঙ্গে, এটাও একটা পথ। কুদ্দুস বলেছে, চখাচখি পিঠে পিঠ লাগিয়ে শত্রু আসছে কিনা দেখে, নরটা একদিকে নারীটা অন্যদিক। এরা সমষ্টিকে নির্ভরযোগ্য ভাবে না। ওরা মিথুনধর্ম বিশ্বাস করে। আমি পাখি নিয়ে কিছু সামান্য পড়াশুনা করেছি। ডারউইন দ্বীপটা তো পাখির দ্বীপ। আমার পদবি সমষ্টিবাচক। এটাই ট্রাজেডি স্যার!

—সুবৃত্ত!

—হ্যাঁ, স্যার!

—তুমি বিস্ময়কর। বলে অধ্যাপক হা-হা করে হেসে উঠলেন। এই হাসির প্রাণ এত যে খোলা, সুবৃত্ত ভেবে মুগ্ধ হয়। মানুষটাকে আশ্চর্য আপন আপন লাগে।

স্যার হাসতে হাসতেই বললেন, মিথুনধর্ম কথাটা তোমার?

সুবৃত্ত মাথা নিচু করে বলল, বোধ করি। তবে এটা এমন কী, যে কেউ ভাবতে পারে।

—না, মিথুনধর্ম কথাটা নতুনই শুনলাম। তুমি চখাচখি দেখবে?

—আশা করি।

—তার মানে, এখানে তুমি থাকছ?

—হ্যাঁ।

—বেশ।

—মিথুনধর্ম থেকে আদি কাব্যের জন্ম। আদি শ্লোকের উদ্ভব। ওই যে ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী—কোঁচ এক ধরনের বক, কোঁচটা তীরবিদ্ধ হয়ে মরল। মিথুনধর্ম থেকে মনে হচ্ছে লালনও তাঁর দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত সরিয়ে নিতে পারেননি। লোকে যখন আমাকে মারছে, নারী আমাকে বাঁচাবে, এ তো হৃদয়ের স্বাভাবিক দাবি, সেটাও যদি না থাকে, কাব্য শুকিয়ে যেতে বাধ্য। তবে একথাও ঠিকই, কোঁচ না মরলে শ্লোক জন্মায় না।

—বেশ তো, তুমি তোমার মৃত্যু ঘোষণা করো। এবং নতুন করে বেঁচে ওঠো।

—আত্মপথেও নারীর প্রয়োজন, কী আশ্চর্য! লালনেরও প্রকৃতি দরকার হয়। এমনকী স্বর্গারোহণেও নারীকে সঙ্গে নেন যুধিষ্ঠির! প্রথম পদস্খলন দ্রৌপদীর, তবু...রামচন্দ্রও একা নন, বনবাসে সীতা সঙ্গ নিয়েছে। লক্ষ্মণের মতো শুকনো চরিত্র

আমি একটাও দেখিনি। যাকগে, কাকটাকে আমার ভীষণ 'অনেস্ট' মনে হল।

—পর্ণা কি অনেস্ট? কুদ্দুস হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে।

এই রকম আকস্মিক প্রশ্নে সকলেই হকচকিয়ে গেছে, মামা এবং প্রফেসর কেমন অসোয়াস্তিতে পড়ে যান। সুবৃত্ত মাথা নিচু করে একটা যেন চাবুক খেয়ে জাগল। এবং মুখ তুলল।

সুবৃত্ত কুদ্দুসের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে বলল, আর কেন কুদ্দুস। আমোদীকে রেহাই দেওয়াই তো ভাল।

—তুই দে। ওকে ছেড়ে দে। ভুলে যা। ও ক্রৌঞ্চী নয় যে, তুমি মরে গেলে তোমার মৃতদেহের চারপাশে ঘুরে ঘুরে কাঁদবে। পাখিজন্ম তোমার, ওর নয়। তোমাকে আমি এখানে রেখে যাচ্ছি, তুই সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরবি। মামা বলেছেন, তোমার দরকার অটোথেরাপি। অটোজেনিক মেথডে তুই নিজেই নিজেকে সুস্থ করে তুলবি। তুই ভাল করে ভেবে দ্যাখ। ট্রেন-প্ল্যাটফর্মে তোর মৃত্যু হয়েছে। তারপরও যে বেঁচে রয়েছিস, এই পরমায়ু পর্ণা দেয়নি।

—পর্ণাও তো চায়, আমি সুস্থ হই।

—পর্ণারা চাইতে জানে না পাখিরা। আরে ভাই তত্ত্বকথা মুখে আসে না, কিন্তু ওই যে বললে আত্মপথ, ওই পথটাও এমন হওয়া দরকার যাতে ওই পথ ধরে আরও কিছু মানুষ এগোতে পারে। কী বলেন স্যার।

—হ্যাঁ, কুদ্দুস। ঠিকই। ওই পথটাকে আমি বলি, পারসোন্যালি ইমপারসোন্যাল, যেখানে হাজার নিঃসঙ্গ হৃদয় মিলতে পারে। আমি রাত্রে অন্ধকারে ঘরে বসে একটি সরু মোমবাতি জ্বালিয়ে, ক্ষুদ্র শিখাটায় মন বসাই এবং ক্ষুদ্র আলোর কণাকে বলি, আমার কার্ল মার্ক্স নেই, গাঁধী নেই, কমরেড নেই, পার্টি নেই, দল নেই, মক্তব নেই, মন্দির নেই, কিন্তু মানুষ কোথাও আছে, আমি যেন তাকে চিনতে পারি। যাকগে, আমার চেয়ে সুবৃত্ত কম তো কিছু জানে না। নূরভাই বলে, দুধ যত গাঢ় হয়, ওজনে কমে, তখনই আসল পরীক্ষা, দুধ কমে যাচ্ছে, গাঢ়ও হচ্ছে, এবার কি জল মিশিয়ে বেচবে? না, তা নয়।

—তাহলে! বলে প্রায় বোকা হয়ে স্যারের মুখের দিকে চাইল সুবৃত্ত।

স্যার সেই মিঠে হাসি হেসে বললেন, নূর কী করে সুবৃত্তই দেখে যাক। বেশি না। ছ'মাস।

রাত্রে একটি সরু মোমের আলোর দিকে চেয়ে রইল সুবৃত্ত। আলোর কণাকে সে কী বলবে ভেবে উঠতে পারল না। তার চোখের সামনে রাত্রির পর রাত্রি জ্বলতে থাকল সরু মোমবাতির ক্ষুদ্র তেকোনো পতঙ্গের মতো মূক ভাষাহীন নিঃশব্দ আলো।

গঙ্গাপাড়ের গ্রামগুলিতে এইভাবে নূর আর অধ্যাপকের সান্নিধ্যে কেটে গেল সুবৃত্তর। স্যারে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সুবৃত্ত পাখিরা গ্রামের কত ছবিই না দেখল! মানুষের খুনের অদ্ভুত রাজনীতি সপ্তাহে অন্তত দুটি একটি খুনের ঘটনা ঘটাত। সেই সব খবর আসত স্যারের আশ্রমে।

স্যার বলতেন, সুবৃত্ত! যাবে নাকি দেখতে?

—না স্যার!

নূর বলত, মানুষের জীবনডা কি বেজায় শস্তা মণিভাই! নাড়ি শক্ত না রাখলে পাগল হয়ে যাবেন। মানুষ উঠোনে কাফন-মোড়া লাশ শুইয়ে রেখে হেঁশেলে ভাত খায়। কী করবে খোদার জীব। মানুষ আসলে গোরস্থানের উপর সোনার সংসার গড়েছে। এই যে মাটি, এর তলায় কবর আছে। সবখানে। প্রিত্যেকে ধাপে কবর।

—মানে! বলে চমকে উঠেছে সুবৃত্ত।

—মানে খুব সহজ। খোদার কিতাবে লিখেছে, কেয়ামতের দিন এক একডা কবর থেকে সত্তর হাজার করে মুর্দা জিন্দা হয়ে উঠবে। এই যে কবর দেখছেন, অন্তত সত্তর হাজার বার এই কবরে কবর হয়েছে মানুষের। না হয়ে থাকলে হবে। সত্তর হাজার বার একটা মাটি কবরে নষ্ট হবে। তলায় কবর উপরে নগর।

—তো?

—এই হচ্ছে সার কথা। নগরের হাসিখুশি, কবরের নিশুতি। ইনসানের মৌৎ তাজ্জব করে না, কষ্ট হয় ইনসানিয়াতের মৌৎ হলে। পায়ে পায়ে কবর, মাথা নিচু করে হাঁটি এবং ভাবি মানুষের হাতে মরতে হবে খোদা গো। মানুষের হাতে মরলে সিধা বেহেশ্‌ত। গোরের শাস্তি মকুব, কেয়ামতে বিনে বিচারে খালাস। আমি তো হারাম খাইনি। ওজনে কম দিইনি। কাউকে পথে বসাইনি। জ্ঞানত অনিষ্ট করিনি কারও। তা-ও মানুষ খুন করবে আমাকে। করুক। মানুষ কী জাত হজরত ইশাকে ক্রুশে বিঁধিয়ে মারে, তার আগে তাঁকে দিয়েই ক্রুশ বইয়ে নেয়। তারপর তো কথা থাকে না পাখিরা। এরপর যখনই হাঁটবেন, ভাববেন কাঁধে ক্রুশ, পায়ের তলায় শ্মশান বা গোর।

—আমি পারব না নূর ভাই।

—ক্ষমাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম পাখিরা।

—পারব না।

ছ'·মাসে গাইয়ের দুধ কমেছে। স্যারকে একদিন নূর বলল, আর হবে না প্রফেসার। এক কিলো দিতাম, এখন আধ কিলো পাবেন। মেহমানের ভাগ কমাতে পারব না। আমি কুদ্দুসের ছোট খালার কাছে মানুষ হয়েছি। মাদ্রাসা পড়ার খরচ দিত খালা। পাখিরা আসলে ছোট খালার মেহমান।

একদিন স্যার বললেন, অজাতশত্রু কথাটা শুনেছ সুবৃত্ত। গাঁয়ে ঘুরে কী দেখলে, নূর ভাই বোধহয় অজাতশত্রু। তাই না?

ঘটি দিয়ে দুধ মাপতে বসে রোজই নূরের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ত। কিন্তু সুবৃত্তর দুধ কিছুতেই কমত না।

সুবৃত্তর একদিন মনে হল, এই স্থান তার ত্যাগ করা উচিত। নূর ভাইয়ের বাড়ির ছোট ছেলে নসরতও আর একফোঁটা দুধ পায় না। একদিন নাকী সুরে কাঁদছিল, শান্তি চোখ পাকিয়ে শাসন করল, মেহমানের দুধ নসু, কাঁদবা না।

কথাটা কানে আসামাত্র সুবৃত্তর দাঁড়ায় একটা হিমস্রোত বয়ে গেল। দেখা গেল, নসরতকে মাথায় শান্তি বেগম খোদার কালাম পড়ে ফুঁ দিয়ে বলছে, সবুর ছোটে মিঞা, সবুরে মেওয়া। তুমি কাঁদলে পাখরি গাই রাগ করবে।

সেই রাত্রে সুবৃত্তর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। অন্ধকার রাত। আলোর শিখার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখের সামনে আকস্মিক মেধার মুখটা বৃষ্টিফোঁটায় অশ্রুলাগা পদ্মকোরকের মতো ফুটে উঠল। সুবৃত্ত আপন মনে বলে উঠল, কতকাল পর তোমার সুন্দর মুখ মনে পড়ল মেধা। কী আশ্চর্য।

মনে হল, উঠোনের অন্ধকারে কে যেন গুমগুম করে হাঁটছে। কে? নূর ভাই? আস্তে করে প্রশ্ন করে সুবৃত্ত। কোনও সাড়া আসে না। মনে হল, উঠোনে কবর থেকে সত্তর হাজার মুর্দা অন্ধকারে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কী যেন হচ্ছে একটা!

নদী ছলছল করে বইছে। এই নদীরও মৃত্যু হবে। কী আশ্চর্য, গঙ্গা বাঁচবে না। গঙ্গার নীচেও কি গোরস্তান রয়েছে? এই গ্রামে গভীর রাতে কেমন অদ্ভুত চিৎকার জাগে। কান্নাকাটি হয়, মেয়েদের পুরুষরা মারে। বেশিরভাগ মেয়েরা বিড়ি বাঁধে। লোকগুলো সাইকেল রিকশা, ঘোড়াগাড়ি, ভ্যান-রিকশা চালায়। কিছু লোক খেতমজুরি করে। সবাই নূরকে সম্মান করে। বাবাকেও ইজ্জত দেয়। মাঝে মাঝে এ-পাড়াতেও নসিহত করে নূর মৌলবি। তার কণ্ঠের ধর্মোপদেশ চমৎকার সুরে বাতাসে খেলে বেড়ায়।

রাত কত? আলোর ক্ষুদ্র শিখা নিবে গেছে। উঠোনে জোনাকি এবং মানুষের ছায়া উড়ে বেড়াচ্ছে। গাইটা হঠাৎ গোঁ করে ডাকল। সুবৃত্তর মুখে তখনও দুধের গন্ধ।

—পাখরি, পাখরি! কী হল মা! শান্তির ঘুমে জড়ানো গলা। সারাদিন বেচারি দর্জির হাত-মেশিন চালিয়েছে।

সহসা এবার নদীর জলে ভারী কী একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ হল। তারপর পাখরির মর্মভেদী আর্তনাদ শোনা গেল। তড়াক করে উঠোনে লাফিয়ে নেমে এল সুবৃত্ত। পাগলের মতো ডেকে উঠল—নূর ভাই! নসরত, শান্তি ভাবী। ওঠো! পাখরি

জলে পড়ে গিয়েছে।

টর্চ হাতে উঠোনে মেনে এল নূর।

নিশা রাত্রে গাই বেঁধেছে। খুঁটার সঙ্গে দিঘড়ি দিয়েছে অর্থাৎ লম্বা দড়িতে বেঁধেছে। এখানে মাটির চুট অর্থাৎ চুড়ো শূন্যে ঝুলে রয়েছে, তলায় আবর্তমান জল। তারই কিনারা বেয়ে একটা খাড়া মিহি পথ। পাখরি জলে পড়ল কেন? সরু খাড়া মিহি পথ বেয়ে ভেজা পাখরি আপ্রাণ চেষ্টায় উপরে উঠে আসার চেষ্টা করছে। টর্চের ক্ষীণ আলো পড়েছে পাখরিব সরু খাড়া পথে। পা ঠিক মতো না পড়লেই গাইটা জলের ঘূর্ণিতে ফের চলে যাবে।

গলার দড়ি ধরে টানবার চেষ্টা করে নূর। আলো দেখাচ্ছে সুবৃত্ত। পা পিছলে আবার জলে চলে গেল পাখরি। ঘূর্ণিতে পড়ে অসহায় পশু বেতালা হয়ে ঘুরতে লাগল। ঘুরে ঘুরে আবার সে উঠে আসার চেষ্টা করছে। নূর দড়ি ধরে টানছে। কী অসহায় লাগছে খাঁটি দুধের গাভীটাকে। বকনাটা নিশার পাশে দাঁড়িয়ে মায়ের জন্য ছটফট করছে।

চারবারের চেষ্টায় পাখরি উঠে এসে সুবৃত্তর পায়ের কাছে পড়ে গেল। গাইটার মস্ত জিব বেরিয়ে পড়ল মুখের বাইরে, চোখ স্থির হয়ে গেল। কাজলঘন চোখ মেলে সুবৃত্তকেই যেন দেখতে থাকল পশুটা। তার চারটে পা সটান হল, তারপর শক্ত হয়ে গেল। গরুর মুখে রক্ত।

শান্তি রাত্রি কাঁপিয়ে ডুকরে উঠল—পাখরিকে মেরে দিয়েছে, মুখে সেঁকো বিষ দিয়েছে, হায় খুদা! কোন দুশমন এই কাম করল, হায় রসুল! এই দ্যাখেন নসুর বাপা, কলাপাতা করে জহর খাইয়ে মেরে দিল, হায় রে! এ তুমি কী করলে পাক রব্বানা।

নসরত আর নিশা সুর করে কেঁদে উঠল। আশপাশের বাড়িগুলো থেকে লণ্ঠন বেরিয়ে এল। নূরের মুখে কোনও কথা নেই। কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারছে না, তার পবিত্র গাই চোখের সামনে এইভাবে মরে গেল। খাঁটি দুধের ঈমান দিয়ে নূর নদী-বন্ধন করেছিল, বসতের পত্তনি দিয়েছিল। পাখরি এই ঝুলন্ত চুঁটে দাঁড়িয়ে জলের ফেরেস্তার সঙ্গে কথা বলত।

সুবৃত্তর মুখে এখনও দুধের গন্ধ। পাগলের মতো সে স্যারের বাড়িতে ছুটে এল দরজা ঠেলে, বাড়িতে অধ্যাপক নেই। কোনও গাঁয়ে লোক-গবেষক মানুষটি থেকে গিয়েছেন। খুব ভোরে উনি যখন ফিরছেন, গরুর মৃতদেহ তখন গাড়িতে তোলা হচ্ছে ভাগাড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মা চলে যাচ্ছে দেখে তখনও নসুর হাতে দড়িবাঁধা বকনা ছটফট করে মায়ের কাছে ছুটে যেতে চাইছে। মায়ের মৃত্যুর পর ওর গলায় দড়ি পড়েছে।

পাখরি যখন অবোধ মৃত্যুর ভিতর দিয়ে চলে গেল, ক্রমবিলীয়মান গাড়ির

লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

চিরায়ত প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

—কী করে বুঝব?

—এই চেনটা আমি শান্তি ভাবীর নতুন গাই কেনার জন্য দিতে চাই। এর দাম চার হাজার মতো হবে। চার টাকা নয়। নূর ভাই যদি গ্রহণ করে, আমার একটা নিষ্পত্তি হয় বাবা। আপনার দায়িত্ব, আপনি 'নেক ইনসান' নূরকে বুঝিয়ে বলবেন। এবং ওকে বলবেন, আমি ওর মন্ত্রটা সঙ্গে নিয়ে গেলাম।

—আচ্ছা, তুমি কি জানো, বহরমপুর গোরাবাজারে পর্ণাদের বাড়ি, ও পুজোর ছুটিতে এসেছিল। দেখাও হয়েছিল আমার সঙ্গে। পর্ণা আমার ছাত্রী। কুদ্দুসের নির্দেশ মেনেই আমি পর্ণাকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দিইনি। বলিইনি, তুমি এখানে আছো।

—আমার সব কথা মনে পড়ে না বাবা। হঠাৎ আবার একটা কোনও কথা মনে ভেসে ওঠে। ক্ষীণভাবে, ঝাপসা মনে হয়, পর্ণা আমাকে ভালবাসার চেষ্টা করত। এই মালাটা আমি কেন তাকে দিতে চাইতাম বুঝিনি। দান কিন্তু একবারই হয় স্যার। একটি পবিত্র গাভীর জন্য দেওয়াটাই শ্রেষ্ঠ দান, তার দুধের গন্ধ এখনও ঠোঁটে লেগে আছে। সরু মিহি পিছল পথ বেয়ে পাখরি উঠে আসছে, পাখরি আর পাখিরা একই কথা বাবা।

—তুমি কবিতা লিখবে তো?

—হ্যাঁ।

—কথা দিলে?

—হ্যাঁ, দিলাম। পাখরি পাখিরার চেয়ে পবিত্র। তাকেও বধ করে সেঁকো বিষ। আমি বকনার নতুন মাকে দেখে যেতে পারলাম না। আপনি চিঠি লিখে জানাবেন, কেমন হয়েছে।

প্রফেসর মিষ্টি হেসে বললেন—জানাব।